বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

নাটোর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

নাটোর

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
উদয় শংকর বিশ্বাস

সংগ্রাহক

মো. মমিনুল ইসলাম
মো. মেহেদী হাসান
সাহানা পারভীন সুমি

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
নাটোর

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

বাএ ৫৩২৪

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত দশ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : NATORE (Present state of Folklore in Natore District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 210.00 only. US$: 4.00

ISBN-984-07-5333-9

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-য়াত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), আটপাড়া, নেত্রকোনা, মানিক পির (সাতক্ষীরা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, পার্বত্য ও অন্যান অঞ্চল। রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন অঞ্চল ও অনুষ্ঠান।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর),

www.pathagar.com

মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়ার সন্দেশ ; হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল ; বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি ।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য ।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা) ।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা) ।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা ।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা ।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল) ।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে) । (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা ।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি ।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান ।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে । যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে) । ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক । ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য । ৪. গীতিকা (ballad) । ৫. গ্রামনাম । ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত । ৭. করণক্রিয়া (ritual) । ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান) । ৯. লোকচিকিৎসা । ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি) । ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা । ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার । ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি । ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা

www.pathagar.com

পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক

www.pathagar.com

(মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক আফরোজা সুলতানা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান নাটোর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নাটোরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (Introduction of the district) ২৩-৪১

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. নদ-নদী
ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঙ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও নিদর্শন
চ. মুক্তিযুদ্ধ
ছ. বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব , সাহিত্যসাধক ও শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৪২-৭২

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/ রূপকথা/উপকথা
১. দুই সতীনের গল্প
২. জলপরি ও কাঠুরিয়ার গল্প
৩. সমুদ্রের পানি লোনা কেন?
৪. রাজা ও জালিম গাছের গল্প
৫. আত্মহত্যা মহাপাপ
৬. কানার কাছে দানের বিপদ
৭. চর দখল
৮. ব্যাঙের বিয়ে

খ. কিংবদন্তি (legend)
সংগৃহীত কিংবদন্তি
১. তালতলার ভিটা
২. কালীবাড়ি

স্থান-নাম সম্পর্কিত কিংবদন্তি
১. নাটোর
২. লালপুর
৩. গুরুদাসপুর
৪. তিসিখালি

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কিংবদন্তি
হজরত ঘাসী দেওয়ানের মাজার

বৃক্ষলতা ও পশুপাখি সম্পর্কিক কিংবদন্তি
পির বাংলা-তলা

www.pathagar.com

জলাশয় বিষয়ক কিংবদন্তি
দানপড়া পুকুর

গ. লোকছড়া (folk rhymes)

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ৭৩-১০৪
লোকশিল্প
১. মৃৎশিল্প
২. শাঁখাশিল্প
৩. কাঁসাশিল্প

লোকসংগীত (folk song) ১০৫-১৩৭
১. বাউল গান
২. পল্লিগীতি
৩. জারিগান

লোকউৎসব (folk festival) ১৩৮- ১৪১
১. বৈশাখি উৎসব
২. নবান্ন উৎসব
৩. রথ উৎসব

লোকমেলা (folk fair) ১৪২-১৪৩
১. পুষনার মেলা
২. ঘোড়াবাইচের মেলা
৩. বৌ-মেলা

লোকাচার (ritual) ১৪৪-১৪৮
১. সাদ বা সাত খাওয়ানো ২. গড়গড়া দেওয়া ৩. মুখে-ভাত ৪. গায়ে হলুদ ৫. মৃত্যুর পর পালিত লোকাচার (ক) চতুর্থ দিনে ফকির খাওয়ানো (খ) চল্লিশা অনুষ্ঠান ৬. সাঁওতালদের আচার-অনুষ্ঠান

লোকখাদ্য (folk food) ১৪৯-১৫৪

লোকক্রীড়া (folk games) ১৫৫-১৬৪
১. বদন খেলা ২. ফুৎলরি খেলা ৩. টিপু খেলা ৪. পাতা আনা খেলা ৫. রান্না রান্না খেলা ৬. দড়িখেলা ৭. চারগুটি খেলা ৮. বালিশ খেলা ৯. তেলবাঁশ খেলা ১০. খোলাকাচ্চি গাজি গাজি খেলা ১১. চোর ডাকাত পুলিশ খেলা ১২. হাঁড়িভাঙা খেলা ১৩. টুনটুনি পাখি খেলা ১৪. ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলা ১৫. লাটু বা লাটিম খেলা ১৬. কানামাছি খেলা ১৭. বদি খেলা ১৮. পাইত খেলা ১৯. স্টার খেলা ২০. গুলি খেলা ২১. বস্তা দৌড়

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ১৬৫-১৭০

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ১৭১-১৮৮

ক. লোকচিকিৎসা

১. পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসা ২. টিউমারের চিকিৎসা ৩. কোমরে ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা ৪. কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা ৫. ব্রণের চিকিৎসা ৬. ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা ৭. আমাশয়ের চিকিৎসা ৮. জন্ডিস রোগের চিকিৎসা ৯. খোস-পাঁচড়ার চিকিৎসা ১০. গ্রন্থি স্ফীতির চিকিৎসা ১১. ঘামাচি ও শীতকাটার চিকিৎসা ১২. পেট ভালো রাখার চিকিৎসা ১৩. রতিশক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা ১৪. গাঁটের ব্যাথা ১৫. বার্ধক্য প্রতিরোধে চিকিৎসা ১৬. দাদ রোগের চিকিৎসা ১৭. পেটের সমস্যার চিকিৎসা ১৮. জ্বরের চিকিৎসা ১৯. কৌষ্ঠকাঠিন্য দূর করার চিকিৎসা ২০. স্ত্রী রোগের চিকিৎসা ২১. সাদাস্রাবের চিকিৎসা ২২. গর্ভপাত-এর চিকিৎসা ২৩. স্ত্রীলোকের স্তনে ব্যথা চিকিৎসা ২৪. যৌন রোগের চিকিৎসা ২৫. পাতরি রোগের চিকিৎসা ২৬.সাপেকাটার চিকিৎসা

খ. তন্ত্রমন্ত্র

১. সাপে কাটার মন্ত্র ২. জিনে ধরা রোগীর চিকিৎসায় মন্ত্র ৩. জিন তাড়ানো মন্ত্র ৪. বাতের ব্যাথা নিরাময়ের মন্ত্র ৫. বশীকরণ মন্ত্র ৬. বোল্লার বিষ নামানোর মন্ত্র ৭. স্মরণশক্তি বৃদ্ধির মন্ত্র ৮. কুকুর-তাড়ানো মন্ত্র ৯. শিরার আঘাত নিরাময়ের মন্ত্র ১০. মাসিকের সমস্যা দূর করার মন্ত্র ১১. বাড়িঘর বন্ধ করার মন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ১৮৯-২০৫

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings and proverb) ২০৬-২১৪

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২১৫-২২৪

কাঠের কাজে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

১. কুঠার ২. করাত ৩. বাটালি ৪. হাতুড়ি ৫. আগর ও ভোমর ৬. রেন্দা ৭. স্কেল বা মাটাইল ৮. কুসুত বা চিহ্ন প্রদেয় হাতিয়ার ৮. জাম্বুরা ৮. প্যাচকষ বা স্ক্রু ড্রাইভার ৯. র‍্যাদ ১০. লোকযান ১১. নছিমন ১২. নৌকা

মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

১. কুমারের চাক ২. ছাঁচ বা আতাইল ৩. পারা ৪. পিটনা ৫. বোল্যা ৬. তান্না

www.pathagar.com

মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

১. খেয়াজাল বা ঝাঁকিজাল
২. কটিখড়া বা ধর্মজাল
৩. মইজাল
৪. বেড় জাল
৫. ছাকনাজাল
৬. চারো
৭. ভাঁইড়
৮. খৈলসুন বা দিয়াইর
৯. পলই
১০. কুচা
১১. ছিপ/ বড়শি
১২. সরা বা মালই

চাষাবাদে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

১. লাঙল
২. জোয়াল
৩. কোদাল
৪. মই
৫. মগুর
৬. নাইঙ্গেলা/লাঙ্গুলা, আচড়া বা বিদা
৭. নিড়ানি
৮. কাস্তে/কাঁচি
৯. হাসুয়া
১০. দাউলি
১১. সেউতি/ছেঁউতি
১২. কাকতাড়ুয়া
১৩. জালা/কোলা/ভাণ্ড
১৪. কুঠি
১৫. হোরপাট ও টানা পাট
১৬. হোরপাট ও ঝাটা
১৭. কাড়াইল
১৮. জাঁতা
১৯. বাউক
২০. তেকাইটা
২১. কুচি
২২. মোনাই বা
২৩. টাইকে
২৪. লুড়ি
২৫. লটি
২৬. ঠেইঙ্গা
২৭.ব্যাঙ্গা

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

বর্তমান নাটোর অঞ্চল বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত একটি জনপদ। আবহমানকালের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সুখ-শোক, আশা-হতাশা আর জীবন সংগ্রামের বৈচিত্র্য নিয়ে আজও বয়ে চলেছে এখানকার জনধারার মানস-প্রকৃতি। এ অঞ্চলে কর্মজীবন কেটেছে বহু মনীষীর। এই মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন অগণিত মহাজন। প্রাচীন এ জনপদের ইতিহাস বহু পুরনো।

নাটোরের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, বনগাছি, ভাতুরিয়া ও রাজশাহীর জমিদারি লাভের পর রামজীবন ও রঘুনন্দন পিতৃভূমির কাছে রাজবাড়ি নির্মাণের কথা চিন্তা করলেন। এই রাজবাড়ির স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি কিংবদন্তি এখনও নাটোর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বর্ষাকাল–রামজীবন ও রঘুনন্দন জ্যোতিষসহ কিছু লোক নিয়ে নৌকায় আমহাটি ও তার পাশের এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে ভাতঝাড়া বিলের মধ্যে উপস্থিত হন। হঠাৎ তাঁরা এক জায়গায় দেখতে পেলেন একটি বেজি (নেউল) সাঁতার কেটে যাচ্ছে এবং একটি বড়ো ব্যাঙ ছোটো একটি সাপকে গিলে খাচ্ছে। তা দেখে দূরে দুজন বালিকা হাততালি দিয়ে নাচছে। পণ্ডিতদের বিবেচনায় এ স্থানই রাজবাড়ির জন্যে উপযুক্ত বলে গণ্য হলো।

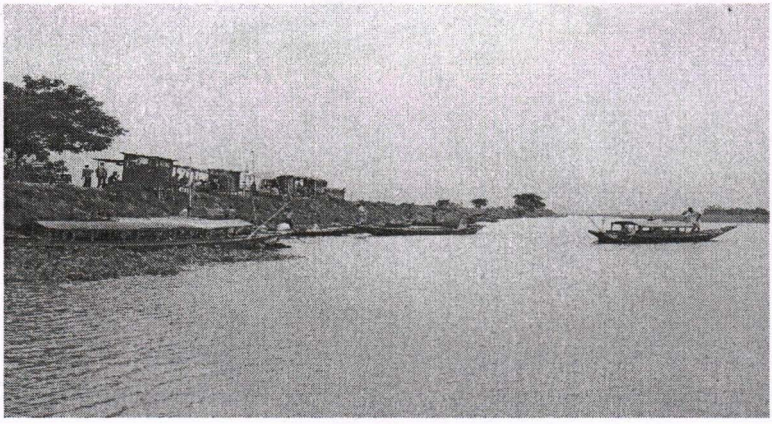

চলনবিলের চিরায়ত রূপ

কিংবদন্তিটি কতটুকু সত্য বলা মুশকিল। কিংবদন্তির সত্যতা থাকুক আর না থাকুক, ঐ স্থানটি রাজবাড়ির জন্যে নির্বাচিত হয় এবং বালিকাদের নাচ উপলক্ষ করে ঐ স্থানের নাম হয় নাট্যপুর। এই নাট্যপুরের বিবর্তিত রূপই হচ্ছে নাটোর।

www.pathagar.com

নাটোর জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

নাট্যপুর > নাটপুর > নাটুর > নাটুর > নাটোর। নাটোর নামকরণের পেছনে আরও একটি বিংবদন্তি রয়েছে। জলমগ্ন যে স্থানে বর্তমান রাজবাড়ি নির্মিত হয়, সে স্থানে জলের গভীরতা ছিল বেশি। তাই তাকে বলা হতো 'নাতর'। এই 'নাতর' শব্দটিই পরে 'নাটর' বা 'নাটোর' হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

কিংবদন্তি যাই বলুক, ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭০৭ সালে বনগাছির বিখ্যাত জমিদার গনেশ রায় ও ভগবতী চরণ চৌধুরী নিয়মানুযায়ী রাজস্ব প্রদান করতে না পারায় জমিদারিচ্যুত হন। এসময় পুঠিয়া জমিদারের রাজকর্মচারি রামজীবন ও রঘুনন্দন সম্রাট আলমগীরের কাছ থেকে ২২ খানা খেতাব লাভ করেন এবং পরে রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। এই রামজীবন ও রঘুনন্দনই নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রামজীবন মৃত্যুকালে তাঁর বংশের কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পারেননি। কারণ রামজীবন জীবিত থাকতেই তাঁর ছোটো ভাই রঘুনন্দন এবং একমাত্র পুত্র কলিকাপ্রসাদ মৃত্যুবরণ করেন। বাধ্য হয়ে রামজীবন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তকপুত্রের নাম রামকান্ত। ১৭৩০ সালে রামজীবনের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র রামকান্ত নাটোরের জমিদার নিযুক্ত হন। জমিদার রামকান্ত ১৭৪৮ সালে মারা গেলে তাঁর স্ত্রী মহীয়সী রানি ভবানী নাটোরের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রজা-হিতৈষী। বহু রাস্তা, সেতু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জলছত্র, সরাইখানা তিনি নির্মাণ করেন। জানা যায়, তাঁর শাসনামলে কোনো প্রজা-বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেনি। কালের সাক্ষী হিসেবে নাটোরের বিশাল রাজবাড়ি গৌরবময় অতীতস্মৃতি বহন করছে। নাটোরের প্রাচীনত্বের সূত্রসন্ধান করলে জানা যায়—নাটোর জেলায় চলন বিলের মাঝ দিয়ে অতি প্রাচীনকালে পদ্মার গতিপথ ছিল। এছাড়া এই বিল ছিল পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে। তারও বহুকাল আগে এলাকাটি ছিল সাগরের পেটে। ক্রমে সাগর সরে গেছে দক্ষিণে, গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের এবং ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে অসংখ্য ক্ষুদ্র নদ-নদীর পলি দিয়ে গড়া নিম্নবঙ্গ। একইভাবে আজকের দ্বীপসদৃশ নাটোর অঞ্চল গড়ে ওঠার ঘটনা ঘটেছে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কালেই। চলনবিল এবং এর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য ক্ষুদ্র নদ-নদীর মাঝে অবস্থিত দ্বীপসদৃশ ভূমিতে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছে জনবসতি।

চলনবিলের ঐতিহ্যবাহী নৌকা

www.pathagar.com

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

একসময় রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর ছিল নাটোর। তখন থেকে এখানে অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে ওঠে। ১৮২৫ সালে রাজশাহী জেলাসদর নাটোর থেকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। পুলিশ সাবডিভিসন হিসেবে নাটোরের পরিচয় ১৮২৯ সাল থেকে। নাটোর থানা সৃষ্টি হয় ১৭৯৩ সালে, মহকুমা ১৮২৯ সালে, এবং পৌরসভা সৃষ্টি হয় ১৮৬৯ সালে। ১৯৫৯ সালে পৌরসভাকে টাউন কমিটিতে রূপান্তর করা হয়। পূর্বে এটি রাজশাহী জেলার একটি মহকুমা ছিল। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে নাটোর ১৯৮৪ সালে জেলায় উন্নীত হয়। বর্তমানে নাটোর রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। মোট ৬টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা, ৫২টি ইউনিয়ন, ১২৭২টি মৌজা এবং ১৩৭৮টি গ্রাম নিয়ে নাটোর জেলা গঠিত। এখানকার উপজেলাগুলো হলো নাটোর সদর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, বাগাতিপাড়া ও লালপুর। জেলার আয়তন ১৮৯৬ দশমিক ০৫ বর্গকিলোমিটার। এটির উত্তরে নওগাঁ ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পদ্মানদী ও পাবনা জেলা, পূর্বে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাসহ চলনবিল ও বগুড়া জেলার কিছু অংশ এবং পশ্চিমে রাজশাহী।

চলনবিলের ঐতিহ্যবাহী বাস্তুবিদ্যা

ভোগৌলিকভাবে জেলাটি ২৪ ডিগ্রি ০৭ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪ ডিগ্রি ৪০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮ ডিগ্রি ৭৫ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯ ডিগ্রি ২০ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ ২১ হাজার ৩৫৯ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮০২ জন। ঘনত্বের বিচারে জেলার অবস্থান ৩৮তম। পুরুষের হার ৫০.৮৬ শতাংশ এবং মহিলা ৪৯.১৪ শতাংশ। জেলায় সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহান, শিং প্রমুখ আদিবাসী বাস করেন। জেলার মোট বসতবাড়ি ৩,৩৬,৮২০টি।

www.pathagar.com

গ. নদ-নদী

আত্রাই, বড়াল, নারদ, নন্দকুঁজা ও পদ্মা নাটোরের প্রধান নদী। এছাড়া রয়েছে বারনই, হোজা, নাগর, মুসা খান, কমলা, গুড়, ভাদাই, গুমানা, গুড্ডি, হিজলী, গদাই ইত্যাদি শাখা ও উপনদী।

ঘ. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

জেলায় সরকারি কলেজ ৪টি, বেসরকারি কলেজ ৫২টি, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ৩টি ও বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ২০৬টি। এখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪২৫টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮১টি, মাদ্রাসা ৬৪টি প্রাইমারি ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট ১টি, নার্সিং ইনস্টিটিউট ১টি, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২টি ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১টি। নাটোর জেলায় শিক্ষার হার ৪০.৮৯ শতাংশ।

ঙ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও নিদর্শন

নাটোর জেলায় বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনা বর্তমান। এসব স্থাপনার অধিকাংশই তৈরি করেছিলেন বিভিন্ন রাজ-রাজরারা। নানা সময়ে তৈরি হওয়া স্থাপনাগুলোর অনেককিছুই কালের অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাওয়া এসব স্থাপনার মধ্যে রয়েছে লালপুর উপজেলার অর্জুনপাড়া পুকুর ও দালানকোঠা (বার ভূঁইয়া), গড়ের ভিটার দুর্গ ও সেনা ছাউনি, লালপুর ও বিলমাড়িয়ার নীলকুঠি এবং বাগাতিপাড়া উপজেলার নীলকুঠিবাড়ি, গালিমপুর রাজবাড়ি, বেগুনিয়া রাজবাড়ি, নূরপুর রাজবাড়ি। এ ছাড়াও রয়েছে বড়াইগ্রাম উপজেলার হারোয়ারের প্রাচীন জয়কালি মন্দির, মাঝগ্রাম ইউনিয়নের প্রাচীন গুনাইহাটি মসজিদ, ফারসি শিলালিপি, গুরুদাসপুর উপজেলার পিপলা গ্রামে মুঘল আমলের মসজিদ ইত্যাদি। এখনও যে স্থাপনাগুলো কালের প্রবল ঝড়-ঝাপটা সামলে কোনোমতে টিকে আছে অথবা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, সেরকম কিছু স্থাপনার পরিচয় এখানে তুলে ধরা হলো।

রানি ভবানীর রাজপ্রাসাদ বা নাটোর রাজবাড়ি : নাটোর জেলা শহরের বঙ্গজ্জল এলাকায় রয়েছে নাটোর রাজবাড়ি বা রানি ভবানীর রাজপ্রাসাদ। পুরো রাজবাড়িটি ঘিরে রয়েছে দুটি পরিখা বা জলাধার, যা পুরনো স্থাপনার অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। পরিখাটি ছইভাঙার বিল নামে একসময় পরিচিত ছিল। মূল রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারেই আছে নাটোর রাজের ঐতিহাসিক কামান। হাতের বাম দিকে আছে পদ্মফুলাকৃতির তারকেশ্বর শিবমন্দির। একসময় এখানে কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ ছিল কিন্তু এটি অপহৃত হওয়ার পর থেকে সিমেন্টের তৈরি লিঙ্গেই শিবরাত্রি, গঙ্গাজল-অর্পণ উৎসবসহ নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শিব মন্দিরের লাগোয়া একতলা ভবনটি ছোটো তরফের কাছারি বাড়ি হিসেবে পরিচিত। কাছারি বাড়ির সামনে আছে সর্বমঙ্গলা দুর্গামন্দির ও নাটমণ্ডপ। এর পাশে রয়েছে 'বড়ো তরফ ভবন' নামে খ্যাত রানি ভবানীর রাজপ্রাসাদ। এর সামনের খোলা মাঠটি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এসব স্থাপনা ছাড়াও রাজবাড়ির ভেতরে আর যেসব স্থাপনা আছে, সেগুলো হলো হানিকুইন প্যালেস,

www.pathagar.com

আরশি প্যালেস, রানিমহল, আনন্দ-কালীমন্দিরসহ ৬টি দিঘি ও প্রচুর গাছগাছালি। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত এসব সুরম্য স্থাপনা আজও সবার দৃষ্টি কাড়ে এর কারুকাজ ও সুন্দর অলংকরণের জন্যে। নাটোরের রাজা রামজীবন ১৭০৬ সাল থেকে ১৭১০ সালের মধ্যে পুঠিয়ার রাজার কাছ থেকে দান হিসেবে পাওয়া প্রায় ১৮০ বিঘার একটি বিলের ওপর এসব স্থাপনার অধিকাংশ গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা যায়।

নাটোর রাজবাড়ি

উত্তরা গণভবন : নাটোরের সবথেকে পরিচিত ঐতিহাসিক স্থাপনাটি হলো উত্তরা গণভবন, যার আরেক নাম দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি। বিখ্যাত দিঘাপতিয়া রাজবংশের নামেই এর এরূপ নামকরণ। এর অবস্থান নাটোর শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে, নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের পাশে। জানা যায়, নাটোরের রানি ভবানী তাঁর নায়েব দয়ারামের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দিঘাপতিয়া পরগণা উপহার দিয়েছিলেন। দয়ারাম পরে এখানে বেশ কয়েকটি সুরম্য প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে যার অনেকগুলোই ধ্বংস হয়ে যায়। পরে তাঁর উত্তরসুরি প্রমোদানাথ রায় এখানে সুন্দর একটি রাজবাড়ি তৈরি করেন, যা বর্তমানে উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত। এর প্রবেশপথে রয়েছে চারতলবিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির প্রবেশদ্বার। আর চূড়ায় আছে বিলেতের কোক অ্যান্ড টেলভি কোম্পানির শতবর্ষী প্রাচীন ঘণ্টা-ঘড়ি। ৪৩ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে আরও আছে ছোটো-বড়ো প্রায় বারটি সুরম্য ভবন। এর মধ্যে রয়েছে ১টি অভ্যর্থনা কক্ষ, ৯টি শোবার ঘর, ১টি খাবার ঘর ও ১টি সম্মেলন কক্ষ। এছাড়াও রাজবাড়িটির মধ্যে রানিমহল ও অতিথিশালাও আছে। উত্তরা গণভবনের মধ্যে দৃষ্টিনন্দন আরও অনেক কিছুই আছে, যেমন- ফোয়ারা সজ্জিত পরিপাটি ফুলের বাগান, কৃষ্ণমূর্তি, মার্বেল পাথরের হেলেনিক শিল্পধারার নারী ভাস্কর্য, প্রসন্ননাথ রায়ের ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন জাতের ফুল ও ফলের গাছ। সবগুলো ভাস্কর্যই প্রমাণ আকারের। গাছের মধ্যে আছে শতাধিক বছরের হাপরমালী, হরতুকি,

www.pathagar.com

রয়্যাল-পাম, তেজপাতা, হস্তিগাদা, কপসিয়া, এগপ্লান্ট, জষ্টিমধু, কনকচাঁপা ইত্যাদি। আছে পাখিফুল, বকুল, মুচকুন্দ, কুর্চি এবং অশোকসহ দেশি-বিদেশি ফুলগাছ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর ১৯৫২ সালে দিঘাপতিয়ার শেষ রাজা প্রতিভানাথ সপরিবারে ভারতে চলে যান। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ রাজপ্রাসাদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এরপর ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নজরে আসে এটি এবং প্রাসাদটির ব্যাপক সংস্কার করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার এটিকে উত্তরবঙ্গের গণভবন হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

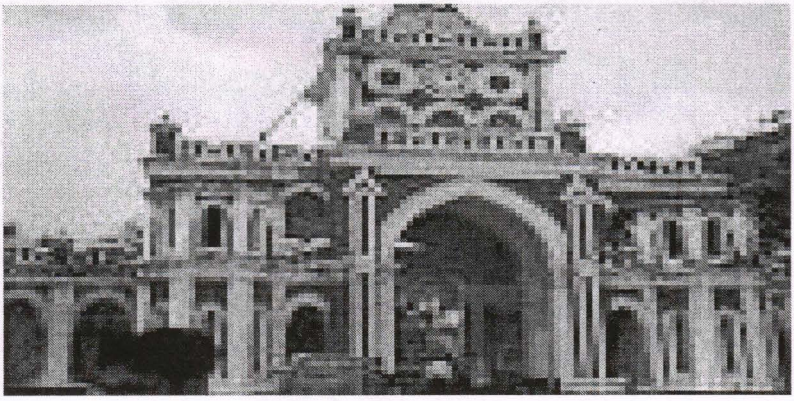

উত্তরা গণভবনের সম্মুখভাগ

কালাচাঁদ ফকিরের আখড়া বা গোসাঁই-আখড়া : লালপুর উপজেলার পানসিপাড়া গ্রামের অক্ষয়তলা নামক স্থানে এটির অবস্থান। প্রায় ৪.৪৪ হেক্টর জমির ওপর অবস্থিত এই আখড়াটি কালাচাঁদ ফকির নামক এক বৈষ্ণব সাধকের পীঠস্থান। আখড়ার প্রবেশ পথটি বেশ বিচিত্র। দ্বিতল এই প্রবেশপথের ওপরতলাটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় অতিথিশালা হিসেবে। কারুকাজ খচিত প্রবেশ পথের এক ধারে আছে বিশাল এক দিঘি। আখড়া প্রাঙ্গণে খালি পায়ে প্রবেশ করার রীতি। হিন্দু-মুসলিম সকলেই এই রীতি মেনে আখড়ায় প্রবেশ করেন। ফকিরচাঁদ গোসাঁইয়ের মন্দিরটিই হলো আখড়াটির মূল স্থাপনা। চারকোণবিশিষ্ট ভূমির ওপর নির্মিত শিখররীতির এই মন্দিরের চারপাশ ঘিরে আছে বারান্দা। প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে দেখা মেলে মন্দিরের একমাত্র প্রবেশপথের। গৃহের ভেতর তেমন কিছু নেই। আছে শুধু ফকিরচাঁদ গোসাইয়ের আসন। এর সামনে আছে আরও কয়েকটি ছোটো আকারের সমাধিসৌধ। এগুলো সবই আখড়ার সেবাইয়েতদের সমাধি-সৌধ, যেমন—পরাণচাঁদ গোসাঁই, জয়মঙ্গল সাধু প্রভৃতি। মূল মন্দিরের পেছনে বড়ো এক ইদারা বা কূপ রয়েছে। সারাবছরই এই কূপে পানি থাকে। একসময় আখড়ার পানির প্রধান আধার ছিল এই কূপখানা। এছাড়া এখানে আরও আছে বেশকিছু কক্ষ, রান্নাঘর, মন্দির, শৌচাগার।

www.pathagar.com

এগুলো প্রতিটি ইট-চুন-সুড়কি দিয়ে তৈরি। ১২৭৪ সনে ফকিরচাঁদ গোসাঁই মারা যান। সেই থেকে তাঁর নামে প্রতিদিন ধূপ জ্বালান আখড়ার সেবাইতগণ। এখানে নবান্ন উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। তখন চাঁদ গোসাঁইয়ের অনুসারীরা মিলিত হন বাৎসরিক এ আয়োজনে।

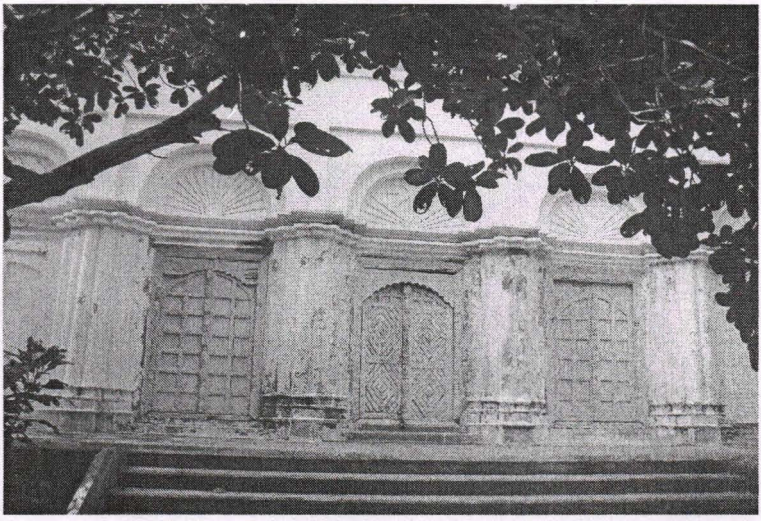

ফকিরচাঁদ গোঁসাইয়ের আখড়া (লালপুর)

চৌরাজবাড়ি : নাটোর জেলার সিংড়া থেকে প্রায় চার মাইল উত্তরে বরেন্দ্রভূমির এক প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম চৌগ্রাম বা চৌগাঁও। এখানে আছে বিখ্যাত ভাদুরি রাজবংশের বসতভিটা বা রাজবাড়ি। ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে বলা যায়, রসিক রায়ের বড়ো ছেলে কৃষ্ণকান্ত রায় ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই চৌগ্রামে রাজবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য রমণীকান্ত রায়ের সময় চৌগ্রামে জমিদারদের আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৫ সালে রমণীকান্তের মৃত্যুর পর এই রাজবংশের শ্রী হ্রাস পায়। চৌরাজবাড়ির স্থাপনাগুলোর মধ্যে কাছারি বাড়ি, মূল রাজবাড়ি, দুর্গামন্দির এবং জোড়াশিবমন্দির কোনোমতে টিকে আছে। শিবমন্দিরের গায়ের টেরাকোটা অলঙ্করণ শিল্পবোদ্ধাদের মুগ্ধ করে এখনও। ১৯১০ সালে এখানে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যা এখনও আছে।

সাধনগরের ঐতিহ্যবাহী পিতলের রথ ও রাধামাধবের মূর্তি : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নাটোর এক সময় সমৃদ্ধ ছিল তা এখানকার বিভিন্ন স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম দেখলে বোঝা যায়। আঞ্চলিক সংস্কৃতির ধারায় নাটোরের সংস্কৃতি অন্য যে কোনো জেলার চেয়ে পরিশীলিত ও অনেক গুণে সমৃদ্ধশালী। বিশেষ করে রাজা প্রমথনাথ ও রানি ভবানীর সময়কালের কথা উল্লেখ করলে দেখা যায়, সেই সময়ে নাটোরের শিল্প সাহিত্যে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। তৎকালীন রাজদরবার থেকে বিভিন্ন ধর্মীয়

www.pathagar.com

কাজের জন্যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হতো। সাধারণ মানুষদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে রাজা বাদশাহদের উপস্থিতি ও তাদের প্রদেয় অনুদান উৎসাহ যোগাত। সে সময়ে রাজা বাদশাহরা মন্দির-মসজিদ-গির্জা নির্মাণে এবং ধর্মীয় কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাদের দান করা কিছু বস্তুগত শিল্পকর্ম থেকে। তেমনি একটি বস্তুগত ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম হলো নাটোর সদর উপজেলার সাধনগরে অবস্থিত একটি পিতলের রথ। পিতলের রথটি সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তম বলে দাবি করেন সাধনগরের অধিবাসীরা। তৎকালীন বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যে কতটা সমৃদ্ধ ছিল তার একটি মূর্তিমান উদাহরণ হলো সাধনগরে অবস্থিত এই পিতলের রথটি। সাধনগরের অধিবাসী বীরেন্দ্রনাথ অধিকারী জানান, গোয়ালকান্দির জমিদার নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান কামনার জন্যে তিনি বিভিন্ন সময় দেব-দেবীদের আরাধনা করতেন এবং ভোগ প্রদান করতেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছিল না। হঠাৎ করে এক অমাবশ্যার রাতে তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হন পূজা-অর্চনার কোনো উপাদান যদি মন্দিরে নিঃশর্ত দান করেন তবে তার মনঃকামনা পূর্ণ হবে। তথ্যদাতা এখানে জমিদারের ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান লাভের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে পারেন নি। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে জমিদার মদনমোহন সাধনগর মন্দিরে উল্লিখিত পিতলের রথটি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা বর্তমানে মদনমোহন রথ হিসেবে পরিচিত।

উল্লেখ্য ১৮৬৭ সালের কিছুকাল পূর্বেই মদনমোহন রথটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। রথের নির্মাণকৌশল ও শ্রমিকদের নিয়ে বিভিন্ন কিংবদন্তি ও কাহিনি প্রচলিত আছে যা সাধনগরের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। স্বপ্নার্দিষ্ট হয়ে মদনমোহন দেবযানী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিতলের রথটি তৈরি করে পশ্চিম সাধনগর মন্দিরে দান করেন। সে সময় এটি নাটোর দিঘাপতিয়া রাজের অধীনস্থ পরগনার অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। রথের মেলা উপলক্ষ্যে পিতলের রথটির গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশচুম্বী লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে পশ্চিম সাধনগর আসতো রথটানা ও রথের মেলা দেখতে। বলতে গেলে সমগ্র এলাকাতে এই রথটিই ছিল প্রধান আকর্ষণ, কারণ এটি সম্পূর্ণ পিতল ও তামার সংমিশ্রণে তৈরি। জমিদার মদনমোহন জীবিত থাকা অবস্থায় নিজেই এই রথ ও রথের মেলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি পরলোকগত হওয়ার পর এই রথ পরিচালনা ও রথের মেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন যামিনী সুন্দরী। যামিনী সুন্দরীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, পাবনার দিলালপুর গ্রামে যামিনী সুন্দরীর বাড়ি। তাঁর বিয়ে হয় নাটোরের বসাক পরিবারে এবং বর্তমানে রথটি সেই মন্দিরের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত। যামিনী সুন্দরী নিজ উদ্যোগে মন্দিরটি স্থাপন করেন। ১৮৬৭ সাল পরবর্তী সময়ে খুব ধুমধামের সাথে পশ্চিম সাধনগরের রথ-বাড়ি এলাকার ঠাকুরবাড়ি থেকে ৪৫০ বা ৫০০ ফুট দূরে দোলবাড়ি পর্যন্ত এই রথ টানা হতো। উল্লেখ্য, এই রথ মানুষই টেনে নিয়ে যেত নির্দিষ্ট গন্তব্যে। আবার উল্টো রথের দিনে তারাই এটি টেনে পূর্বের অবস্থানে নিয়ে আসতো। ঠাকুর বাড়িতেই রথের মেলা বসত এবং মায়ের রথের তিথি অনুযায়ী পরে এই মেলাটি একমাস ব্যাপী স্থায়ী হতো। দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের পর বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে পশ্চিম সাধনগরে পিতলের রথটি

www.pathagar.com

আর টানা হয়নি এবং মেলারও আয়োজন করা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমান সময়ে মন্দিরটির ও পিতলের রথটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন রীবেন্দ্রনাথ অধিকারী। সরজমিন অনুসন্ধানে গিয়ে দেখা যায় পিতলের রথটির বেশকিছু অংশ চুরি হয়ে গেছে এবং দীর্ঘদিন অবহেলা অযত্নে পরে থাকার কারণে এটির বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বেশ কিছুদিন আগে স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে রথটির মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। দেখা যায় বেশকিছু মজুর রথটির মেরামতের কাজে লিপ্ত ছিলেন। স্থানীয় লোকজন আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, মেরামত-কাজ শেষ হলে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য সহযোগিতা পেলে আবার তারা পূর্বের ন্যায় রথের মেলার আয়োজন করবেন।

অপর তথ্যদাতা কৃষ্ণ সিং পিতলের রথের বর্ণনা দিতে গিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন–একসময় এটি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কিন্তু অযত্নে, অবহেলায় এটির আজ মরণদশা। লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে আসত এই পিতলের রথটি দেখার জন্যে। তারা রথটি দেখে প্রশংসা করতো এবং মন্দিরে উপহার সামগ্রী ও নানা ধরনের ভোগ প্রদান করতো। কিন্তু সেই দিনগুলি আজ ইতিহাস। তিনি তার পিতার মুখ থেকে এই রথ সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন যা সবই আজ স্মৃতি। পিতলের রথের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, চাকার রথটি প্রথম যখন নির্মাণ বা তৈরি করা হয় তখন এটির মূল চাকার সংখ্যা ছিল ১২টি। চাকাগুলি সবই ছিল লোহার তৈরি। অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকার দরুণ সেগুলিতে আজ মরিচা ধরেছে।

গম্বুজ : প্রথমাবস্থায় রথটির মোট ৫টি গম্বুজ ছিল যার মধ্যে বর্তমানে ১টি অবশিষ্ট আছে এবং ৪টি অযত্নে অবহেলায় চুরি হয়ে গেছে। গম্বুজগুলি সবই পিতলের তৈরি।

বিভিন্ন মূর্তি : রথটির বিভিন্ন অংশে ছোটোখাটো অনেক মূর্তি ছিল যা এর নান্দনিকতা বাড়াতে সাহায্য করেছিল। মূর্তিগুলির সবই চুরি হয়ে গেছে। এগুলির মধ্যে ছিল ২টি ঘোড়ার মূর্তি, ২টি মাছের মূর্তি আর ৪৬টি বিভিন্ন ধরনের পুতুল। এছাড়াও পিতলের রথটির গায়ে বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন প্রতীয়মান।

মদনমোহন মন্দিরের গায়ে একটি প্রস্তর শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে যার সম্পূর্ণটাই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। মন্দির পুনঃনির্মাণের সময় শিলালিপিটি তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন যাতে লেখা আছে :

> "পাবনাস্থে প্রথিতে দিলালপুর সদ্ গ্রামে যদীয়ালয় : স্বর্গলোকস্থিত কৃষ্ণ কিঙ্কর বধূভূস্বামিনী শ্রীমতী শ্রদ্ধাভক্তি বশাদ্ বসাকুকুলজা যা যামিনী সুন্দরী শ্রী মদ্দানব-দারি মন্দির মিদং প্রীতাত্মনা নির্মাণে। হিমাংশু বৈশ্বাম্বর জীবচন্দ্র প্রমে শকাব্দে সমাপাদি সৌম্যম নিশান্ত মেতাসহিমাম্বিত শ্রীগিরীশ নারায়ণ শর্ম্ম যত্মাৎ।"

সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই প্রস্তর লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে তথ্যদাতা পিন্টু অধিকারী জানান। কিন্তু তিনি মতামত প্রকাশ করেন যে, যামিনী সুন্দরী পাবনার দিলালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি পরবর্তীতে নাটোর পরগণার তৎকালীন জমিদার শ্রী গিরীশ নরায়ণের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

www.pathagar.com

রাধামাধব মূর্তি (গুরুদাসপুর)

পশ্চিম সাধনগরে অবস্থিত পিতলের রথটি অযত্নে অবহেলায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা অনুভূত হয় এবং তারা অপরাধবোধে ভুগতে থাকেন। স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক মূল্যসমৃদ্ধ পিতলের এই রথটি। তাই তারা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় আবারও সাধনগরের ঠাকুর বাড়িতে অবস্থিত রথটির মেরামত কাজ শুরু করেছেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে আগামী বছর রথের মেলার সময় আবার তারা রথ টানতে পারবেন এবং মেলার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

চ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও পকিস্তান সরকার যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করছিল না তখন বাঙালি ক্ষোভে ফুঁসে উঠতে থাকে। পকিস্তান সরকারের প্রতি ধীরে ধীরে বাঙালিদের অসহযোগী মনোভাব প্রকাশ পেতে শুর করে। পাকিস্তানের দীর্ঘ তেইশ বছরের স্বৈরশাসনে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো নাটোরের মানুষও তাদের ক্ষোভ আর ঘৃণা জানায়। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করায় নাটোরের জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে এই দূরভিসন্ধির জবাব দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন।

মার্চ মাস

পয়লা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত নাটোর জেলার মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। মার্চের শুরু থেকে গুরুদাসপুর থানার আবদুল কুদ্দুস, মহসিন আলী, আব্দুস সাত্তার, রবিউল ইসলাম, তোফাজ্জল হোসেন, মোবারক আলী প্রমুখ সংগঠক ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, '

www.pathagar.com

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ৮ই মার্চে বেতারের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হওয়ার পর নাটোরের ছাত্রসমাজসহ সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষ আরও বেশি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ৮ই মার্চ নাটোরের কানাইখালি মাঠে একটি বিশাল জনসভা হয়। ওই সভায় শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরী, সিংড়ার এমপি আশরাফুল ইসলাম, গুরুদাসপুর-বড়াইগ্রামের এমপি আবদুর রফিক সরকার, ন্যাপের খন্দকার আবু আলী, কমিউনিস্ট পার্টির অতুল মৈত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করে বাঙালির তেইশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করেন। সেই দিনেই কানাইখালি মাঠে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। নাটোরের মানুষ কানাইখালির জনসভার পর বিভিন্ন এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করতে থাকে। বিশেষ করে সিংড়া, বড়াইগ্রাম, লালপুর, বাগাতিপাড়াতে সংগ্রাম কমিটিও গঠিত হয়। এমনকি কোথাও কোথাও গ্রামভিত্তিক সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ইতোমধ্যে ঢাকায় ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক শাসক গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরেও স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। নাটোরবাসী বুঝতে পারে আর বসে থাকার সময় নেই। তাই ২৫শে মার্চের পর থেকেই নাটোরের ছাত্রসমাজ, সাধারণ জনতা, পেশাজীবী শ্রেণি, অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য, ইপিআর সদস্য সম্মিলিতভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। নাটোর শহরে ২৫শে মার্চের পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ছাত্র ও তরুণ সমাজ যুবক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে নাটোর শহরে অবস্থান নেয়।

২৬ শে মার্চ একদল পাকিস্তানি সৈন্য নগরবাড়ি ঘাট থেকে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে খবর পেয়ে নাটোরের মহকুমা প্রশাসক জনাব কামাল উদ্দিন ও মেজর নজমুল হকের নির্দেশে প্রায় ৪০০ আনসার ও আট-নয়জন কমান্ডার তাদের বাধা দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁরা পাবনার দিকে এগিয়ে যেতেই মুলাডুলিতে পাকিস্তানি সৈন্যদের মুখোমুখি হন এবং তাদের দেখামাত্র আনসাররা গুলি ছুঁড়তে থাকেন। হঠাৎ আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকসৈন্যরা পিছু হটে অন্য পথে রাজশাহী যাবার চেষ্টা করে। আনসার কমান্ডার ইউসুফ ভাবলেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা হয়তো বনপাড়া-গোপালপুর রাস্তায় অগ্রসর হচ্ছে। তাঁর নির্দেশে আনসার দল ১০টায় বনপাড়ায় পৌঁছয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের লক্ষ্য করে এখানে কিছু গুলি খরচ হয়। পাকিস্তানী সৈন্য অবস্থা বেগতিক দেখে ওয়ালিয়ার পথে গোপালপুর হয়ে রাজশাহী যাবার চেষ্টা করে। কালবিলম্ব না করে আনসারদের গোপালপুর যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাঁচ-ছয় মাইল যাবার পর ওয়ালিয়ায় আনসার বাহিনী আবারও পাক সৈন্যদের মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষ থেকেই প্রবল গোলাগুলি চলতে থাকে। সারারাত এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। সন্ধ্যার দিকে পাক সৈন্যরা কভারিং ফায়ারের সাহায্যে পিছু হটতে শুরু করে। ওই সময়ে কমান্ডার ইউনুস, মেহের আলী, মোজাম্মেল হক, আব্দুস সাত্তার, প্রমুখের পরামর্শে ইউনুসের কমান্ডে দুই প্লাটুন আনসার (৬০ জন) ভিন্ন পথে দ্রুত গোপালপুর পৌঁছে রেল স্টেশনে পজিশন নেন। স্থানীয় এবং চলনবিল অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা আনসারদের নানাভাবে সাহায্য করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা গোপালপুর স্টেশনে পৌঁছে ব্যারিকেড হটানোর চেষ্টা করতেই আনসারদের প্রবল গুলির মুখে নাস্তানাবুদ হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। ২২জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত ও অনেকেই আহত হয়। পাকবাহিনীর অধিনায়ক মেজর আছলাম আহত অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। এর কয়েকদিন পর পাকসৈন্যরা গোপালপুর পুনরুদ্ধার করে নর্থবেঙ্গল সুগার মিলের ম্যানেজার ক্যাপ্টেন (অব.) আজিমসহ তিন-চারশ কর্মচারীকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন আজিমের নামেই গোপালপুর রেল স্টেশনের নাম রাখা হয় আজিমনগর।

৩০ শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একটি দল ওয়ালিয়া বাজারে এলে জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখিন হয়।

এপ্রিল

এপ্রিলের প্রথম থেকেই হানাদার বাহিনী নাটোরের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করতে থাকে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১১ই এপ্রিল মুলাডুলি রেলগেটে এসে পৌঁছয়। এই খবর স্থানীয় জনতা আগেই জানতে পারেন। তারা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনগণের কাছে ভারি অস্ত্র না থাকায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হন। একই দিন হানাদার বাহিনী ধানাইদহে পুনরায় জনগণের বাধার সম্মুখিন হয়। জনগণ ধানাইদহ ব্রিজটি ভেঙে ফেলে। বিকল্প রাস্তা হয়ে হানাদার বাহিনী নাটোর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১২ই এপ্রিল ধানাইদহ এবং এর আশেপাশের সাধারণ জনগণের ওপর আক্রমণ করা হয়। হানাদার বাহিনীর হাতে এ দিন অনেক সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান। ১৩ই এপ্রিল হানাদার বাহিনী নাটোর শহরে প্রবেশ করে। এ সময় তারা শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ২৪ এপ্রিল হানাদার বাহিনী বিপ্রহালসা গ্রামে গণহত্যা চালায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এপ্রিলের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হয়ে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহে মনযোগ দেয়।

মে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নাটোরের রয়েছে অনন্য গৌরবজ্জ্বল এক ভূমিকা। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এখানে সংগঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি বড়ো ধরনের যুদ্ধ। নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা বেশ কঠিন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নাটোরবাসীকে করে তুলেছিল আবেগাপ্লুত। বঙ্গবন্ধুর ডাকে নাটোরবাসী ঝাপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। নাটোরে সংঘঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড-খণ্ড চিত্র নিচে দেখানো হলো।

১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ মুক্তিযোদ্ধা ও পাকসেনাদের মধ্যে লড়াইয়ে ৪০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। ৩ জুন ছাতনী গ্রামে পাকবাহিনী তিন শতাধিক লোককে নির্বিচারে হত্যা করে।

১৭ই এপ্রিল (১৯৭১) নাটোর থেকে গাড়িতে এসে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য হঠাৎ গুরুদাসপুর বাজারে ঢুকে কয়েকজন লোককে হত্যা করে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং স্থানীয় হিন্দু মহাজনদের দোকানপাট-বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। এরপর তারা বিয়াঘাট ও হামলাইকোল গ্রামে গিয়ে নির্বিচারে বহু লোককে হত্যা করে। তাদের

www.pathagar.com

গুলিতে অনেকে মারা যান: বিয়াঘাট গ্রামের আলী হোসেন, মো. আজিজ প্রাং, আব্দুল জব্বার, আফাজ উদ্দিন, আশু মৃধা, আলী হোসেন সেখ, আহম্মদ আলী, আশকান আলী, কায়েম উদ্দিন প্রাং, পচাই প্রাং, বাইনা সরদার, মগর আলী, রিয়াজ উদ্দিন শেখ, সাইদুর রহমান, হাকিম প্রামানিক, হামলাইকোল গ্রামের আব্বাস আলী, আব্দুর রহমান, কার্তিক প্রামানিক, তছির আলী প্রাং, নিতু প্রাং, ছখু মিয়া, নিয়ামত আলী প্রাং, ময়লাল প্রাং, মোজাহার আলী, মজিবর প্রাং, যদু প্রাং (পিয়াদা), লকাই প্রাং প্রমুখ হতভাগ্য মানুষ। এছাড়া মসিন্দা ইউনিয়নের কয়েকজন শ্রমিক বিয়াঘাট গ্রামে মাটি কাটার জন্যে এসে মিলিটারিদের গুলিতে প্রাণ হারান।

জুন

জুন মাসেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। ১৯শে জুন চাঁচকোড় উচ্চবিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক উত্তর নাড়িবাড়ির বাসিন্দা সাইফুল ইসলামের ছোটো ভাই আব্দুল খালেককে হানাদারেরা হত্যা করে। এ সময় গুরুদাসপুর এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একে একে এই অঞ্চলের যুবক সম্প্রদায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

জুলাই

জুলাই মাসে পাক হানাদার বাহিনী প্রবল জনপ্রতিরোধের সম্মুখিন হয়। এ সময় নাটোরের অনেক স্থানেই সাহসী যুবকেরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ মাসেই ধনাইদহ ব্রিজে স্থানীয় জনতা হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু রাজাকারদের সহযোগিতায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেফতার করা হয় এবং জুলাই মাসের কোনো এক সময় তাদের থানা হাজত থেকে নিয়ে হত্যা ও গুম করা হয়।

আগস্ট

১৭ই আগস্ট লালপুরের বিলমারিয়া হাটে থানার শান্তি কমিটির প্রধান মৌলভি জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে এক নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। মৌলভি জামাল উদ্দিন রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে ডেকে আনে। হানাদার বাহিনীর নির্দেশে এ সময় নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়।

সেপ্টেম্বর

একাত্তরের ১৫ই সেপ্টেম্বর নন্দকুজা নদীর ধারে অনেক মানুষকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়। এই কাজে হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করে রাজাকার, আলবদর ও আলসাম্স বাহিনী। তারা স্থানীয় যুবকদের ধরে এনে পাকিস্তানি মিলিটারির কাছে দিত। মিলিটারি স্থানীয় যুবকদের নির্যাতন করে নদীর ধারে এনে গুলি করে হত্যা করত।

নভেম্বর

১০ই নভেম্বর আগদীঘা বিদ্যালয়ে স্থানীয় জনগণ রাজাকারদের ধরে এনে হত্যা করেন। এই অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান রাজাকার আর শান্তি কমিটির ঘাতক

www.pathagar.com

দালালেরা আগদীঘা বিদ্যালয়ে সন্ধ্যার পর মিটিং করবে। রেকিম্যানের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে ফিরোজ মিয়ার নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা সন্ধ্যা নাগাদ বেরিয়ে পড়েন। আগদীঘা এবং তার আশপাশের বেশ কয়েকজন যুবককে নিয়ে বিদ্যালয়ের চারপাশে পজিশন নেওয়া হয়। তাঁরা এখানে ১১ জন কুখ্যাত ঘাতক-দালালকে হত্যা করেন।

ডিসেম্বর

ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দিনই অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর বগুড়া সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গাড়িতে গাছের ডাল বেঁধে ছদ্মবেশে নাটোরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় চৌগ্রাম ও সিংড়ার মাঝ পথে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বৈমানিকেরা তাদের ওপর বিমান হামলা করেন। তাতে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা সদস্য আহত ও নিহত হয়। তাদের পথে যেসব ব্রিজ ছিল বিমান আক্রমণে সেগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে হানাদার বাহিনী বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। রাজাকাররা নাটোরের বিভিন্ন প্রবেশ পথে পাহারা বসায়। তারা নাটোরের সড়ক, ব্রিজ, রেলস্টশন, নদীর ঘাট প্রভৃতি স্থানে দিন-রাত পাহারা দিতে থাকে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন নাটোরকে রাজাকার মুক্ত করবেন। ১৩ই ডিসেম্বর মাধনগরের এক কিলোমিটার উত্তরে মহিষমারী রেলওয়ে ব্রিজ মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারমুক্ত করতে সমর্থ হয়। বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে ঐ একই দিনে ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে নলডাঙা রেললাইনে আরেকটি সম্মুখ যুদ্ধ হয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। এভাবেই ডিসেম্বরে নাটোরের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর-রাজাকারদের পুরোপুরি পরাজিত করে। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পন করলেও নাটোর তথা উত্তরবঙ্গে ১৮ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পন করে। নাটোরের সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজ মাঠে ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করে, শত্রুমুক্ত হয় নাটোর এবং সেই সাথে নাটোরবাসী স্বাধীন হয়ে মুক্তির স্বাদ লাভ করে।

ছ. বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যসাধক ও শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাটোর জেলায় বিভিন্ন সময়ে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। অনেকেই সমাজসেবায় উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন। নাটোর জেলার প্রভাবশালী মনীষীদের কয়েকজনের পরিচয় এখানে দেওয়া হলো।

মহারানি ভবানী : বগুড়া জেলার আদমদিঘি উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামে ১১২২ সালে ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম জয়দুর্গা। বয়স যখন ১৫ তখন নাটোর রাজ রামকান্তের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ১৭৪৮ সালে রামকান্ত মারা গেলে জমিদারির ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। ১৮০২ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নাটোর জমিদারির গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। পলাশীর যুদ্ধে রানি ভবানীর ছিল উজ্জ্বল ভূমিকা। তিনি ইংরেজকে সাহায্য না করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন।

www.pathagar.com

নবাবের সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হলে ভবানী তাঁর সৈন্যদলকে পুনরায় নাটোরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ইংরেজদের সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভবানী তাঁর আপন রাজভাণ্ডার প্রজাদের জন্যে উজাড় করে দেন। পানির অভাব দূর করার জন্যে তিনি নাটোর-পাবনা অঞ্চলে প্রায় ৩০০টি পুকুর ও দিঘি খনন করান। ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় তিনি ফকিরদের জন্যে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি করেন। তিনি শুধু প্রজাদের জন্যে খাদ্য ও পানীয়জলের ব্যবস্থাই করেছিলেন তা নয়, জনসাধারণের সুবিধার জন্যে অনেক হাট-বাজার এবং রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। পাবনার দাশুড়িয়ায় শিবমন্দির, অতিথিদের বসবাসের জন্যে বড়ো নগরে ২২টি আখড়া এবং ধর্মকর্মের জন্য কাশীতে ভবানী ও অন্নপূর্ণার মন্দির স্থাপন করেছিলেন তিনি। তিনি নাটোরে স্বাগত-টোল, অভয়া চতুষ্পাঠী এবং আনন্দময়ী-চতুষ্পাঠী, রানি হেমাঙ্গিনী-চতুষ্পাঠী, বাসুদেবপুর, বৈদ্যবেলঘরিয়া, বড়িয়া, পাকুড়িয়া, কলম, গোপীনাথপুর, আমহাটি, মালঞ্চী, দেবীপুর, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত চর্চার জন্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহের চেষ্টা করেছিলেন।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় : মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন নাটোরের বড়ো তরফের রাজা গোবিন্দনাথের স্ত্রী ব্রজসুন্দরীর দত্তক পুত্র। রানী ভবানীর পর নাটোর রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। ১৮৬৮ সালের ২৬ শে অক্টোবর নাটোর শহরের নিকটবর্তী হরিশপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত গরিব হিন্দু পরিবারে জগদিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রীনাথ রায় এবং মাতা ছিলেন প্রসন্নময়ী দেবী। হরিশপুরের রায় বংশের এই কৃতি সন্তান কালক্রমে জ্ঞানী রাজনীতিবিদ ও শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংগঠক হিসেবে নাটোর রাজপরিবারের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ সখ্য ছিল। ১৯০৪ সালে তাঁর বিশেষ আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ নাটোরে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহভরে 'রাজন' বলে ডাকতেন। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় শুধু নাটোর-রাজ নন বরং বলা যায়, তৎকালীন রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম মহারাজ। রাজ্যের দুর্দিনে যখন দেশবাসী তাঁর দ্বারস্থ হতো তখন আগ্রহের সাথে তিনি তাদের সুপরামর্শ দিতেন। নাটোর জেলার প্রজাদের জন্যে তিনি সর্বদা মঙ্গল কামনা করতেন।

যদুনাথ সরকার : বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের জন্ম ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার করচমাড়িয়া গ্রামে। তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৮৭ সালে এন্ট্রান্স এবং একই কলেজ থেকে ১৮৮৯ সালে এফ.এ. পাস করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি,এ. এবং ১৮৯২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৮৩ সালে রিপন কলেজে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দীর্ঘদিন পাটনা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ১৯২৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর আবার তিনি গবেষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র ছিল মুঘল যুগের ইতিহাস নির্মাণ। এ বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *India of Aurangzib: Topography, Statistics and Roads* (1901), *Economics of British India* (1909), *History of Aurangzib* (1912-1924), *Chaitanya : His Pilgrimages and Teachings* (1913), *History of Bengal* (1948) প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থ। বাংলায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *পাটনার কথা* (১৯১৬), *শিবাজী* (১৯২৯), *মারাঠা জাতির বিকাশ* (১৯৩৬) ইত্যাদি। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিন বার সভাপতি ছিলেন। গবেষণার স্বিকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৮ সালের ১৯ মে যদুনাথ সরকারের মৃত্যু হয়।

কুমার শরৎ কুমার রায় : কুমার শরৎ কুমার রায়ের জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল (১১ বৈশাখ ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) তারিখে নাটোরের দিঘাপতিয়া রাজ পরিবারে। পিতা রাজা প্রমথনাথ রায়, মাতা রানি দ্রবময়ী দেবী। শরৎকুমারের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন চলনবিল অভ্যন্তরস্থ সিংড়ার তিলি সম্প্রদায়ের কায়স্থ। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের শুরু রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুলে। এরপর তিনি কলকাতার রিপন কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ সালে স্নাতক ও ১৯০০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে এম এ পাশ করেন। কুমার শরৎকুমার রায়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ১৯১০ সালে রাজশাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আরও ছিলেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নৃতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ। এটিই পরবর্তীতে বরেন্দ্র জাদুঘর নামে পরিচিত হয়। ১৯১৬ সালে শরৎকুমার রায় বরেন্দ্র জাদুঘরের ভিত্তি স্থাপন করান বাংলার লর্ড কারমাইকেলকে দিয়ে। ১৯১৯ সালে এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করান লর্ড রোনাল্ডসকে দিয়ে। তিনি 'রাজশাহী সাধারণ পুস্তকালয়', 'রাজশাহী এসোসিয়েশন, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ', রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে দয়ারামপুর রাজভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। পারিবারিক ডাক্তার কানাইলাল সাহার তত্ত্বাবধানে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ১২ই এপ্রিল তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন।

আশরাফ আলী খান চৌধুরী : আশরাফ আলী খান চৌধুরী নাটোরের একমাত্র মুসলমান জমিদার খান চৌধুরী পরিবারে ১৮৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর এরশাদ আলী চৌধুরী পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা শুরু করেছিলেন। তিনি মুসলিম বাংলার নবজাগরণের প্রাথমিক যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আশরাফ আলীর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি ইংরেজি ভাষায় যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি বাংলা, উর্দু, আরবি-ফারসি ভাষায়ও ছিলেন সুপণ্ডিত।

মাদার বখ্‌শ : সমাজসেবক মাদার বখ্‌শ ১৯০৭ সালে নাটোর জেলার সিংড়া থানাধীন স্থাপনদিঘি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯২৪ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ. এবং একই কলেজ থেকে

www.pathagar.com

১৯২৬ সালে বি.এ. পাশ করেন। কৃতি এই শিক্ষার্থী ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন। এছাড়া তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতার রিপণ কলেজের আইন শিক্ষা বিভাগ থেকে বি.এল. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে রাজশাহী জর্জকোর্টে আইন ব্যবসার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে আইন ব্যবসায় প্রচুর খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। আইন ব্যবসার পাশাপাশি মাদার বখ্শ রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫০ সালে রাজশাহী পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি। শিক্ষানুরাগী মাদার বখশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর পূর্ববঙ্গে রাজশাহীতে দ্বিতীয় যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মাদার বখ্শ ১৯৬৬ সালে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল হামিদ : অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল হামিদের জন্ম ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার খুবজিপুর গ্রামে, এক কৃষক পরিবারে। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মোঃ দবির উদ্দিন সরদার। ১৯৪৫ সালে তিনি চাঁচকৈড় নাজিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৪৭ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং একই কলেজ থেকে ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে সফলতার সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে তিনি সাতক্ষীরা কলেজ, গাইবান্ধা কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ও যশোর এম.এম. কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৮৮ সালে বগুড়ার এম. আর. কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে, *চলনবিলের ইতিকথা* (১৯৬৭), *জ্ঞানের মশাল* (১৯৬৪), কর্মবীর সেরাজুল হক (১৯৬৬), *পল্লীকবি কারামত আলী* (১৯৬৯), *পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী* (১৯৭৪), *চলনবিলের লোকসাহিত্য* (১৯৮১) ইত্যাদি।

লোকশিল্পী কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস (কার্তিক উদাস) : নাটোর জেলা শহর থেকে অদূরে একটি গ্রাম হাজরা। এই গ্রামে বাস করেন লোকসংগীত স্রষ্টা কার্তিক উদাস। "দেহের ক্ষুধা মিটায় খাদ্য, মনের ক্ষুধা মিটায় গান" এই ধারণাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে গান রচনা করেন তিনি। সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা গুরুকে স্মরণ করেন। তাঁর দীক্ষা গুরু গোবিন্দ মহন্ত এবং শিক্ষা গুরু ড. আবুল হাসান চৌধুরী। গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরু উভয়কেই স্মরণ করে । বিলীয়মান লোকসংস্কৃতির একটি ধারা বাউল সংগীতকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তিনি নিজ উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে "ভোলামন বাউল সংগঠন" নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। এছাড়াও প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে "বাউল মিলন মেলা" নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাউলগণ আসেন এবং সংগীত পরিবেশন করেন। কার্তিক উদাস আধুনিক গান, বাউল গান (দেহতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব)সহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জারিগান রচনা করেন।

শিল্পী মো. আবুল কালাম আজাদ : নাটোর জেলার একটি গ্রাম বুড়ির ভাগ। নাটোর সদর থেকে ১২ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত গ্রামটি। এই গ্রামে বাস করেন লোক

www.pathagar.com

সংগীত শিল্পী মো. আবুল কালাম আজাদ। আবুল কালাম আজাদ বিভিন্ন বিষয়ে জারিগান রচনা করেন। তাঁর পিতা মো. কয়েন উদ্দিন বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন। পিতার মতাদর্শকে মনে ধারণ করে এবং পিতাকে শিক্ষাগুরু মেনে আবুল কালাম আজাদ নিজেও বেশ কিছু জারি গান রচনা করেছেন এবং এতে সুর সংযোজন করেছেন।

শিল্পীর আবাস নাটোরের নলডাঙ্গা মহাসড়কের মাঝামাঝি বুড়িরভাগ গ্রামে। স্টেশন বাজার থেকে নলডাঙ্গায় নসিমন এ চড়ে সরাসরি বুড়ির ভাগে এসে নেমে অথবা নাটোর মাধনগর বাসে এসে বুড়ির ভাগে নেমে শিল্পী কালামের কথা বললেও তার বাসা দেখিয়ে দেবে যে কেউ।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

লোককাহিনি লোকমানুষের অনন্য এক সৃষ্টি। কাহিনি শুনতে পছন্দ করে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন লোককাহিনি প্রচলিত আছে। নাটোরের মানুষও যুগ যুগ ধরে চলে আসা এসব কাহিনি বলতে ও শুনতে পছন্দ করেন। এখানে নাটোরের প্রচলিত কিছু লোককাহিনি তুলে ধরা হলো।

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা

১. দুই সতিনের গল্প

এক মানুষের (লোকের) দুই বউ আছিল (ছিল)। প্রথম বউয়ের নাম মালেকা। একদিন মালেকা এক পাড়াত থাইক্যা (থেকে) আরেক পাড়াত বেড়াতে গেছে। যায়া দেখতিছে দুই সতিন। দুই সতিনে এক সাথে ধান বানিচ্ছে দেখে ওর খুব শখ লাগিচে। আরেক দিন বেড়াতে গেছে, দেখতিছে দুই সতিনে ঝগড়া হচ্ছে। দেখে ওর খুব শখ লাগিচে। তখন বাড়িতে এসে মালেকা ওর স্বামীকে কচ্ছে, দেখো আমার খুব আনন্দ লাগিচ্ছে। তুমি আরেকটা বিয়ে কর। আমরা দুই সতিন মিলেঝুলে কাজ করব আর খুব আনন্দ হবে। আমার খুব ভালো লাগবি। ওদিকে উই অবুজ হতে পারে কিন্তু স্বামীতো আর অবুজ না, স্বামী তখন মালেকাকে কচ্ছে, সতিন সতিন করোনারে–সতিনের বড় জ্বালারে। সতিন এলে সংসারে অশান্তি বেড়ে যাবে, কথায় কথায় ঝগড়া ঝাটি হবে, কথায় কথায় চুলের মুঠি ধরবে। এইসব বলে স্বামী মালেকাকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিন্তু মালেকা আর বোঝে না। মালেকা তখন তার স্বামীকে বলছে সতিনকে যদি আমি আমার বুনের (বোনের) মতো দেখি তাহলে সতিন আমার চুলের মুঠি ধরতে পারবে না। স্বামী মেলা কিছু (অনেক কিছু) মালেকাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই ও বুঝ মানছিল না।

বউয়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে স্বামী গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। স্বামী ওকে বোঝাল মালেকা, এক থালের ভাত দুই থালে খেতে হবে। তাতেও মালেকার কোনো সমস্যা নেই। মূল সমস্যা দেখা দিল স্বামী যখন শুতে গেল। মালেকা নিজেই স্বামীর জন্যে বাসর ঘর সাজাইছে। সতিনকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক আনন্দ আয়োজন করেছে মালেকা। অতঃপর মালেকা তার ছোটো সতিন মোমেনাকে বলছে তুই গিয়ে শো, আমি আসছি। মোমেনা স্বামীকে নিয়ে ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছে। হাতের অন্যান্য কাজ সেরে শুতে গিয়ে মালেকা দেখে যে স্বামী ও সতিন ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তখন মালেকা তার স্বামীকে বলছে, দুয়ার (দরজা) খোল স্বামী, আমি তোমার পাজরে শোব। তখন স্বামী বলছে আমার পাজরে তো শোয়ার জায়গা নাই, সেখানে মোমেনা শুয়েছে। মালেকা বলছে তোমার পাজরে যদি জায়গা না থাকে তবে আমি তোমার সিতানে শোব। তখন স্বামী তাকে

www.pathagar.com

বলছে সিতানে শোয়া যাবে না, কারণ সিতানে আছে মোমেনার বাক্স। সিতানে যদি জায়গা না হয় তবে আমি তোমার পৈতানে থাকব। আমার পৈতানে আছে মোমেনার পোষা বিড়াল। তখন মালেকা একবার মাথায় হাত দেয় একবার পাছায় হাত দেয়। মালেকা চিৎকার করে আর বলে যে, আমার মতো ভুল কেউ করোনা, আমি আমার নিজের পায়ে কুড়াল মারিচি। আমার মতো ভুল কেউ করোনা, আমার মা বোনেরা।

২. জলপরি ও কাঠুরিয়ার গল্প

এক বনে এক কাঠুরিয়া বাস করত। সে প্রতিদিন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করে সংসারের খরচ চালাত। একদিন সে নদীর ধারে কাঠ কাটার সময় হাত ফসকে তার কুড়ালটা পানিতে পড়ে যায়। নদীতে তখন অনেক স্রোত হচ্ছিল। এতে কুমির থাকতে পারে বলে তার ভয় হতে লাগল। তাই কুড়ালটা পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। সে গাছের গোড়ায় বসে কান্না শুরু করে দিল। হঠাৎ করে তার সামনে এক জলপরি আবির্ভূত হলেন। তিনি কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তখন কাঠুরিয়া তার মনের সব কথা খুলে বলল। তিনি কাঠুরিয়াকে কাঁদতে নিষেধ করে বললেন, আমি তোমার কুঠারটা এনে দিচ্ছি। বলে তিনি জলে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুঠার তুলে নিয়ে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা কি তোমার কুড়াল? কাঠুরিয়া বলল, না। এবার জলপরি আবার পানিতে ডুব দিয়ে আরেকটি কুঠার নিয়ে হাজির হলেন। সেটি ছিল রুপার তৈরি। জলপরি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি তোমার? কাঠুরিয়া ভালোমতো পরীক্ষা করে বলল, না এটা আমার কুড়াল না। এরপর জলপরি জলে ডুব দিয়ে আবার একটি কুড়াল নিয়ে আসলেন। এটি ছিল লোহার তৈরি। এবার কাঠুরিয়া তার নিজের কুড়াল চিনতে পারল। জলপরি কাঠুরিয়ার সততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সোনা, রুপা ও লোহার তিনটি কুড়ালই উপহার হিসেবে দিলেন। কুড়াল তিনটি নিয়ে সোনা ও রুপার দুটি বাজারে বিক্রি করে কাঠুরিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করল এবং তার সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এল।

অনেক দিন পর অন্য একজন কাঠুরিয়া তার এই গল্প শুনে চুপি চুপি জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল এবং ইচ্ছে করেই তার কুড়ালটি পানিতে ফেলে দিল। তারপর কাঁদতে শুরু করল সে। পূর্বের মতই পানি থেকে জলপরি উঠে এসে কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে। সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। জলপরি তখন পানিতে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুড়াল নিয়ে হাজির হলেন। তিনি কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন এটি কি তোমার? কাঠুরিয়া উজ্জ্বল আলোকে সোনার ঝকঝকানি দেখে নিজেকে সামলাতে না পেরে বলে দিল, হ্যাঁ এটা আমার। তখন জলপরি আবার পানিতে ডুব দিয়ে আর উঠলেন না। কাঠুরিয়া তখন আপসোস করতে লাগলো যে, সোনা রুপা দূরে থাক, আমি আমার নিজের কুড়ালটাও হারালাম।

৩. সমুদ্রের পানি লোনা কেন?

একদিন স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। ক্লাস নিতে নিতে স্যার প্রশ্ন করলেন, সমুদ্রের পানি লোনা কেন? ক্লাসের মধ্যে অনেক ভালো ছাত্র ছিল, কিন্তু কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারলো

www.pathagar.com

না। সবশেষে একজন হাবা গোবা ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার আমি উত্তর দিতে পারবো। স্যার বললেন, বল। ছাত্র বলল, স্যার তাহলে একটি গল্প শোনেন। ছাত্রটি তখন তার গল্প বলতে শুরু করল—

স্যার এক ছিল পাটনি (যারা নৌকা চালায়)। সে ছিল খুব অলস। কাজ-কাম কিছুই করত না। আবার বসে থেকে কাজও হতো না। পাটনির বউ পাটনিকে শুধু গালাগালি করত। তো একদিন পাটনি বউয়ের সাথে গণ্ডগোল করে নৌকা নিয়ে সমুদ্রে চলে গেল। সমুদ্রের মধ্যে নৌকা চালাতে চালাতে একটা যাঁতা পেল। তারপর যাঁতাটা নিয়ে গিয়ে ওর বউকে দেখাল। সে তার বউকে বলল যাঁতাটি যদি ডান পাকে ঘুরানো হয়, আর কিছু চাওয়া যায়, তবে তাই পাওয়া যাবে। তারপর পাটনির স্ত্রী যাঁতাটি ডানপাকে ঘুরাল এবং বলল চাল পড়। ঝর ঝর করে চাল পড়তে শুরু করল। এভাবে তারা যা চায় তাই পায়। আর বাম পাকে যাঁতাটি ঘুরালে তা বন্ধ হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে তারা বড়োলোক হয়ে গেল। এক চোর ভাবল শালা কিভাবে এত বড়লোক হচ্ছে? একদিন রাতে সে পাটনির বাড়িতে গিয়ে দেখল যে পাটা ডান দিকে ঘুরালে যা চাওয়া যায় তাই পড়ে। ঐ চোর একদিন যাঁতাটা চুরি করে নিয়ে এল। চোর চুরি করে যাঁতাটি নিয়ে স্টিমারে করে বিদেশ পালাচ্ছিল। যেতে যেতে সমুদ্রের মধ্যে চোরের প্রচণ্ড খিদা লাগল। সাথে আছে পান্তা ভাত, খাবে কিভাবে? লবণ নাই। চোর যাঁতাকে ডানে ঘুরিয়ে বলল, লবণ পড়। ঝর ঝর করে লবণ পড়া শুরু হলো। এই যাঁতা ঘুরা আর বন্ধ হয় না। কারণ চোর শুধু যাঁতা ঘোরানোটাই শিখেছিল বন্ধ করা শিখে নি। এক সময় লবণ পড়তে পড়তে স্টিমার ভরে গেল। তবুও যাঁতা ঘোরা বন্ধ হয় না। লবণের ভারে স্টিমার ডুবে গেলে সবাই মারাও গেল। তবুও যাঁতা ঘোরা বন্ধ হলো না। এই যাঁতা সমুদ্রের মধ্যে এখনও ঘুরছে। এই জন্যেই সমুদ্রের পানি লোনা স্যার।

৪. রাজা ও ডালিম গাছের গল্প

এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজা খালি ডালিম খায়। একদিন এক বামন এসে বলল, তিন দিনের মধ্যে ডালিম গাছ মারা যাবে। 'তাহলে তো রাজাকে বলা উচিত' উজির মনে মনে ভাবল। তখন উজির বামনকে কইল, আর কি হবে এই ডালিম গাছের। তখন বামন কইল সতী মিয়ার দুদ (দুধ) দিয়া ধুয়ে দিলে গা এই ডালিম গাছ বাঁচবে। তখন রাজা মশাইয়ের কাছে গিয়া বলছে যে রাজা মশাই, তিন দিনের মধ্যে এই ডালিম গাছ মারা যাবি।

তো এই ডালিম গাছ যদি বাঁচাতে চান তাহলে সতী মিয়ার দুদ (দুধ) লাগবে। নাহলে বাঁচানো যাবে না। তখন রাজা মশাই চিন্তা করছে আমি যে ডালিম খাই, আমি কোনো ফল-ফলন্ত খাইনা, খালি এই ডালিমই খাই। যদি এই ডালিম গাছ মারা যায় তাহলে তো আমি বাঁচব না। তখন উজিরকে রাজা বলছে "তুমি খুঁজে দেখ কোথায় সতী মেয়ের দুধ পাওয়া যায়। নিয়ে এসে এই গাছটা ধুয়ে দাও। তখন উজির কচ্চে যে আপনার বাড়িত যে হুজুর থাকে, যে আপনার মসজিদে ইমামী করে, এই হুজুরের বোয়েক তো আপনি কোনদিন দ্যাখেন নি। মনে হয় এই হুজুরের বউ সতী। রাজা

www.pathagar.com

দুপুরের নামাজের পর হুজুরকে বলছে যে– আপনার বোয়ের বুকের সামান্য একটু দুধ আমাক দিলে মনে হয় এই ডালিম গাছটা বাঁচাতে পারতাম গো। বামন বলিছে তিন দিনের মধ্যে সতী মেয়ের দুধ না দিলে ডালিম গাছটা মারা যাবে। সতী মেয়ের দুধ না হলে না এই ডালিম গাছটা বাঁচাতে পারব না। তাই আপনার বউ মনে হয় সৎ আছে। কোন দিনও তার মুখখানাও দেখিনি। আজ আমার বাড়িতে কত দিন যাগির আছেন। কচ্ছে, আপনি রাজা মশাই, আপনাক দেয়া লাগবিই। আপনার কথা আমি পালন করব। এখন যা বাড়িত কইচ্ছে। তখন হুজুরের বউ উত্তর দিছে, আমার একশোডা নাং হইতে একটা বাকি আছে। তখন হুজুর কচ্ছে যে "গুজা মারা শেষ, আমি হুজুর মানুষ আর আমার বউ কয় কি? যার একশোডা নাং হইতে আর একটা বাকি আছে, আমার আর এই দেশে থাকা হল্যি না।

হুজুর তখন বাড়িত থাকি চল্যি যাচ্ছে রাজা মশাইয়ের জন্য দুদ সংগ্রহ করতে আর ভাবছে, তো আমার আর এই বউ দরকার নাই। যাচ্ছে তো যাচ্ছে। যেতে যেতে পথে আসরের আযান দিয়েছে। তখন হুজুর কচ্ছে আমার নামায পড়তি হবে। এবার সে একটা পুকুর পাইছে রাস্তার মধ্যে। পুকুরের সামনে খাজুর গাছ। এ্যাই খাজুর গাছের নিচে বসি রজু (ওযু) করছে আর নামায পড়ছে হুজুর।

পুকুরে তখন একটা মিয়া কাপড় কাচতিছে। তখন হুজুর কচ্ছে এই মিয়াই মনে হচ্ছে সতি আছে। তখন ঐ মিয়াও কচ্ছে, না হুজুরের দেখি, ব্যাটা ছাওয়াল সামনে বসি আচে, আমি কি করি যায়। হুজুর ডাক দিছে, মা শুন তো মা। তুমি কোন জায়গায় থাকো মা? মিয়া কচ্চে যে, আব্বা আমি দুপার বাড়ি থাকি। হুজুর কয়- কি কর? আমি দুপার কাজ করি খালি। এই কাপুর-টাপুর কাচি। আমার কুনু-কাম নাই। হুজুর কচ্চে, মা আমি একটা কতা কই। তুমি কি সতী না অসতী মা? মিয়া কচ্ছে ক্যা? কচ্চে আমি এ্যাই এ্যাই কারণে দেশ ছাড়িচি। আমি যদি খানিক সতী মেয়ের দুধ সংগ্রহ করতে না পারি তবে আমি আর বাঁচতে পারবনা। সত্য কথা বলো মা তুমি সতী না অসতী।

কইচে বা আমি তোমার কাছে সতী। তাহলে তুমাক আমাকে সামান্য দুধ দিতে হবি। তখন জঙ্গলের মধ্যে গেছে মালোত করি দুধ দিতে। নিয়া যায়ে রাজা মশাক দিছে। গাছটা ধুয়েছে। মরা গাছ দ্যাখে যে তাজা হয়েছে। এহন কচ্চে, যাক বাঁচা গ্যাছে। তখন উজির কচ্ছে যে, রাজা কথেথকে সংগ্রহ করল্যা? ক্যা ধোপার মাইয়া। তখন রাজা মশাই লিয়া যা ঐ ধোপার মেয়ের সাথে হুজুরের দিল বিয়া।

৫. আত্মহত্যা মহাপাপ

শিমুলতলী গ্রামে ছিল একটি কলেজ। সে কলেজেরই ছাত্র শাহাদৎ। তার পাশে ছিল একটি নদী। নদীর ওপারেই তাদের বাড়ি। তার আরেক বন্ধুর নাম শিমুল। শাহাদাত ছিল ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছাত্র। সেই কলেজের ছাত্রী মৌ। তারা অনেক আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল।

শাহাদতের বাড়ি থেকে কলেজে আসতে হলে নদী পার হতে হয়। যেখান দিয়ে পার হতে হবে সেখানে হলো খারাপ ছেলেদের আড্ডা। শাহাতদ যেমন ভদ্র ছেলে

www.pathagar.com

তেমনি তার আচার ব্যবহারও ছিল নম্র। সবাই তাকে ভালো জানত। তার বন্ধুরা তাকে হিংসা করত। সবাই তাকে বলত তুই এত ভালো।

মৌ নামের মেয়েটিকে শাহাদতের বন্ধু শিমুল খুব পছন্দ করত। সে একদিন তাকে তার মনের কথা বলল। তখন সেই মেয়েটি তার মনের কথা ভাবল না। তার প্রস্তাব রাখল না। ছেলেটি তখন মনে মনে অনেক দুঃখ পেল এবং মনস্থির করল যে, সে তার এ জীবন রাখবে না। বাবা-মা, ভাই-বোনের কথা চিন্তা না করে সে তার মনের ইচ্ছা পূরণের ব্রত নিল। ছেলেটি রাতে শুয়ে আছে। হঠাৎ করে তার চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এল। মাঝরাতে ছেলেটি একটি স্বপন (স্বপ্ন) দেখল। সে দেখতে পেল যে, তার বাড়ির পাশে পুকুরের ধারে যে বড়ো আমগাছ ছিল, সেই আমগাছে সে গলায় ফাঁস দিয়েছে। বাড়ির সবাই কান্নাকাটি করছে এবং দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন তাকে দেখতে আসছে। তার মধ্যে ঐ মেয়েও আছে যাকে ছেলেটি প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল।

তার মনের মধ্যে তখন অনুশোচনাবোধ প্রবল হতে থাকল। সে মনে মনে চিন্তা করল মেয়েটা মনে হয় সত্যিকার অর্থেই আমাকে অনেক ভালোবাসত। এরপর তাকে কবর দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নেওয়া হলো। কবর দেওয়ার পরে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল কিন্তু সে কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারল না। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলো। সেখানকার জ্বলন্ত আগুনে সে বার বার দগ্ধ হতে থাকল। সে এক কষ্টকর বিষয়। তখন সে মনে মনে চিৎকার করতে থাকল যে আমি আত্মহত্যা করব না, কখনও আমি আত্মহত্যা করব না। ঘুমের মধ্যে চিৎকার-চেচামেচি করলেও পাশের ঘরে শুয়ে থাকা তার বাবা-মা শুনতে পেয়ে চলে আসল তার ঘরে। এসে তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলল। তখন ছেলেটি তার বাবা-মাকে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করল। তার বাবা-মা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যেন সে কোনক্রমেই এই ভুলটা না করে, কারণ আত্মহত্যা হলো মহাপাপ। তখন ছেলেটিও মনে মনে পরিকল্পনা বা পণ করল—

আত্মহত্যা মহাপাপ
এ গুনা কখনো
হবে না মাপ।

৬. কানার কাছে দানের বিপদ

কানার কাছে এক গরুওয়ালা পাঁচটা টাকা দান করেছে। তখন ঐ কানা বলছে কিসের জন্য এই পাঁচ টাকা দান করলে? তখন গরুওয়ালা বলছে তেবাড়িয়ার হাটে (নাটোর জেলার একটি নামকরা হাট) গরু বেচতে আসিছুনু (এসেছিলাম)। এসে আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছিলাম যে, এই গরু বিক্রি হলে আমি পাঁচ টাকা দান করব। কানা এই কথা শুনে বলে তুমি তো বাবা গরুর ব্যবসা কর। তো তবিলডা আমাকে দাও, আমি দোওয়া করে দেই।

তখন ঐ ব্যবসায়ী তবিলডা মাজা থেকে খুলে কানার হাতে দেয়। কানা কোছার মধ্যে তবিল নিয়ে বসি থাকে। ঐ গরুওয়ালা তখন তাকে জিজ্ঞেস করে, আমার তবিলখানা আমাকে দাও। কানা তখন চিল্লাচিল্লি করে, আমার টাকা পয়সা কাইড়া

www.pathagar.com

নিছে গো। এই কথা আশেপাশের লোকেরা এসে শুনে এবং গরু ব্যবসায়ীকে ধরে ফেলে। তারা তাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দেয় আর বলে, শালা কানার টাকা চুরি করিতেছিস! তারপর ব্যবসায়ীকে মেরে রোডের ধারে ফেলে রেখে তারা চলে যায়। তখন সন্ধ্যা লেগে এসেছে। তো বাড়িতে তো যেতে হবে। একটি বাসের হর্ন শুনে ঐ ব্যবসায়ী বাসে গিয়ে উঠে বসে, সে লক্ষ্য করে যে, ফকিরটাও ঐ বাসে গিয়েই উঠছে। তখন ঐ গরু ব্যবসায়ী কানা ফকিরকে ফলো (অনুসরণ) করতে থাকে। বাস থেকে নেমে ফকির একটি ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ঢোকে। গরু ব্যবসায়ীও তাকে অনুসরণ করতে করতে গিয়ে ঐ ঘরে ঢোকে। গিয়ে শোনে ঐ কানা ফকির গল্প করছে যে, কে কত টাকা ইনকাম (আয়) করেছে। একজন বলছে আমি ৫০ টাকা আয় করেছি, আরেকজন বলছে আমি ৩৫ টাকা আয় করেছি। তখন ঐ অন্ধ ফকিরটা বলছে আমি একটি তবিল পাইছি দানে। তখন বাকি দুই ফকির বলছে কোনো জায়গায় তো দেখিনি যে কেউ দানে তবিল পায়। তখন হঠাৎ কানা ফকির বলছে, কেন বিশ্বাস করিস না? এ্যাই দেখ তবিল। হঠাৎ তখন ঐ গরুর ব্যবসায়ী তবিলডা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নেয়। খানিক বাদে ঐ কানা আরেকজনকে জিজ্ঞেস করে ক্যারে আমার তবিল দেকছু? ফকিরেরা শুনে একজন আরেকজনকে বলছে কই আমাদেরকে তো দাওনি। কানা বলছে ক্যানে তোরা যে হাত বাড়াইয়া লিলু। তখন একজন কানা অন্য একজনের মাথায় বাড়ি মারিল, সে আবার আরেকজনের মাথায় বাড়ি মারিল, এরপর বাকি সকলকে। আসলে গরু ব্যবসায়ী মাথায় বাড়ি মেরে তাদের অজ্ঞান করে তার টাকার তবিলটি নিয়ে চলে এল।

৭. চর দখল

এক সময় নাটোরের রাজা ও চৌগ্রামের রাজার মধ্যে চলন বিলের চর দখল নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দেয় এবং তা যুদ্ধে রূপ নেয়। নাটোর রাজার আছে বোমা, কামান অত্যাধুনিক অস্ত্র, আর অনেক কিছু। আর চৌগ্রামের রাজার অস্ত্র কম। নাই বললেই চলে। চৌগ্রামের রাজা তখন এক বোকার হাতে এক অস্ত্র ধরায় দিছে। আর যুদ্ধ করার জন্যে তাকে একটি ঘোড়া দিছে এবং কিছু সৈন্য সাথে দিয়ে তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ চর যেভাবে হোক দখল করতে হবে। চলন বিলের ধারে একটি তালগাছ ছিল। বিলের ঢেউয়ের কারণে তালগাছের গোড়াতে মাটি ছিল না। একসময় নাটোর রাজ্যের সৈন্যরা এসেছে চর দখল করতে আর আধুনিক সব অস্ত্র, কামান, বন্দুক নিয়ে গুলি করতে করতে। তখন ঐ বোকা লোকটি নিজেকে বাঁচানোর জন্যে তালগাছের উপর লফিয়ে উঠেছে, যেহেতু তালগাছের গোড়ায় কোনো মাটি ছিল না তাই তালগাছটি উপড়ে পড়ে গেছে। তখন নাটোর রাজ্যের সৈন্য সামন্তরা মনে করেছে, কি ভয়ানক জিনিস নিয়ে এলরে ভাই! তাড়াতাড়ি পালা।

নাটোর রাজ্যের সৈন্যরা রাজাকে গিয়ে বলল, আমরা কি অস্ত্র নিয়ে গেছি, ওরা তার চেয়ে ভারি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। আমরা একটা বোম মারলে ওরা একটা সৈন্য মারে। আর ওদের কাছে এমন এক অস্ত্র আছে যা দিয়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে তালগাছ কুটি কুটি হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা পালিয়ে চলি আসছি। ওদিকে চৌগ্রামের কাছে গিয়ে ঐ বোকার কাছে সৈন্যরা বলে আমরা হার মেনে নিছি। চলন বিলের এই চরটি এখন তেকে আপনাদের দখলে থাকবে। তখন চারিদিকে আনন্দের

www.pathagar.com

বন্যা বয়ে যেতে লাগল আর চৌগ্রামের রাজার মেয়ের সঙ্গে মহাধুমধামের সাথে বোকার বিয়ে হয়ে গেল।

৮. ব্যাঙের বিয়ে

জৈষ্ঠের শেষ প্রহর। আর কয়েকদিন পরেই বৃষ্টির দেবতা বয়ে নিয়ে আসবে তার অসীম বারি সমৃদ্ধ মেঘবারতা। কিন্তু আকাশে কোথাও মেঘের নামটি পর্যন্ত নেই। চারিদিকে খাঁ খাঁ মরুভূমি। মাঠের পর মাঠ জুড়ে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য চাতক পাখি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু বৃষ্টির কোনো খোঁজ নেই। গ্রামের নাম খাজুবা। সেই গ্রামে একজন পির বাস করতেন। সমাজ ব্যবস্থার কোনো জটিলতার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। সারাদিন আল্লাহ রসূলের নাম করে তিনি কাটিয়ে দেন। তো আবহাওয়া এরূপ বৈরী দেখে সবার মনে এক ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হলো যে, পির সাহেব যদি ইচ্ছা করেন তবে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে একটি ব্যবস্থা করতে পারেন। যেই ভাবা, সেই কাজ। সবাই মিলে গ্রামের অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় বসবাসকারী পির সাহেবের কাছে গেলেন। তাদের সকলের সমস্যার কথা শুনে পির সাহেব বললেন, আচ্ছা, বিষয়টি আমি ভেবে দেখি। তো প্রতিদিনের ন্যায় রাত্রিবেলা পির সাহেব ঘুমাতে গেছেন। এমন সময় স্বপ্নের মাধ্যমে দেখতে পেলেন যে, বৃষ্টি না হওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে ব্যাঙ। তারা রোদের মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। তাদেরকে পরদিন তিনি বললেন যদি তোমরা কোনো সদগতি করতে পার তবেই আল্লাহ খুশি হয়ে তোমাদের মাঝে বৃষ্টি দান করবেন।

দরবেশ গ্রামের সবাইকে ডেকে রাতের স্বপ্নের মাহাত্ম প্রকাশ করলেন এবং সবাইকে বললেন যে কোনো মূল্যে ব্যাঙ যোগাড় করতে হবে এবং তাদের মধ্যে প্রতিকী বিয়ের আয়োজন করতে হবে। আর সেই অনুষ্ঠানে কলস বা বালতি ভর্তি করে পানি দিতে হবে যাতে করে তারা মনে করে যে, ওপর থেকে বৃষ্টির পানি আসছে। ব্যাঙ যদি খোদার কাছে ফরিয়াদ করে তবেই বৃষ্টি সম্ভব। তখন সবাই মিলে ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করে এবং সত্যি সত্যিই বৃষ্টি হয়। তারপর থেকে সবার মধ্যে ধারণা যে অনাবৃষ্টিতে ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়।

খ. কিংবদন্তি

সংস্কার, বিশ্বাস, ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে যে লোকশ্রুতিমূলক গল্প-কাহিনি সৃষ্টি হয় তাই কিংবদন্তি। কিম্+বদন্তি=কিংবদন্তি, অর্থাৎ যা বলা হয় বা হয়েছে এমন। আদিযুগ থেকে মানুষ যা শুনে আসছে তারই বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে তারা। কে-কি-কোন-কবে-কোথায় এসবের উত্তর এই জনশ্রুতি বা কিংবদন্তিতে অনুপস্থিত।

ইংরেজি 'Legend' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'কিংবদন্তি'। পূর্বকালে কোনো কোনো ভোজ উৎসবে বিশিষ্ট ধর্মগুরুর জীবন-বৃত্তান্ত আলোচিত হতো। দু-একজন শিল্পী ঐ জীবন কাহিনি গান আকারেও পরিবেশন করতেন। সংগীত বা উপাখ্যানরূপে বর্ণিত কাহিনিগুলোই তখন 'Legend' নামে পরিচিত ছিল। জনশ্রুতি, জনরব বা গুজবের ওপর ভিত্তি করেই শুধু কিংবদন্তির ময়ূরপঙ্খি কল্পলোকের নীলাকাশে ডানা মেলতে পারে না।

www.pathagar.com

কেননা ইতিহাস বর্জিত লোককাহিনী কিংবদন্তির গৌরব হারিয়ে রূপান্তরিত হয় রূপকথায়। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস, কিংবদন্তি আর রূপকথার পার্থক্য প্রকারগত নয়, মাত্রাগত। কিংবদন্তির মধ্যে প্রকৃতি, স্থান ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে মানুষের বিস্ময় কৌতূহল কিংবা তার রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়। সেজন্য প্রকৃতি ও স্থানের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক কিংবদন্তি। প্রকৃতির আলো, বাতাস, সূর্য-নক্ষত্র, জল, মাঠ-ঘাট, শ্মশান, গোরস্থান, সবই কিংবদন্তির রাজ্যে মানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সেজন্যে শ্মশান বা সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কিংবদন্তি অবাস্তব জীবন ও কল্পনায় আশ্রয় নিয়েছে, তেমনি গ্রামের ধারে প্রাচীন বটগাছের পাতায় পাতায় যখন কোনো মৃত পূর্ব পুরুষর কথা বলে, পদ্মা নদী কিংবা মধুমতি নদীর তীরে হয়তো কোনো প্রাগৈতিহাসিক বীর যোদ্ধা কিংবা অতৃপ্ত প্রেম ও আত্মোৎসর্গের স্মৃতি অমাবস্যার গভীর নিশীথে তেমনি সতেজ অনুভূতি নিয়ে জেগে ওঠে। সাধারণ লোক এসব কাহিনির সৃষ্টি করেন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, অতীতকে মানসচক্ষে অবলোকন করে।

আমাদের অতি পরিচিত লৌকিক সমাজজীবনের সন্নিহিত কোনো ঘটনা সত্য ও কল্পনা মিশ্রিত হয়ে কিংবদন্তির রূপ নেয়। কিংবদন্তির রাজ্য সবটাই সত্য নয়, আবার সবটাই মিথ্যাও নয়। সত্য ও কল্পনা, বাস্তব ও অতি প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা, মানুষের ইচ্ছা ও অনুভূতির সমন্বয় জনমনের ওপর অনবরত আন্দোলিত হতে হতে কিংবদন্তি গড়ে ওঠে। সুতরাং ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে সাহিত্যে রূপদানকারী লোককাহিনিগুলোকেই কিংবদন্তি বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কিংবদন্তিকে সাধারণত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. অদৃশ্য বস্তুবাচক কিংবদন্তি।
২. স্থান সম্পর্কিত কিংবদন্তি।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক কিংবদন্তি।
৪. বৃক্ষলতা সংক্রান্ত কিংবদন্তি।
৫. জলাশয় সংক্রান্ত কিংবদন্তি।

নাটোর জেলা থেকে সংগৃহীত এমন কিছু কিংবদন্তি এখানে তুলে ধরা হলো–

সংগৃহীত কিংবদন্তি

অদৃশ্য বস্তুবাচক কিংবদন্তি

চোখে দেখা যায় না, অথচ যার অবস্থান ও ক্রিয়াশীলতা জনসাধারণের মনে বিদ্যমান, এমন অশরীরী শক্তিধর বস্তুর কল্পকাহিনিকে অদৃশ্য বস্তুবাচক কিংবদন্তি বলে ধরা যায়। ভয়-ভক্তি, বিস্ময়, সংশয় এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে সাধারণ মানুষ এগুলো সম্পর্কে অনেক কাহিনি তৈরি করে। জিন-ভূত, দৈত্য-দানো, মৃত ব্যক্তি, আত্মা ইত্যাদি এ শ্রেণির কিংবদন্তির নায়ক-নায়িকা। লোকবিশ্বাস, ক্রিয়া ও আচার যুক্ত হয়েছে এ শ্রেণির কিংবদন্তির সাথে। নাটোর জেলার বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তরের অদৃশ্য বস্তুবাচক কিংবদন্তির বিপুল সংগ্রহ থেকে কিছু সংখ্যক এখানে বর্ণনা করা হলো—

www.pathagar.com

১. তালতলার ভিটা

নাটোর জেলাধীন লালপুর থানার মোহরকয়া গ্রামে অবস্থিত এই তালতলার ভিটা। এই ভিটায় এক সময় একটি মহল্লা ছিল। কালের বিবর্তনে যখন মহল্লাটি উঠে যায় তখন পড়ে থাকে প্রায় ৫ একর জায়গা জুড়ে ভিটেমাটি, যা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে ছিল বড়ো বড়ো তালগাছ। তাই নাম হয়েছে তালতলার ভিটা। এই ভিটা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের কিংবদন্তি। এখানকার জনমানুষের বিশ্বাসে তালতলার ভিটা ছিল একটা ভয়ংকর জায়গা। সেখানে দিনের বেলায় লোকজন যেতে ভয় পেত। একেবারে ধু-ধু মাঠের মধ্যে ভিটেটি। জনবসতি বেশ কিছু দূরে হওয়ায় সন্ধ্যার পরে জায়গাটি নির্জন হয়ে যায়। ভুতুম পাখি ডাকে ভূত্-ভূত্ ভুতুম। এছাড়া শেয়াল, কাক ও শকুনের ডাকে বিরাজ করে এক অতিলৌকিক পরিবেশ। রাতের বেলায় তাল গাছে মাঝে মধ্যে নাকি ঝাড়বাতির মতো বাতি জ্বলতো এবং সেই আলোতে বিচিত্র ধরনের জিন, ভূত দেখা যেত। রাতের বেলায় জিনেরা আলো জ্বালিয়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছে আসা যাওয়া করত। একদিন দুই যুবক ভিটার তালগাছ তলায় যায় তাল কুড়াতে। গাছ তলায় যেতে না যেতেই তাদের দুজনকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তালগাছের মাথায়। মানব সন্তানকে পেয়ে সারারাত জিন পরিরা অনেক আনন্দ ফুর্তি করে। তারপর রাত্রি শেষে তাদের গাছের মাথা থেকে নিচে ফেলে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হয়। এদিকে যুবকদের অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি করে কোথাও তাদের পাচ্ছে না। পরদিন খুঁজতে খুঁজতে তাল গাছের নিচে তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর থেকে আর কেউ কোনোদিন ঐ গাছের তলায় তাল কুড়াতে যায়নি। শুধু তাই নয়, একবার এই গ্রামের এক রাখাল তালতলার ভিটায় যায় গরু চরাতে। গরু চরতে চরতে যখন তাল গাছের গোড়ায় যায় তখনই দুটি গরু গুঙিয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়। রাখাল বুঝতে পারে ভিটায় বসবাসকারী গো-দানোই গরুকে হত্যা করেছে।

জনশ্রুতি আছে যে, তালতলার ভিটায় যে তালগাছ আছে, সেই গাছে বাস করত দুইটি দেও। দেওদের অত্যাচারে ভিটার পাশ দিয়ে কেউ যাতায়াত করতে পারত না। একদিন এ ভিটার পাশের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তারা বালক দুটিকে তুলে নিয়ে যায়। এবং তালগাছের মাথা থেকে নিচে ফেলে দিলে বালক দুটির মৃত্যু হয়। এলাকার লোকজন দেওয়ের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে পাশের গ্রাম থেকে ডেকে আনে এক মন্ত্রসিদ্ধ কবিরাজকে। তিনি নাকি দেওদের বশ করে রাখতে পারেন এবং ইচ্ছামতো তাদের দিয়ে কাজও করাতে পারেন। যথারীতি সেই কবিরাজ এলেন। ভিটার পাশেই তিনি আসন তৈরি করলেন। তিনদিন ব্যাপী ধুপধুনা দিলেন, অনেক মন্ত্র পাঠ করলেন এবং ভোগ দিলেন। তিনদিন পর শুরু হলো কবিরাজের কেরামতি। হঠাৎ করে ভিটায় দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ে ভিটার বেশ কিছু গাছপালা ভেঙে গেল কিন্তু তালগাছটি ভাঙল না। যুদ্ধ তো নয় যেন কালবৈশাখি ঝড়। এ ঝড় মন্ত্রসিদ্ধ কবিরাজের সঙ্গে দেওদের যুদ্ধ। যুদ্ধে দেওরা পরাজিত হলো এবং কবিরাজের আসনে হাজির হলো, ভয়ংকর তাদের আকৃতি। তাদের শরীরে অনেকগুলো হাত এবং চোখ, দাতগুলো মুলার সমান। যে কেউ দেখলে আতঙ্কিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

আসনে আসার পর তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ হয়। কবিরাজ বললেন তোদের এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্য দেশে, কিন্তু দেও দুটি কোনো মতেই রাজি হয় না। এতে কবিরাজ ভীষণ রাগান্বিত হলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের একজনকে শেয়াল এবং আরেকজনকে কুকুরে পরিণত করে দিলেন যাতে তারা সকল সময় একে অপরকে তাড়ায় এবং কোনো মানবের ক্ষতি করতে না পারে। সেই দেও দুটি নাকি আজও কেউ হুলো, কেউ হুয়া এবং ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করে বেড়ায়। প্রতিদিন গভীর রাতে শেয়াল এবং কুকুরের ডাক এখনও মানুষ শুনতে পায়।

২. কালীবাড়ি

নাটোর জেলাধীন লালপুর থানার বিলমাড়িয়া গ্রামে কালীবাড়ি অবস্থিত। বর্তমানে এটি একটি ইট সুড়কি দিয়ে তৈরি ভবনের ধ্বংসাবশেষ। বহুদিন পূর্বে নাকি এখানে কালী পূজা অনুষ্ঠিত হতো। তবে বর্তমানে তার কোনো স্মৃতি-চিহ্ন নেই। প্রায় ১০ কাঠা জমির ওপর একটি পুরনো ভবনের পরিত্যক্ত অংশ বর্তমান রয়েছে। পূর্বে এখানে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হতো। এ জন্যেই হয়তো এ জায়গাটির নাম হয়েছে কালীবাড়ি।

কালীবাড়িকে ঘিরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের কাহিনি ও কিংবদন্তি। এখানে কালীপূজা হতো কিন্তু কালক্রমে এই এলাকা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন অন্যত্র চলে যাওয়ার কারণে পূজা হতো না এবং ধীরে ধীরে মন্দিরের ভবনটিও ভেঙে পড়ে। তবে অনেকের মতে এখানে এখনো মা কালী জাগ্রত আছেন। কারণ কালীবাড়ির জায়গা জমিতে আজ পর্যন্ত কেউ হাত দিতে পারেনি। একবার পদ্মা নদীতে ভাঙন তীব্র হলে চরাঞ্চলের বহু বাড়িঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নদী ভাঙনের ফলে গৃহহীন অনেক অসহায় মানুষ বিলমাড়িয়া এলাকায় জনবসতি গড়ে তোলে। এমনি এক ব্যক্তি ঘর তৈরি করার জন্যে এই কালীবাড়ির কিছু ইট খুলে নিয়ে যায়। একদিন পরই লোকটি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তিন দিন পর তার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। লোকটিকে নিয়ে তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ পুরো পরিবারটিই ছিল তার ওপর নির্ভরশীল। পরিবারটি পথে বসার উপক্রম হলো। তার স্ত্রী তাকে নিয়ে বিভিন্ন কবিরাজ এবং হেকিমের কাছে গিয়ে অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল পায় নি। একদিন লোকটি স্বপনে দেখল বিরাট জিহ্বা বের করে বিরাট বিরাট চুলে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মা কালী তার বাড়িতে উপস্থিত। লোকটি খুবই ভয় পেল। তখন তার কথা বলার সামর্থ নেই। লোকটি ইশারায় জোড় হাত করে থাকল মা কালীর সামনে। দেবী মাতা কালী তাকে তখন বলছেন, তুই আমার ঘর ভেঙেছিস কেন? রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইটগুলি রেখে আসবি এবং আগামী কালী পূজায় একটি পাঁঠা বলি দিবি। নইলে তোর বংশ নির্বংশ হবে। কথাও শেষ, মা কালীও অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লোকটি ইশারা করে তার বউকে দিয়ে ইটগুলো কালীবাড়িতে রেখে আসার তিনদিন পর বাকশক্তি ফিরে পেল এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। এলাকার লোকজন সকলেই সব ঘটনা শুনল তার মুখে এবং বুঝতে পারল এখানে মা কালী জাগ্রত অবস্থায় আছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আর ঐ ইট ভাঙতে যায়নি। জনশ্রুতি আছে, কালীবাড়ির পাশ দিয়ে রাত্রে মানুষ যেতে ভয় পায়।

www.pathagar.com

সাধারণত একা যায় না। কারণ গভীর রাত্রে নাকি দেবী কালী মূর্তির রূপ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

কালীবাড়ি সম্পর্কে গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি তাজেন খাঁ বলেন বিলমাড়িয়ায় ছিল নীলকরদের রাজধানী। তাজেন খাঁ ছিলেন সেই নীলকুঠির একজন নিরাপত্তাকর্মী। তাজেন খাঁ শুনেছিলেন এই এলাকার জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে কালীবাড়ির ভগ্ন দেওয়ালের নিচে রয়েছে স্বর্ণ-মুদ্রার হাঁড়ি। কেউ তাকে বলছে তুই যদি তা আনতে পারিস তাহলে তোর চৌদ্দ পুরুষ বসে খাবে। তবে সাবধান, যাবি একা। কেউ যেন জানতে না পারে। নইলে তোর বিপদ হবে। লোকটি পরদিন বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে স্থির করল আজকে রাত্রেই যাবে। কিন্তু সে একা যেতে কোনোমতেই সাহস করল না। সে তার এক ভাইকে সঙ্গে করে রাত্রিবেলায় শাবল নিয়ে গেল কালীবাড়িতে। খনন শুরু করল। প্রায় দুই ঘন্টা খনন করার পর দেখতে পেল অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রার হাঁড়ি ঝকমক করছে। একটি হাঁড়ি ওপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি লক্ষ্য করল তার মধ্যে বিষধর সাপ। তার কিছুক্ষণ পরে ভয়ংকর চেহারায় এসে দাড়ালেন দেবী কালী। রাত্রি বেলা তার বাড়িতে মানবকে দেখে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। লোক দুটিকে শূন্যে অনেক উঁচুতে তুলে মাটিতে ফেলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকদুটির মৃত্যু হলো। সকালে এলাকার লোকজন দেখল কালীবাড়ীতে দুটি মৃতদেহ এবং সঙ্গে রয়েছে লোহার শাবল। সেখানে খননও করা হয়েছে। মানুষের আর বুঝতে বাকি থাকল না যে, তারা সেই স্বর্ণমুদ্রা আনতে গেলে দেবী কালীর হাতে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের কাছে জানা যায়, কালীবাড়িতে বর্তমানে পূজা হয় না। কিন্তু এখনও গভীর রাত্রে চণ্ডী পাঠের শব্দ শোনা যায়। কালীপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় নাকি এখনও রাত্রি বেলা পাঁঠা বলি দেওয়ার সময় জল্লাদের খাঁড়ার ঘা শুনতে পাওয়া যায়। এখনও স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে মাঝে মধ্যে দুধ, চিনি, পাকা কলা মানত হিসেবে দিয়ে থাকেন।

স্থাননাম কিংবদন্তি

স্থানের নাম, পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে কল্প-কাহিনি শোনা যায় তাই স্থান সম্পর্কিত কিংবদন্তি। গ্রামের নাম, শহরের নাম, রাস্তার নাম, মাঠের নাম ইত্যাদি কিভাবে হয়েছে, এ শ্রেণির কিংবদন্তিতে তা জানা যায়। ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ নেই, অথচ কিংবদন্তিতে অনেক জায়গা সম্বন্ধে চমৎকার গল্প-কথা প্রচলিত আছে।

স্থান-নাম কোনো স্থানের নামকরণের ইতিহাস। একটি দীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের মাধ্যমে স্থান-নাম সঠিক হয়। স্থান-নাম দীর্ঘস্থায়ী এমন কি চিরস্থায়ী। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি। নগর, বন্দর, গ্রামগঞ্জ ছাড়াও মাঠ-ঘাট এবং পাহাড় পর্বতের নামের মূলেও কিংবদন্তি ক্রিয়াশীল।

১. নাটোর

নাটোর বর্তমানে একটি জেলা শহর। নাটোর রাজবাড়ি, ছোটো তরফ, বড়ো তরফ এবং দিঘাপতিয়ার রাজবাড়িসহ অনেক ঐতিহাসিক স্থান সম্বলিত এই নাটোর শহর।

www.pathagar.com

পূর্বে এই নাটোর শহর ছিল চলনবিলের অংশ। কিংবদন্তি সূত্রে জানা যায় রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দন এবং তাদের পণ্ডিতবর্গ নৌকাযোগে সুলক্ষণযুক্ত পরিবেশে রাজধানী স্থাপনের জন্যে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণে বের হন।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বিলের একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা দেখতে পান যে, একটি নেউল সাঁতারে বিল পার হচ্ছে আর একটি সাপ একটি ব্যাঙকে গ্রাস করছে। দেখে দুটি বালিকা হাতে তালি দিয়ে নাচছে। এ দৃশ্য দেখে রাজা মাঝিদেরকে বলেন, 'এই নাও ঠারো' অর্থাৎ থামাও। এই 'নাও ঠারো' থেকেই কালক্রমে নাটোর নামের উৎপত্তি।

২. লালপুর

নাটোর জেলার দক্ষিণে পদ্মানদীর তীরে লালপুর অবস্থিত। পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় ও অনুকূল পরিবেশের কারণে নদী পথে আগত প্রাচীনকালের বহু নাবিক, সওদাগর, রাজা-বাদশা, নীলকর সাহেব, পণ্ডিত, পরিব্রাজক, ধর্ম প্রচারক ও পির আউলিয়াদের পদচারণায় এক সময় মহিমান্বিত ও গর্বিত হয়েছে এই লালপুর।

লালপুর নাকমরণ সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক দলিল না পাওয়া গেলেও লালপুরের নামকরণ নিয়ে প্রচলিত আছে কিংবদন্তি। জনশ্রুতি আছে যে বহুদিন পূর্বে লালপুরে বাস করতেন লালশাহ্ বুখারী নামে এক পির সাহেব। এই লালশাহ্ বুখারীর দ্বারা উপকৃত হয়নি এমন লোক লালপুরে নেই। যেহেতু এই অঞ্চলের ধনী, গরীব, হিন্দু, মুসলামন সকলেই বিপদ আপদে পির সাহেবের নিকট আসতেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেতেন, তাই তাদের ভক্তি শ্রদ্ধার কমতি ছিল না। পির সাহেবের পানিপড়া খেয়ে বহু মানুষের দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পাশাপাশি অনেক বন্ধ্যা মহিলারও সন্তান সম্ভবা হওয়ার কথা শোনা যায়। সকলের শ্রদ্ধার পাত্র এই লালশাহ্ বুখারীর নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে এই এলাকার নাম দেওয়া হয়েছে লালপুর।

৩. গুরুদাসপুর

নাটোর জেলার একটি থানার নাম গুরুদাসপুর। চলনবিল অঞ্চলের দস্যু তস্কর ও জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষার নিমিত্তে গুরুদাসপুর থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুদাসপুরের নামকরণ নিয়ে প্রচলিত রয়েছে কিংবদন্তি। এ ব্যাপারে অনেকের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে গুরুদাস নামক জনৈক পাটনি গুরুদাসপুর চর থেকে ঝাউপাড়া পর্যন্ত খেয়া দিত। এই পাটনি নাকি খুবই বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। পাটনি যখন খেয়াপার দিতেন তখন তার নৌকায় কোনো মাঝি-মাল্লা লাগত না। তিনি নৌকায় উঠে বসলেই নৌকা ঠিকই তার গন্তব্যস্থলে পৌছে যেত। এই পাটনি গুরুদাসের নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে এই স্থানের নাম হয়েছে গুরুদাসপুর।

জনশ্রুতি আছে, একবার গুরুদাস পাটনি নৌকা নিয়ে যাওয়ার পথে মাঝখানে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, পাটনির নৌকার যাত্রীরা

www.pathagar.com

বৃষ্টিতেও ভিজল না আবার ঝড়ের মুখেও পড়ল না। সকলের ধারণা গুরুদাস পাটনি তার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ঝড় বৃষ্টি থেকে তার নৌকাকে নিরাপদ গন্তব্যে নিয়ে গেছেন।

৪. তিসিখালি

নাটোর জেলার সিংড়া থানার ডাহিয়া ইউনিয়নে এটি অবস্থিত। তিসিখালি একটি স্থানের নাম। তিসিখালি নামক স্থানে ঘাসী দেওয়ান বা গত্তস-ই দেওয়ান নামক একজন বুজুর্গ ব্যক্তির দরগা রয়েছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসে উদিত চাঁদের অষ্টমীর দিনে এখানে বিরাট মেলা বসে। তিসিখালির এই ঘাসী দেওয়ান সম্পর্কে রয়েছে নানা ধরনের কিংবদন্তি। জনশ্রুতি আছে যে, এই দেওয়ান প্রায় ৩০০ বছর পূর্বের জনৈক বিধবার সন্তান। দেওয়ান ডাহিয়ার কোনো এক গ্রামে এক ঘোষের বাড়িতে চাকরি করতেন। গরুর ঘাস কাটা, গরু দেখাশুনা করা ও সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন করা তার কর্তব্য ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হতেন। তিনি প্রত্যুষ্যেই একা গরুর জন্যে ঘাস বা কচুরি পানা কাটতে গিয়ে নৌকা বোঝাই করে বাড়ি বেলা এক বেলা এক প্রহরের মধ্যে বাড়ি ফিরতেন। অন্তত দশজন লোকের কাজ তাকে একা করতে দেখে লোকেরা তাজ্জব বনে যেত। এক রাত্রে ঘোষ মশায় ঘাসী দেওয়ানকে বার হাত লম্বা ঘাস কাটা নৌকার এক গলুইতে মাথা এবং অপর গলুইতে পা রেখে ঘুমাতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হন। আবার কোনো এক রাত্রে তাকে পানির ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে হেটে যেতে দেখেন। এমনি অসংখ্য অলৌকিক কাহিনির কথা তাঁর সম্বন্ধে চলনবিল অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কিংবদন্তি

বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার খণ্ড খণ্ড অবয়ব, অবিন্যস্ত অগ্রথিত ও সৌষ্ঠববিহীন কথাশিল্পের কাঁচামাল হলো কিংবদন্তি। এগুলি অতীতের বিশেষ কোনো যুগের সৃষ্টিও নয়। অবিরাম চলে এর সৃষ্টি লীলা। ঘটনা অতীত হয়ে যায়, ইতিহাস তার দাগ রেখে যায়। ভগ্ন দূর্গ প্রাকারের এক একটি ভাঙা ইটে। সে চিহ্ন কখনো থাকে একটি দীর্ঘকায় প্রাসাদ সোপানে, কেথাও বা সে চিহ্ন থাকে না, কিন্তু ইতিহাসের সেই সব ঘটনার একটি অশরীরী রূপকেই জীবন্ত করে রাখে কিংবদন্তি।

মসজিদ, মন্দির, মাজার, আস্তানা, আশ্রম, ধাম, গোরস্থান, সমাধি, শ্মশানঘাট, বিহারস্তূপ, গির্জা, জমিদার ভবন, নীলকুঠি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সকল কাহিনি গড়ে উঠেছে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কিংবদন্তি বলা হয়ে থাকে।

হযরত ঘাসী দেওয়ানের মাজার

হযরত ঘাসী দেওয়ানের মাজার চলনবিল এলাকার ডাহিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত তিসিখালী নামক স্থানে বানগঙ্গা নদীর পাশে অবস্থিত। এই ঘাসী দেওয়ান কে এবং কোথা থেকে এসেছেন সে ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কথিত আছে, সুদূর আরব দেশ থেকে হযরত বড়ো পির আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-র স্বপ্ন নির্দেশে প্রথমেই তিনি এখানে আসেন। বিলের মধ্যে একটি মাত্র আটচালা ঘর। সেটিই

www.pathagar.com

ঘাসী দেওয়ানের আস্তানা বা মাজার। তিসিখালী এলাকায় হযরত ঘাসী দেওয়ান সম্পর্কে প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের কিংবদন্তি। সম্প্রতি চলনবিলের যোগেন্দ্র নগরের জনৈক হুসাইন মোহাম্মদ ইউনুছ আলোর দিশারী হযরত ঘাসী দেওয়ান নামক একটি কবিতায় এই তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং সেখানে হযরত ঘাসী দেওযানকে হযরত শাহ মখদুম ওরফে সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুসের সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘাসী দেওয়ানের মাজার সম্পর্কে কিংবদন্তি সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা যায় যে, একদিন বরিয়া গ্রামের হিন্দু জমিদার কামিনীমোহনের পত্নী স্বপ্নে দেখেন, জনৈক মুসলিম ফকির তাঁর জন্যে চলনবিলের ডাহিয়া-দাগিয়া মাঠের একটি দহের ওপর ঘর তৈরি করে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। জমিদারও তার স্ত্রীর মতো একই স্বপ্ন দেখলেন। স্বপাদেশ মোতাবেক জমিদার খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে, দহে অথৈ পানি। তিনি খুব চিন্তায় পড়লেন। পানির ওপর তিনি কিভাবে ঘর তৈরি করবেন। কয়েকদিন পর দেখা গেল ঐ দহে কোনো পানি নেই, চর জেগেছে। তখন জমিদার সেই চরের ওপর একটি আটচালা ঘর তৈরি করলেন। এভাবে দাহিয়ার মাঠে ঘাসী দেওয়ানের আস্তানা প্রতিষ্ঠিত হলো। কেউ কেউ তাকে গত্তসে দেওয়ানও বলে থাকেন। কিভাবে তাঁর নাম ঘাসী দেওয়ান হলো এ নিয়েও রয়েছে কিংবদন্তি। ঘাসী দেওয়ান দাহিয়ার মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন এবং আটচালা ঘরে বসে ধ্যান করতেন। বিশেষ করে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে তার মিতালি গড়ে ওঠে। রাখাল ছেলেরাও তার সঙ্গে মিশে আনন্দ পায়। একদিন হলো কি, দেওয়ান সাহেব মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বিলে প্রচুর তিসি বা তিল ফলের চাষ হয়েছে। দেওয়ান সাহেব ঘুরতে ঘুরতে ভুলক্রমে অজ্ঞাতসারে একটি তিলফল মুখে দেন। ফলটি তাঁর পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তিনি দৈববাণী শুনতে পান-ঘাসী দেওয়ান, তুমি ভুল করলে, মালিকের অনুমতি ছাড়া তার ক্ষেতের ফসল মুখে দিয়ে অন্যায় করেছ। ঘাসী চমকে উঠলেন, তখনি ওয়াক-থু করে বমি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তিনি আরও শুনতে পেলেন কে যেন বলছে-তুমি ঐ জমির মালিকের নিকট গিয়ে মাফ চেয়ে এস। আর জানবে তুমি যে অন্যায় করেছ তার শাস্তি। ঘাসী দেওয়ান লজ্জিত হলেন। বললেন কী এর শাস্তি? জবাব এল বার বছর বিনা বেতনে তার অধীনে চাকরি। ঘাসী দেওয়ান তখনি পাগলের মতো ছুটলেন মালিকের সন্ধানে। ঘাসী জানতে পারলেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক হিন্দু গোয়ালা পরিবারের জমি ওটা। তিনি মালিকের কাছে গেলেন এবং মিনতি করলেন যে, তিনি অপরাধী। তাকে যেন মাফ করে দেওয়া হয়। গোয়ালা দম্পতি সব শুনলেন এবং বললেন এ আবার এমন কি অপরাধ যে মাফ করতে অসুবিধে হবে! তারা ঘাসীকে মাফ করে দিলেন। এবার ঘাসী তার অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করলেন। তাকে বার বৎসরের জন্যে চাকর রাখতে হবে। নইলে তার গুনাহ মাফ হবে না। গোয়ালা দম্পতি অবাক হলেন, তাদের তো চাকরের কোনো প্রয়োজন নেই। আর বিনা অপরাধে তিনিই বা অনুচর হতে যাবেন কেন! কিন্তু ঘাসী দেওয়ান তাঁর অপরাধ স্খলনের জন্যে এ আবদার তুলে নিতে রাজি হলেন না। অতঃপর গোয়ালা দম্পতি তার প্রস্তাবে রাজি হলেন।

ঘাসীর কাজ হলো গোয়ালের গরুর খোজ খবর রাখা ও ঘাসের জোগান দেওয়া। তিনি কোনো বেতন নিতে রাজি হলেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঘাসী অতি অল্প সময়ের

www.pathagar.com

মধ্যেই অলৌকিক উপায়ে বাইশ গজী নৌকা ভর্তি করে ঘাস কেটে আনেন। সকলেই অবাক হয়। মাঠের রাখালদের সঙ্গে তার বিশেষ মিতালি গড়ে ওঠে। সকলে তাঁকে ঘাসী বলে অভিহিত করে। তিনি ঘাস কাটেন তাই তাঁর নাম ঘাসী। যতদূর জানা যায় ঘাসী একাই দশ জনের কাজ করতেন। যেহেতু তিনি অতি অল্প সময়ে এক নৌকা বোঝাই করে ঘাস কেটে আনতেন, এ বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো এবং সকলেই বিশ্বাস করত যে ঘাসী কোনো সাধারণ মানুষ নয়। সে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে সব কিছু করে থাকেন। যেহেতু তিনি তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে ঘাস কাটতেন সে কারণে সকলেই তাকে ঘাসী দেওয়ান বলতে থাকে। তখন থেকে তিনি ঘাসী দেওয়ান হিসেবে পরিচিতি পান। একদিন গোয়ালা পত্নী রাতের আঁধারে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন ঘাসী ঘরে নেই। তার বদলে পার্শ্ববর্তী পুকুরে রাখা বাইশগজী নৌকা জুড়ে একটি লোক ঘুমিয়ে আছে। তিনি কাছে গিয়ে দেখেন লোকটি আর কেউ নয়, তাদেরই চাকর ঘাসী। তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন। গৃহস্বামী গোয়ালা ঘাসীর কথা শোনেন। কিন্তু তার বিশ্বাস হতে চায় না। তিনি এটি নিজের চোখে দেখতে চান।

আর একদিন গোয়ালা পত্নী দেখেন, সেই নৌকার ওপরে বসে ঘাসী তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে সাবান দিয়ে তা পরিস্কার করছেন। কে এই ঘাসী? গোয়ালিনি ভাবেন। গোয়ালাকে তিনি ঘটনাটি বলেন। অবশ্য তারা ফিরে এসে আর সে ঘটনা দেখতে পান না। ততক্ষনে ঘাসী তাঁর কাজ সেরে ফেলেছেন।

ঘাসীর কাজ সবই অলৌকিক। অতবড়ো নৌকা বোঝাই করে তিনি ঘাস কোথা থেকে আনেন, আর এত অল্প সময়ে এ ঘাস যোগাড়ই বা হয় কোথা থেকে, গোয়ালা দম্পতি তা ভেবেই পান না। তারা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝতে পারেন, ঘাসী কোনো সাধারণ মানুষ নন। তারা তাকে মুক্তি দিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করেন। এদিকে তাঁর বার বছর পূর্ণ হয়ে যায়। ঘাসী তার মনিব দম্পতিকে দীক্ষা দিয়ে সঙ্গী করে নেন। গোয়ালা দম্পতিও ঘর সংসার ত্যাগ করে আল্লাহর নামে ঘাসীর সহযোগী হন। এখন আর তিনি ঘাসী মাত্র নন। হযরত ঘাসী দেওয়ান। দেখতে দেখতে তার বহু মুরিদ জুটে যায়। তিনি ডাহিয়ার বিলে সেই আটচালা ঘরের কাছে আস্তানা করে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম ও জনসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। সকলেই তাকে এখন ঘাসী দেওয়ান বলে অভিহিত করেন।

জনশ্রুতি আছে একদিন ঘাসী দেওযান কতিপয় লোক নিয়ে গল্প গুজব করছিলেন। হঠাৎ তিনি পেছনের দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন এবং তার সমস্ত শরীর ও মুখমন্ডল ঘেমে উঠল, উপস্থিত লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন দুখানা মাল বোঝাই নৌকা চলনবিলের ঢেউয়ের আঘাতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি নৌকা দুখানা টেনে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসেন। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা গেল মাল বোঝাই দুটি নৌকা ঘাটে এসে ভিড়ল এবং মাঝিরা জানাল তারা ঘাসী দেওয়ানের সহায়তায় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এমনি বহু অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে এ অঞ্চলে।

www.pathagar.com

ঘাসী দেওয়ান মারা গেলে তিসিখালীতেই তাকে সমাহিত করা হয় এবং তার কবরের পাশে গোয়ালা দম্পতিসহ দুই রাখাল শিষ্যকেও কবর দেওয়া হয়। পরে ঘাসী দেওয়ানের কবরই হয়ে ওঠে ঘাসী দেওয়ানের মাজার। ঘাসী শব্দের অর্থ ধর্মযোদ্ধা। তিনি যেহেতু অলৌকিক উপায়ে গরুর ঘাস কাটতেন সে কারণেই হয়তো লোকজন তাঁর নাম দিয়েছেন হযরত ঘাসী দেওয়ান। প্রতি বছর চৈত্র মাসে চাঁদের অষ্টমীর দিনে এখানে বিরাট মেলা বসে। লোকে পির ঘাসী দেওয়ানের মাজারে বহু প্রকার শিরনি দিয়ে থাকেন। নগদ টাকা, চাল, ডাল, খাসি, মোরগ-মুরগি প্রভৃতি সদকা হিসাবে মেলার দিন দরগায় জমা হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষই সেখানে সমবেত হন। গ্রামের চাষীরা সারা বছরই ফসলের অংশবিশেষ ঘাসী দেওয়ানের দরগায় দান করেন। লোকের বিশ্বাস ঘাসী দেওয়ানের দরগায় ফসল দান করলে ফসলের ফলন অনেক বেশি হবে এবং অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। অনেকেই নাকি তার ফল হাতে হাতেই পেয়েছেন। ঘাসী দেওয়ানের কাহিনিতে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের এক কল্যাণকর দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের এ এক বড়ো বৈশিষ্ট্য।

লোকধর্মে পিরেরা চিরদিনই শ্রদ্ধা অর্জন করে থাকেন মূলত তাদের জীবন দর্শন নির্ভর অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রচারের মধ্য দিয়ে। ঘাসী পির অনৈতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও লোকসমাজে নিজের অস্তিত্বের যে সুদৃঢ় ভিত নির্মান করেছেন তার গুরুত্ব উপেক্ষ্যনীয় নয়।

বৃক্ষলতা ও পশুপাখি সম্পর্কিত কিংবদন্তি

বন-উপবন, গাছ-গাছড়া, পশু-পাখি উদ্ভিদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশকিছু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। গ্রামের আমবাগান, বাঁশ ঝাড়, তাল, নারিকেল, সুপারি ও খেজুর বন নিয়েও রয়েছে নানা কিংবদন্তি। 'গাছের মাইর দ্যাশের বাইর' প্রবাদটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পির বাংলা-তলা

নাটোর জেলার লালপুর থানাধীন নবীনগর গ্রামে পির বাংলাতলা অবস্থিত। এটি আসলে একটি নিমগাছ। গাছটির বয়স কত সঠিক তথ্য নেই। তবে স্থানীয় প্রবীনদের কাছ থেকে জানা যায় গাছটির বয়স প্রায় ৩০০ বছর। এক সময় পদ্মা নদী এই নিম গাছের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। জানা যায় বহুকাল আগে এই জায়গায় এক ধনী সওদাগরের সোনার নৌকা ডুবে যায়। যার গলুইয়ের ওপর এই গাছটির জন্ম। এছাড়াও বলা হয় যে সুদূর বাগদাদ থেকে জনৈক পির সাহেব বাংলায় আসেন এবং এই নিমতলায় তাঁর আস্তানা তৈরি করেন। সেই থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে পির বাংলাতলা।

বর্তমানে পির বাংলাতলা থেকে নদী প্রায় ২/৩ কি. মি. সরে গেছে কিন্তু কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে সেই ৩০০ বছরের পুরনো নিমগাছটি। নদী দূরে সরে গেছে, পির সাহেব মারা গেছেন, কিন্তু নিমগাছটি কিংবদন্তি হয়ে লোকমুখে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। প্রতিবছর ১লা বৈশাখে এখানে মেলা বসে। দূর-দূরান্ত থেকে কৌতুহলী এবং উৎসুক মানুষ এখানে আসেন, এই গাছটাকে একবার দেখতে অথবা শিরনি দিতে। এই পির বাংলাতলাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মধ্যে নানা ধরনের কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

পির বাংলাতলার খাদেমের কাছ থেকে জানা যায় যে, এই গাছের ডাল কেটে পার্শ্ববর্তী গোরস্থানের খাদেম মানিক মণ্ডল ২৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যান। ঐ দিনটিতে মানিক মণ্ডলের মেয়ে মিনু নাকি এখনো প্রতিবছর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এলাকার জনসাধারণ বিশ্বাস করে যে, মানিক মণ্ডল নিম গাছের ঐ একটি ডাল কেটেছেন বলেই এমন হয়।

বর্তমানে গাছ এবং জমির মালিক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এই গাছের নিকট থেকে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। যে জমিতে গাছটি রয়েছে তিনি সেই জমি চাষ করেন না। কেন চাষ করেন না প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, মানিক মণ্ডল মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি আর জমি চাষ করেন না। এলাকার লোকজন সবাই বিশ্বাস করেন, এখানে একজন জাগ্রত ওলি বা সাধক বাস করেন। এখনও এলাকার হিন্দু, মুসলিমসহ সব ধর্মের মানুষই এখানে শ্রদ্ধা জানান এবং বিপদ আপদে মানত করে উপকার পেয়ে থাকেন।

মানিক মণ্ডল আরও জানান, এই গাছের অদূরে বাস করতেন সুরাত সরদার। একদিন এই সুরাত সরদার গাছটির কাছে কোদাল দিয়ে জমি পরিস্কার করছিল। হঠৎ তার কোদালে উঠে পড়ে একটি সোনার বালা। সোনার বালা পেয়ে গরিব সুরাত সরদার তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে। হঠাৎ রাত্রে সে স্বপ্নে দেখে এক দরবেশ সোনার বালাটি ফিরিয়ে দিতে বলছে এবং আরো বলছে- তুই বালাটি ফিরিয়ে দে, তোর মঙ্গল হবে। সুরাত সরদার স্বপ্নটিকে মনের ধাঁধা মনে করে বালাটি ফেরত দিতে গড়িমসি করতে থাকে। তিনদিন পর চোখে হঠাৎ কম দেখতে শুরু করে সে। বালা পাওয়ার তিন দিনের মধ্যেই তার বাম চোখটি একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়। সেই দরবেশ আবার স্বপ্নে সুরাত সরদারকে আদেশ করে বলেন যে দে দে দে, আমার প্রাণের ময়নার সোনার বালাটি ফিরিয়ে দে, দে। এতে সুরাত সরদার ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোথায় সোনার বালা? বালাটি ততদিনে স্যাকরার দোকানে।

ইতোমধ্যে সুরাত তার ভালো চোখটিতেও ঝাপসা দেখতে শুরু করে। তার বড়ো ছেলে আতা বালাটি ফেরৎ দেওয়ার জন্যে পিতাকে অনুরোধ করে। কয়েকদিন পর সুরাত সরদারের ছেলেটি ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায়। তাড়াতারি সুরাত তার মেজ ছেলে সাত্তারকে পাঠিয়ে স্যাকরার দোকান থেকে অন্য একটি বালা আনিয়ে গাছতলায় ফেলে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। দরবেশ সুরাত সরদারের ওপর খুশি হন। সুরাতের অন্যান্য ছেলেরাও শিরনি মানত দিয়ে মাফ চায় দরবেশের নিকট। শুধু তাই নয়, যেহেতু দরবেশ সাহেব বলেছিলেন বালাটি ফেরত দিলে তাদের মঙ্গল হবে; সেই কারণেই হয়তো দরবেশের ইচ্ছায় তারা এখন স্বচ্ছল। সুরাত সরদারের ছেলেদের দোতলা বাড়ি হয়েছে। সরদার বেঁচে নেই। তবে এখনও নাকি গভীর রাতে সেই নিমগাছ তলায় গেলে শোনা যায় কে যেন বলছে, দে...দে...দে আমার প্রাণের ময়নার সোনার বালাটি ফিরিয়ে দে...দে।

পির বাংলা তলা সম্পর্কে আরও জানা যায় এখনও নাকি লোকজন ঐ নিমগাছ তলায় এক জটাধারী সন্ন্যাসীকে দেখতে পান। মানুষের ধারণা সুদূর বাগদাদ থেকে আগত এক অজ্ঞাত দরবেশই এখানে অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি মাঝে মাঝে আসেন এই গাছ তলায়। নদীর তীর ঘেঁষে লালপুর থানা। এক সময় লালপুর ছিল বিরাট নদী

www.pathagar.com

-বন্দর। এখানে প্রাচীনকালেও নদী পথে আগত বহু নাবিক, সওদাগর, বণিক, রাজা-বাদশা, পণ্ডিত, পরিব্রাজক, নীলকর সাহেব ও পির আওলিয়াদের পদচারণা ছিল।

জলাশয় বিষয়ক কিংবদন্তি

পুকুর-দিঘি, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর কেন্দ্র করেও অনেক লৌকিক কাহিনি সৃষ্টি হয়েছে।

জলাশয় সম্পর্কিত কিংবদন্তির উৎস আলোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন কারণে এই সব কিংবদন্তি বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ হয়ত দিঘি খনন করেছেন এবং সাধারণ মানুষ কৃতজ্ঞতাবশত তাঁর নামটি দিঘির সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আবার কোনো জলাশয় খননের সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এমন কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে যার ফলে জলাশয়ের সঙ্গে সেই ঘটনা বা দুর্ঘটনা যুক্ত হয়ে কিংবদন্তি তৈরি হয়েছে। আবার দীর্ঘ প্রান্তরের মধ্যে একটি বিরাট দিঘি, পুকুর বা বিস্তীর্ণ জলাশয় মানুষের মনে অনেক সময় বিস্ময় বা ভীতির সৃষ্টি করে এবং তার পরিণতি স্বরূপ মুখে মুখে নানা কল্পকাহিনি রচিত হয়।

দানপড়া পুকুর

নাটোর জেলার লালপুর থানায় অমৃতপাড়া গ্রামে পুকুরটি অবস্থিত। প্রায় ১২ বিঘা জমির ওপর উত্তর দক্ষিণ দিকে লম্বালম্বি পুকুরটি খনন করা হয়েছে। পুকুরটি কবে, কার দ্বারা খনন করা হয়েছে এ বিষয়ে সঠিকভাবে কেউ কোনো তথ্য প্রমাণ দিতে পারেননি। তবে পুকুরটির নামকরণ এবং খনন নিয়ে নানা প্রকার কিংবদন্তি প্রচলিত আছে মানুষের মধ্যে। জনৈক হিন্দু জমিদার উক্ত পুকুরটি খনন করেন বলে অনেকে পূর্ব পুরুষদের নিকট শুনেছেন। জনশ্রুতি আছে যে, পুকুর যখন খনন করা হয় তখন একজন শ্রমিকের মজুরি ছিল পঁচিশ পয়সা। কিন্তু উক্ত জমিদার এতটাই ধনী ছিলেন যে, তিনি বেতের তৈরি ধামাতে কাঁচা টাকা নিয়ে বসে থাকতেন এবং একজন মজুর যত ডালি মাটি তুলতেন তাকে ততটি কাঁচা টাকা দিতেন। আরও জনশ্রুতি আছে যে, জমিদার ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল এবং স্নেহপ্রবণ। তিনি জীবিত অবস্থাতেই তার অত্যন্ত স্নেহের একমাত্র কন্যাকে পুকুরটি দান করে দেন। তাই পুকুটির নামকরণ হয় 'দানপড়া' পুকুর।

আবার এও শোনা যায়, জনৈক হিন্দু জমিদার এই এলাকার গরিব প্রজাদের খাবার পানির সংকট নিরসনের জন্যে উক্ত দিঘি খনন করান। তবে সেই জমিদারের পরিচয় সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। অনেকে জানান জমিদার ছিলেন অত্যন্ত দানশীল এবং প্রজাবৎসল। প্রজাদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্যে, বিশেষ করে পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্যেই শুধু দিঘিটি খনন করান নি, তিনি তা প্রজাদের উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন যদিও সেই মর্মে কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায় নি। পুকুরটির পূর্বপার্শ্বে একটি ঘাটের চিহ্ন এখনও পড়ে আছে। আছে কয়েকটি প্রকাণ্ড ইটের দেওয়াল। জানা যায় ঐ ঘাটের কাছে বর্তমানে কেউ যায় না। কারণ সেখানে রয়েছে বিষাক্ত সাপে কাটার ভয়।

www.pathagar.com

এই পুকুর সম্পর্কে অত্র এলাকার মানুষের মধ্যে আরও নানা প্রকার কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। পূর্বে এই পুকুরে ছিল তালগাছের মতো একটি বিরাটকার অজগর সাপ। সাপটি কিনারায় শুয়ে ছিল বহু বছর। মানুষ জানত না এটি সাপ। কারণ সাপটি কখনও কাউকে দংশন করেনি বা কারো কোনো ক্ষতি করেনি। মানুষজন জানত এটি তালগাছ। তাই মানুষ এর ওপর কাপড় কাচত। বাচ্চারা লাফালাফি করত। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন ঘটে যায় নাটকীয় ঘটনা। কোনো এক দুষ্ট বালক দা দিয়ে গাছটিতে কোপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। কারণ মানুষ ভয়ে গাছের ওপর ওঠাতো দূরের কথা পুকুরে তখন নামতেও সাহস পাচ্ছে না। শত শত মানুষ কি ঘটে দেখতে ভিড় জমায় পুকুর পাড়ে। ইতোমধ্যে মানুষের মধ্যে বলাবলি শুরু হলো এটি একটি অজগর সাপ। যে সকল মানুষ তার শরীরের ওপর উঠত, বসত, গোসল করত তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এবং ভয়ে কেউ আর পুকুরে নামল না। তারপর থেকে কেউ আর দীর্ঘদিন ধরে ঐ পুকুরে নামেনি। সাপটি কোথায় গেল প্রশ্ন করলে অনেকে জানান যে একবার বিরাট বন্যায় পুকুর ভেসে গেলে ঐ অজগর সাপটি ভেসে চলে যায়। তবে পুকুরের চার পাড়ে এখনও রয়েছে প্রচুর গাছপালা।

কথিত আছে, বহুদিন আগে ঐ পুকুর পাড়ে যে বিশাল বটগাছ ছিল তার নিচে ছিল একটি বিশাল গড়। আর ঐ গড়ে বাস করত ৮টি কুমির। একদিন জনৈক মহিলা ঐ পুকুরে গোসল করতে গেলে একটি কুমির তাকে ধরে নিয়ে যায়। সে আর কখনও ফিরে আসে নি। এমনি শুধু একজন নয়, একাধিক মানুষকে যখন ঐ কুমিরের দল খেয়ে ফেলতে থাকে তখন বিষয়টি এই এলাকার জনমনে দারুণ ভীতি এবং আতংকের সৃষ্টি করে।

এলাকায় ডাকা হয় মিটিং, সিদ্ধান্ত হয় একজন মন্ত্রসিদ্ধ ম্যালচাকে (সাঁওতাল) ডেকে নিয়ে আসতে হবে এবং যথারীতি একজন ম্যালচাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। ম্যালচার পরামর্শ মোতাবেক পুকুর পাড়ে তৈরি করা হলো মন্দির। ঢাক ঢোল বাজিয়ে তিনদিন ধরে জনৈক দেবতার উদ্দেশ্যে পূজো এবং ভোগ দেওয়া হলো। ডাকা হলো ঐ এলাকার জল্লাদকে যিনি কালী পূজায় পাঁঠা বলি দিয়ে থাকেন। একে একে আটটি পাঁঠা বলি দেওয়া হলো। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। কারণ মানুষের সঙ্গে কুমিরের লড়াই, বিষয়টি এলাকাব্যাপী বিস্ময় সৃষ্টি করে। ঠিক তিন দিন পর শুরু হয় কুমিরের সঙ্গে লড়াই কিন্তু সেই লড়াই কেউ দেখতে পায় নি কারণ কুমির তো সব আশ্রয় নিয়েছিল উক্ত গড়ে। শেষে দেখা যায় ম্যালচা একটি লোহার তৈরি বড়ো ত্রিশূল নিয়ে একটি একটি করে কুমিরকে আঘাত করে মৃত অবস্থায় বের করে আনতে থাকে। একে একে আটটি কুমির ঐ গড় থেকে সে বের করে নিয়ে আসে এবং লোকজন কুমিরের হাত থেকে মুক্তি পায়।

আরও জানা যায়, পুকুরটি পূর্বে মানতের শিরনি খেত। অনেকেই পুকুরে দুধ, চিনি, গাছের নতুন ডাব এবং চৈতালি মানত দিত। এই এলাকার বহু মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধিও নাকি মানত দিলে ভালো হয়ে যেত। গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বললেন,

www.pathagar.com

তার শরীরে একটি আঁচিল উঠলে সে তার মায়ের পরামর্শে উক্ত পুকুরে আটটি ডুমুর মানত করলে তার আঁচিল ভালো হয়ে যায়। আরও জানা যায়, উক্ত পুকুরে মানত করার রীতি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যদি কেউ আটটি ডুমুর মানত করে তাকে দিতে হবে ষোলটি ডুমুর। এই রীতি অনুযায়ী লোকজন মানত দিত। উল্লিখিত কিংবদন্তিগুলো তারা সকলেই শুনেছে তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট।

কথিত আছে, ঐ পুকুরে ছিল একটি বোয়াল মাছ। মাছটি নাকি মাঝে মধ্যেই ভেসে উঠত এবং ঐ মাছের মাথার ওপর দেখা যেত সিদুঁর, কানে থাকত সোনার বালা। কেউ কেউ বলেন এটা কোনো মাছ নয়। তাদের মতে পুকুরের মালিক জনৈক মহিলা বোয়াল মাছ রূপে মানুষের মাঝে দেখা দিত।

আলোচ্য কাহিনিতে অজগরের দীর্ঘদিন কাঠরূপে ভাসমান থাকা কিংবা দিঘির সন্নিকটে গড়ে কুমির বাস করা কোনোটাই রূপকথা নয়, হয়তো সাপ ছিল, চড়া মাছ ছিল, দিঘি মরে গিয়েছিল অর্থাৎ পানি বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল যার ফলে জীবনাবসান ঘটেছিল কিছু মানুষের। এগুলো কেউ দেখেনি, সবই বংশ পরম্পরায় চলে আসা লোককাহিনি।

গ. লোকছড়া

ছড়া বাংলা লোকসাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন। এটি লোকসাহিত্যের অতি জনপ্রিয় একটি শাখা। নাটোর জেলার লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম শাখা হলো ছড়া। মানুষ তাদের মনের কথা ছড়া আকারে প্রকাশ করে আনন্দ লাভ করে। নাটোর জেলার মানুষ অত্যন্ত আমুদে। তারা অবসর সময়ে আনন্দ-আয়োজনে মেতে ওঠেন। গ্রামের বয়স্ক মানুষ তাদের নাতী-নাতনিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকার ছড়া কেটে উৎসবমুখর করে রাখেন চারপাশ। সে রকমই বেশ কিছু ছড়া নিচে উল্লেখ করা হলো :

ছড়া-১
বাড়ির কাছে ধানের ভিঁ (জমি)
লক্ষ লক্ষ শিষ
বন্ধু যদি বিদ্যাশ যায়
খাব আমি বিষ।

ছড়া-২
আম ধরে ঝোঁপা ঝোঁপা
তেঁতুল ধরে বাঁকা
দেশের বন্ধু বিদেশ গিলে
আর না হবে দেখা।

ছড়া-৩
ঘরের পিছে মেন্দি গাছ
মেন্দির বরণ লাল

www.pathagar.com

তোমার আমার ভালোবাসা
থাইকবে চিরকাল ।

ছড়া-৪
পানতা ভাতে মরিচ পুড়া
গরম ভাতে ঘি,
বন্ধুর সাথে প্রেম করিতে
লজ্জা-সরম কি?

ছড়া-৫
গাছটি হলো সবুজ বন্ধু
ফুলটি হইলো লাল
তোমার আমার ভালোবাসা
থাইকবে চিরকাল ।

ছড়া-৬
পুকুর যখন কাইটাছি
মাছ আমি ছাইরবো
ভালো যখন বাইসেছি
বিয়া আমি কইরব ।

ছড়া-৭
গোলাপ ফুল দেখতে ভালো
কিন্তু আছে কাঁটা
ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে
জীবন হয় ফাটা ।

ছড়া-৮
যে আবার চেহারা
তার নাম পিয়ারা ।

ছড়া-৯
তমাল তলার ঘাটে
তেবাড়িয়ার হাটে
ধারা হবে দুই ধারা
পাড়া হবে এক পাড়া
চলা যাবে না বাড়ি ছাড়া ।

ছড়া-১০
হাগা লরে বাঘা লরে
লরে গাছে তাল

www.pathagar.com

এই হাগা হাগবো আমি
পরদিন সকাল।

ছড়া-১১
পুকুরেতে পানি নাই
পানা কেনে ভাসে
যার সাথে ভাব নাই
সে কেনে হাসে।

ছড়া-১২
আলু বাগুন তরকারি
মেয়েদের মন সরকারি
চেংরারা কয় ভালোবাসি
মেয়েরা কয় সেন্ডেল মারি।

ছড়া-১৩
আলু খাইতে বালু বালু
কপি খাইতে পানি
গত রাতে স্বপ্নে দেখি
তুমি আমার সোয়ামি।

ছড়া-১৪
সাইকেলের দুই চাকা
ভ্যানের টিউব
তোমায় আমি ভালোবাসি
I love you.

ছড়া-১৫
আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মৌ
তোমায় আমি ঘৃণা করি
I hate you.

ছড়া-১৬
ওয়ান টু থ্রি
পইড়ি পাইলাম বিড়ি
বিড়িত নাই আগুন
পাইলাম একটি বাগুন
বাগুনে নাই বিচি
পাইলাম একটি কেচি
কেচিত নাই ধার

www.pathagar.com

পাইলাম একটি হার
হারে নাই লকেট
পাইলাম একটা পকেট
পকেটে নাই টাকা
চলে গেলাম ঢাকা
ঢাকায় নাই গাড়ি
চলে আইলাম বাড়ি
বাড়িত নাই ভাত
পুটকি শুকায় থাক
পুটকির হইল গন্ধ
ডাক্তার খানা বন্ধ।

ছড়া-১৭
মিদুল তুল তুল
আর যাবে না লক্ষীকূল
নলে কাইটলো গোয়া
রক্ত পড়ে পোয়া পোয়া।

ছড়া-১৮
ধান লারো ধান চারো
ধানে দাও পাও
পরের উপর হাটে যাও
কি কি সদায় চাও।

ছড়া-১৯
রত্নকরে লিখি দিলাম
যত্ন কইরে রাইখো
আমার কথা মনে হইলে
রোমাল খুইলে দেইখ।

ছড়া-২০
তেজ পাতাতে তেজ করি
গোলাপ ফুলের বাসনা
সত্যি করে বলছি আমি
তোমায় ভালো বাসি না।

ছড়া-২১
বাড়ির কাছে ধানের ভুঁই
লক্ষ লক্ষ শিষ,
বন্ধু যদি বিদেশ যায়
খাব আমি বিষ।

www.pathagar.com

ছড়া-২২
খরের পিছে তাল গাছ
গোড়ায় গোড়ায় টিয়া
বন্ধুর সাথে দ্যাখা হইবে
সংসদ ভবন গিয়া।

ছড়া-২৩
পান খালি তার স্বাধ লাগে না
স্বাধ লাগে তার চুনে
রূপ দেইখে তার মন ভরেনা
মন ভরে তার গুণে

ছড়া-২৪
ঘুম আলার বেটি ঘুম দি যা
ছালা ভরা টাকা
গুনি লিয়া যা।

ছড়া-২৫
গোলাপ ফুল তুইলতে গ্যালে
কাঁটার গুতা খাইতে হয়
প্রেম করতে হলে
লোকের কথা শুনতে হয়।

ছড়া-২৬
আয় ঘুম উড়িয়া
মনজার গাছ পড়িয়া
কোলা কাটলে কোলা দেব
গাই বিয়ালে দুধ দেব
দুধ খাওয়ার বাটি দেব
আমার হাপসারের চোখে
ঘুম দিয়া যা।

ছড়া-২৭
আমার ছেলে ভালো
আম কুড়াইতে গেল
একটা আম পাইল
ছেইলি ধইরে খাইল।

ছড়া-২৮
যে আমার চেহারা

www.pathagar.com

কুত্তি দেয় পাহারা
নাম তার পিয়েরা।

ছড়া-২৯
বাতান দারি ঝি
ঝগড়া করবনা তো কি,
ঝগড়া কইরব তালে তালে
লেইজ দেব তোর বাপের গালে।

ছড়া-৩০
কুচ কুচ কালো কাক
ডাকে খালি খালি
খোকনের চোখে দেব
কাজলের কালি।
ছোটো পাখি আনে দেখি
রং মাখা ফুল
তাই দিয়া খোকনের
বেইধে দেব চুল।

ছড়া-৩১
এই বাড়ি দেখছি পাকা
ভিতরে যাইয়া দেখেন ফাঁকা
ঘাইটি খাই দুইটি আটা
তাই খাইয়া ভর দিন হাঁটা।

ছড়া-৩২
এক পটলে ভাজি ভুজি
দুই পটলের ঝোল,
কান্দিছ নারে কোলের ছেলে
টাক ডুমা ডুম্ ডুম্।
কলা খাইলে গলা ব্যাথা
পেয়ারা খাইলে প্যাট ব্যাথা
আলু খাইলে ক্যানসার
হাই ইস্কুলের ডানসার।

ছড়া-৩৩
বাবু নাইরে অঙ্গি
বাঘ ভালুকের সঙ্গী
ভালুক যখন নাচ করে
খোপায় খোপায় ফুল পরে।

www.pathagar.com

বাবু নাইরে এলা
গাছে ধইরছে কলা
একটা কলা হাতে দিলি
বাবু করে খেলা ।

ছড়া-৩৪
আমার ময়না ভালো
কাঁটা কুড়াতে গেল
কাঁটার মালা গলায় দিয়া
বউ আনতি গেল
বউ কতি থোব?
নিম তালার খাদি
নিম পইলো বুকে
হাজি আইল নিতি ।

ছড়া-৩৫
ছোটো ছোটো কল্লির ফুল
দামান গেল কত দূর ।
দামান আইল ঘামি
ছাতি ধর নামি
ছাতির উপর কমেলা
নাচে বিবি জামেলা
কলক তার আয়না
মুখ দেখতে হয় না
ও বিবি কেন্দনা ।

ছড়া-৩৬
আড়ি বুল্লা বাড়ি বুল্লা
খুদি বুল্লার চাক
হাত দিয়া ভাঙ্গি আনব
চুপ কইরা থাক ।

ছড়া-৩৭
গ্রামের নাম চৌগাছি
চাক বাধেছে মৌমাছি
মোর মধুর চাকে মধু নাই
পুতুল খেলার বউ নাই ।

www.pathagar.com

ছড়া-৩৮

বট তলাতে আগডুম
বেশ পড়েছে টাকডুম
ইতিন রিতি খিন্‌তা
হাওয়াই উড়ে চিন্তা।

ছড়া-৩৯

সহেশপুরের করম শেখ
খাইচ্ছে দেখ গরম কেক
কেকের মধ্যে লেবুর টক
মুখে শুধু বকর বক।

ছড়া-৪০

তমাল তলার ঘাটে
তেবাড়িয়ার হাটে
ধারা হবে দুই ধারা
পাড়া হবে এক পাড়া
চলা যাবেনা গাড়ি ছাড়া।

ছড়া-৪১

এক কানে দুল
এক কানে ফুল
চল মাগিরে গোপালপুর
আম ধরে ঝোপা ঝোপা
তেতুল ধরে বাঁকা
দেশের বন্ধু বিদেশ গেলি
আইসলে হবে দেখা।

ছড়া-৪২

কুচি কুচি পাইরা
কুচি যখন পাকপে
সব লোকে দেখবে,
আমরা দুই বোন ফুলের মতো
বাপ যখন বেটি কে বিয়ে দিবে মনের মতো
বিটি যাবি অফিসে, পানি খাবি গেলাসে।

ছড়া-৪৩

হাগা লরে, বাঘা লরে
লরে গাছে তাল

www.pathagar.com

এই হাগা হাগব আমি
পরদিন সকাল ।

ছড়া-৪৪
হাজির ব্যাটা পাজি
মোল্লার ব্যাটা চোর
ঐ পাড়াতে গাই মরেছে
ধামা লিয়া দৌড় ।

ছড়া-৪৫
বুলবুলি বুলবুলি তোমার পুটকি ক্যা লাল
আল্লাতালায় বানাইসে তো হিন্দু মুসলমান ।

ছড়া-৪৬
শীত পায় গীত গায়
মনি হারা ফনি পানা
পান খাই গান গাই
উচা ভিটা টনক মাটি
ফুল ফুটিয়ে নানান জাতি ।

ছড়া-৪৭
তারার মা বাড়া বানে
তারা খায় খুদ
আম তালাদি হরিণ যায়
তারার মায়ের পুত ।

ছড়া-৪৮
পুরিতে পুরুষ
ওড়িতে ছাই
তবু পুরুষকে
কোনো বিশ্বাস নাই ।

ছড়া-৪৯
লতা পাতা ছন্দ
হাতের লিকা মন্দ
যদি বল খাতা কার
ওপরে দেকো নাম তার ।

www.pathagar.com

ছড়া-৫১

This is some খেলনা
You মোরে ভুলনা
Happy হব দুজনা
Nice তোমার চেহারা
Sweet তোমার হাসি
সত্যি কইরে বলছি আমি
তোমায় ভালবাসি।

ছড়া-৫২

আলু খাইতে বালু বালু
কপি খাইতে পানি
গত রাতে স্বপ্নে দেখি
তুমি আমার স্বামী।

ছড়া-৫৩

মেয়ের গর্জন দেখে
গর্জে হোলা ব্যাঙ,
শোলের সমান হতে চায়
পাগারিয়া চ্যাঙ।
গোজারের সমান হতে চায়
পাগারিয়া খাইয়া
ভদ্র লোকের সমান হতে চায়
বাজারিয়া ভাইরা
ছোটোলোক যদি বিষয় পায়
মাথার পাগড়ি বেধে ছায়ার দিকে চায়।

ছড়া-৫৪

হাইব্বরের বাপ হাইব্বরের বাপ
পণ কইরল কি?
দুরুহ শালি বাতি জ্বালা
হাইগি ফালাইছি।

ছড়া-৫৫

পাগল তোর মাথা গোল
রাত পোয়াইলে হরিব্বল
তিন পুটকি আড়াই হোল।

www.pathagar.com

ছড়া-৫৬
আখির ভিতর পাকির বাসা
জলাক নিলি শুলে
চৌপায়ের ওপর নিপায় ওঠে
দু-পা গেল জলে
হুহে কন্যা নিবারণ
ইন্দুর হইয়া বিড়াল মারে
কিসেরই কারণ ।

ছড়া-৫৭
ভাই বড়ো ধন
রক্তের বাঁধন
যদি হয় পর
নারীরও কারণ ।

ছড়া-৫৮
What is problem (গোয়েন্দা) ?
It is a big মারামারি
আরোন খোলা হাট
The কান্তি খুন্দি and কাটারি
রহিম Jumping the পাগার,
করিম Laughing the চেগারের বেড়া
What is চেগারের বেড়া (গোয়েন্দা)?
Bamboo Stick is খাড়া খাড়া
It is cold ছেচার বেড়া,
Cutting the চেগার বেড়া,
ঢুকিং The thief
Taking the মালপত্র
Running the door.

ছড়া-৫৯
এক যে ছিল বনলতা
বলি তার প্রেমের কথা
ডাক্তার ধরলি মাথা ব্যাথা
সে ধরলি হাসির কথা
ডাক্তার ছেড়ে নাঙ ধরেছে
কি কব তার কথা
প্রেম করলি বনলতা ।

www.pathagar.com

তথ্যসহায়ক

১. মো. আবুল হোসেন, পিতা : মৃত: উপচান হোসেন, গ্রাম : কাদির গাছা, পোস্ট : ভাগনাগরকান্দি, থানা : সিংড়া, বয়স : ৬০ বছর, পেশা : কৃষিকাজ

২. সোহান প্রামাণিক, পিতা : মাখন প্রামাণিক, গ্রাম : সংগ্রামপুর, পোস্ট : জোনাইল, থানা : বড়াইগ্রাম, নাটোর, বয়স : ৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১ম শ্রেণি

৩. মোসা. শাপলা বেগম, স্বামী : মো. শাহাদাৎ আলী, গ্রাম : বোজরা হাট, পোস্ট : ভাগনাগর কান্দি, থানা : সিংড়া বয়স : ৩০ বছর, পেশা : গৃহিনী

৪. নাজনীন সুলতানা মুক্তি, পিতা : রমজান, মাতা : চায়েনা খাতুন, গ্রাম : জোনাইল, নাটোর, পোস্ট : জোনাইল, থানা : বড়াইগ্রাম বয়স : ৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১ম শ্রেণি

৫. মো. রেজাউল করীম, পিতা : মো. রফছেদ আলী, গ্রাম : যুগেন্দ্রনগর, পোস্ট : খুবজীপুর, থানা : গুরুদাসপুর, বয়স : ২৭ বছর, পেশা : কৃষিকাজ

৬. মো. আবু সায়েদ, পিতা : মো. সাদেক প্রাং, গ্রাম : বেলঘড়িয়া শিবপুর, পোস্ট : বৈদ্যবেল ঘড়িয়া, থানা : নাটোর, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : কৃষিকাজ

৭. মো. শহিদুল ইসলাম, পিতা-মো: ইদ্রিস আলী পিয়াদা, বয়স- ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, পেশা-কৃষিকাজ, গ্রাম-ডাহিয়া, থানা-সিংড়া

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

লোকশিল্প হলো ঐতিহ্যবাহী কোনো গোষ্ঠীর মানস-অভিজ্ঞতার বস্তুগত শিল্প ফসল। ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র রীতিতে নিজেদের প্রয়োজন ও রুচি মাফিক যে শিল্প নির্মিত হয়, তাই লোকশিল্প। লোকশিল্প একটি দেশের লোকসংস্কৃতি তথা জাতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেবল শিল্প পদবাচ্যেই নয়, বরং তা জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য নির্দেশকও। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও লোকশিল্পের সঙ্গে জাতিতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব। এ কারণেই আধুনিককালে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব তথা জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের নিরিখে লোকশিল্পের বিচার করা হয়।

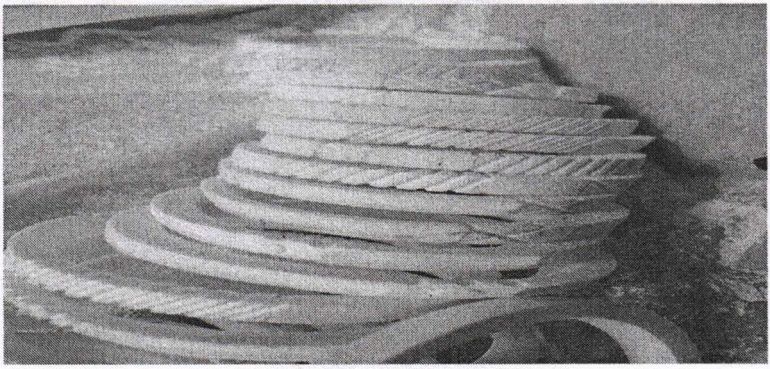

অসম্পূর্ণ নকশাবিহীন শাঁখা (জামনগর)

জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লোকশিল্পকে কেবল রীতি বা শিল্প কৌশলের দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করা হয় না বরং মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি গঠনে তা যে ভূমিকা পালন করে তাও বিবেচনা করা হয়। জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে দেখা হয় এসব শিল্পকে। লোকশিল্পের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা তার উপাদানের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এই শিল্প টিকে থাকে নিজেরই হবহু রূপায়ণের পুনরাবৃত্তির ওপরে।

১. মৃৎশিল্প

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। মৃৎশিল্পের উপকরণ তৈরির উপযোগী আঠালো মাটি প্রায় প্রত্যেক নদীগর্ভে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকায়ত জীবনে মাটির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক, মাটি ছাড়া সাধারণ মানুষের জীবন কল্পনাও করা যায় না। গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহস্থালির প্রায় সমস্ত জিনিসপত্রই মাটি দিয়ে তৈরি

www.pathagar.com

হয়। এ দেশের সৃষ্টিশীল মানুষ মাটির ব্যবহার কেবলমাত্র দৈনন্দিন প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, এই মাটি দিয়ে শিল্প রচনা করেছে। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প তেমনই একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প।

ব্যাপক অর্থে মৃৎশিল্প বলতে কাদামাটি দিয়ে তৈরি এবং আগুনে পোড়ানো যাবতীয় উপকরণকে বুঝায়। মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ হলো কাদামাটি। এ শিল্পের ব্যবহার বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই বিদ্যমান। যার ব্যাতিক্রম ঘটেনি নাটোর অঞ্চলেও। নাটোর অঞ্চলের সিংড়া থানার অর্ন্তগত কলম গ্রাম ও শেরকোল গ্রাম হলো এই মৃৎশিল্পের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। এই দুই গ্রাম থেকে উৎপাদিত সকল মৃৎশিল্প নাটোরসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শেরকোল গ্রামে এই মৃৎশিল্পের সবচেয়ে দক্ষ ও পুরাতন কারিগর সুবল পালের সাথে কথা বলে এই অঞ্চলের মৃৎশিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

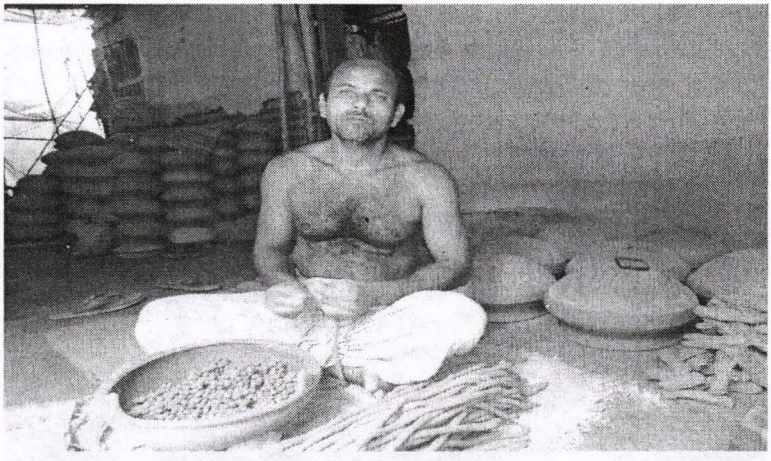

নিজ কাজে মগ্ন সুবল পাল

মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি যা এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা সংগ্রহ করে পুকুর বা নদী থেকে। মাঝে মাঝে তারা কেজি হিসেবে টাকা দিয়ে মাটি কিনে আনে। মাটির দলা আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ কেজি হয়ে থাকে। আর দাম হয় ৫ টাকা কেজি, উল্লেখ্য যে, এই দলা থেকে ছোটো মাপের হলে ৫০টি হাঁড়ি আর বড়ো হলে ১০টি হাঁড়ি তৈরি করা সম্ভব। তারা যে মাটি সংগ্রহ করে তা হলো এঁটেল মাটি। তবে জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে বালু ও এঁটেল মাটি মিশিয়ে কাজ করা হয়। এটেঁল মাটিতে আঠা থাকে বলে তারা এই মাটি সংগ্রহ করে থাকে। এই মাটি তোলার কাজে তারা কোদাল, খন্তা ও শাবলের ব্যবহার করে। মাটি তোলার পর সংরক্ষণ করা হয়। পুকুর বা নদী থেকে তোলা মাটি তারা কাঠ বা ভারি বাঁশের সাহায্যে পিটিয়ে নরম ও সমান করে। এছাড়া পানি দিয়ে ভিজিয়েও মাটি নরম করা হয়। এরপর এর ভেতর থেকে ইট বা পাথর হয়। ইট বা পাথর বাছা শেষ হলে পা দিয়ে মাটি নরম করা হয় যাতে মাটি মসৃণ হয়। এরপর মসৃণ মাটি ঘরে বা বারান্দার কোণে স্তুপ করে সাজিয়ে রাখা হয় এবং পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে নিয়ে কাজ করা হয়।

www.pathagar.com

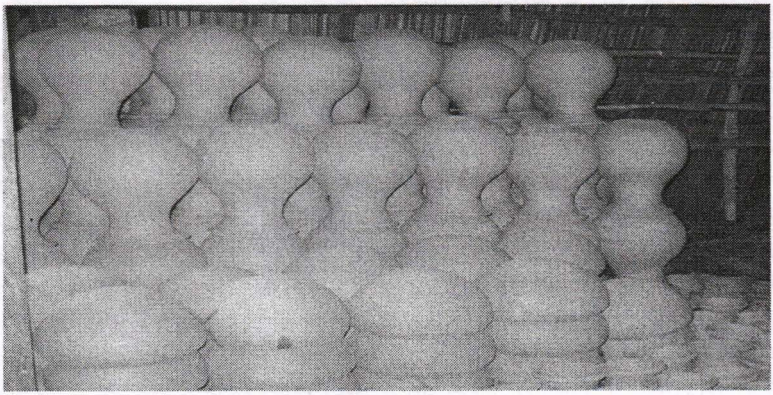

পোড়ানোর আগে মাটির পাত্র

মাটির দ্রব্যাদি সাধারণত চাকের মাধ্যমে তৈরি হয়। এই চাক হলো দেড় থেকে দুই হাত ব্যাসার্ধের একটি গোলাকার চাকা। যেসব জিনিস এই অঞ্চলে বেশি তৈরি হয় তা হলো মাটির বালুর পাতিল, চারের পাতিল, ঝাঝর, ভাতের পাতিল, কলস, ক্ষুদের পাতিল, কাসা, ঢোকসা, সরা প্রভৃতি। তবে চারের পাতিল, ঝাঝর, বালুর পাতিল এই দুই গ্রামে বেশি তৈরি হয়। এছাড়া অন্যান্য তৈরি করা মাটির দ্রব্যাদি থেকে এর মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি বলে মৃৎশিল্পীরা এটাই বেশি তৈরি করে। এসব জিনিসের চাহিদাও অনেক। রোজার সময় এই জিনিসের চাহিদা বেশি। চাক ছাড়াও এসব জিনিস তৈরি করতে লাগে বাঁশের কাইন, (বাঁশের ছাট) চিয়ারি (বাঁশের চিকন কাঠি যা কাটার কাজে লাগে), আতাইল (যেখানে রেখে তলা লাগাতে হয়), রইলা (জিনিস বড়ো করতে লাগে), কাঠের তৈরি পিটন, লোহার সুচু। চাকে শুধু কাঠামো গড়া হয়। বাকিটা হাতে করা হয়। আর এই চূড়ান্ত কাজটি করেন বাড়ির মহিলারা। এসব জিনিস ফিনিশিং দেওয়া ছাড়াও মহিলারা সানকি, থালা, কাসা, ছোটো বাচ্চাদের খেলনা তৈরি করেন।

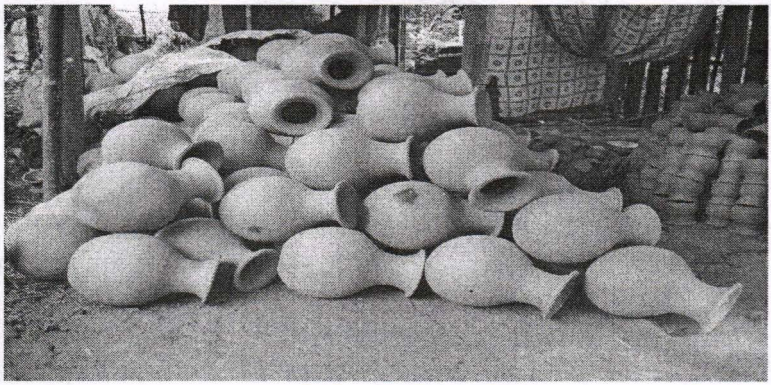

পোড়ানোর পরে মৃৎপাত্র

www.pathagar.com

জিনিস তৈরি করার পর রোদে শুকানো হয়। কড়া রোদে তিন দিন শুকাতে হয়। রোদে শুকানোর পর ভাটায় পোড়নো হয়। ভাটায় একসাথে ৮০০-৯০০ হাঁড়ি পোড়ানো যায়। এই ভাটা ইটের ভাটা থেকে আলাদা হয়। স্থানীয় ভাষায় এই ভাটাকে পইন বলা হয়ে থাকে। সকল মৃৎশিল্পীদের এটি থাকে না। এক জন মৃৎশিল্পীর বাসায় এই ভাটা থাকলে অন্যান্যরা টাকার বিনিময়ে সেখান থেকে দ্রব্যাদি পুড়িয়ে থাকেন। এক ভাটা জিনিস পোড়াতে খরচ লাগে ৩০০০ টাকা। এই ভাটা মূলত মৃৎশিল্পীরা নিজেরাই তৈরি করে থাকেন। অনেক সময় লোক দিয়েও তৈরি করানো হয়। ভাটা বিভিন্ন আকারের হয়। ছোটো বা বড়ো। সাধারণত বড়ো চুলা বাড়ির বাইরে ফাঁকা জায়গায় তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রথমে সমতল ভূমিতে মাটি ফেলে উঁচু করা হয়। উঁচু করা ঢিভির মাঝখানে গর্ত করা হয়। পরে গর্তের চারপাশের উঁচু মাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঁশের ঘন ছাউনি দিয়ে তার ওপর মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়। অবশ্য মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা রাখা হয় যাতে জ্বাল দেওয়া যায়। চুলার গর্তের সামনে কয়েকটি কাঠ দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয় এবং মাটির দেওয়াল তৈরি করা হয়। এছাড়া চুলার ওপর ছাউনি দেওয়া হয়। তৈরি পাত্রগুলো চুলার চারদিকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয় এবং পাত্রের ফাঁকে খড়-কুটা ও গাছের ডাল রাখা হয়। তার ওপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারি একভাবে সাজানো হয়। সাজানো পাত্রগুলোর চতুর্দিকে আবার নিম্নমানের কিছু হাঁড়ি-পাতিল দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয় যাতে আগুনের তাপে মূল পাত্র ফেটে না যায়। সাজানো পাত্রগুলোর চারপাশে আখের পাতা বা খড় দিয়ে উচাল তৈরি করা হয় এবং সবশেষে পাত্রগুলো মাটির পুরু প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। আবার এই প্রলেপের চারিদিকে ছোটো ছোটো ছিদ্র করা থাকে যাতে ধোঁয়া বের হয়ে যেতে পারে। প্রথমে ধীরে ধীরে আগুন জ্বালানো হয়। কমপক্ষে দুই ঘন্টা এভাবে মন্থর গতিতে জ্বাল দেওয়ার পর ওপরের সারিবদ্ধ পাত্রগুলো প্রাথমিকভাবে গরম হয়ে যায় এবং এরপর থেকে জোরালোভাবে জ্বাল দেওয়া শুরু হয়। সমগ্র পইনে আগুন ধরে গেলে নিচ থেকে জ্বাল দেওয়া বন্ধ করা হয়। যখন পাত্রের চারদিকে মাটির প্রলেপের ভেতরে দেওয়া খড়-কুটো সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় তখন পইন লাল রঙ ধারণ করে। অনেক সময় স্থায়ী কালো রঙের পাত্র তৈরির জন্যে মৃৎশিল্পীরা চুলায় মাটির প্রলেপের ছিদ্র বন্ধ করে দেন। তাতে করে ধোঁয়া আর বের হয়ে আসতে পারে না। এরফলে পাত্র গাঢ় কালো রঙ ধারণ করে। এভাবে চার থেকে আট ঘন্টা আগুনে পোড়ানো হয়। নাটোর অঞ্চলে পইনের জ্বালানি হিসেবে আগে কাঠের ব্যবহার হলেও বর্তমানে দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে কাঠের গুড়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সাধারণত সারা রাত পোড়ানোর পর আগুন বন্ধ করে সকাল পর্যন্ত পইন ঠাণ্ডা করা হয়। পইন ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর মাটির প্রলেপ ভেঙে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত স্তরে স্তরে পাত্রগুলি নামানো হয়। পোড়ানো পাত্র সাধারণত ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। আবার ঘরে যদি জায়গা না থাকে তাহলে উঠানে বাঁশের ছাউনির নিচেও রাখা হয়।

নাটোর অঞ্চলের সিংড়া থানার অন্তর্গত ধুলাউরি পাল পাড়ার একটি বাড়িতে মৃৎপাত্র তৈরির সাথে সাথে প্রতিমা নির্মাণের কাজও করা হয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন প্রতিমার মুখ ছাঁচের মাধ্যমে তৈরি করে থাকেন।

www.pathagar.com

পোড়ানো মৃৎপাত্র

ছাঁচের মাধ্যমে তৈরির কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন অল্প সময়ে অনেক প্রতিমা তৈরি করা যায় বলে তারা ছাঁচের ব্যবহার করে থাকেন। আগে হাতের মাধ্যমেই তারা প্রতিমার মুখ নির্মাণ করতেন। পূর্বপুরুষ থেকে তারা এই কাজ করে আসছেন এ পর্যন্ত। এই শিল্পীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তাদের পূর্বপুরুষরা ২০০ বছর ধরে এখানে আছেন। বর্তমান শিল্পীদের মধ্যে নিখুঁত কাজ হলো সুবল পালের। তারা এই প্রতিমা তাদের বাড়িতেই তৈরি করে থাকেন।

অনেক সময় দরকার পড়লে বাইরে গিয়েও তারা প্রতিমা বানিয়ে দিয়ে আসে। উল্লেখ্য, প্রতিমা নির্মাণে মহিলারা কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করেন না। প্রতিমা নির্মাণ শেষে শুকিয়ে রং করা হয়। আগে মৃৎশিল্পীরা হাতে তৈরি রং ব্যবহার করত প্রতিমা রং করার ক্ষেত্রে। বর্তমানে বাজার থেকে কেনা রং ব্যবহার করছে তারা এবং রং-তুলির পরিবর্তে স্প্রে-মেশিনের ব্যবহার করছে। তাদের কাছে এই স্প্রে-মেশিন ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে জানা যায় তুলি দিয়ে রং করলে ঘষাঘষি হয় আর স্প্রে-মেশিনে করলে মসৃণ হয় বলে তারা তা ব্যবহার করেন। নাটোর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা বর্ষাকালে যখন হাড়ি-পাতিল তৈরি করতে পারেন না তখন মাছ ধরার জালের কাঠি তৈরি করে থাকেন। এগুলো শুকোতে খুব কড়া রোদ প্রয়োজন হয় না বলে বর্ষাকালে ঘরে বসে এগুলো তৈরি করা যায়। সাধারণত মেয়েরাই এগুলো বেশি তৈরি করেন। ছেলেরাও করেন মাঝে মাঝে। বিভিন্ন আকারের জালের কাঠি তারা তৈরি করেন। নাটোর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা সারা বছর কাজ করলেও বৈশাখ মাসে কাজ করেন না। তারা বিশ্বাস করে বৈশাখ মাস হলো বিশ্বকর্মার আরামের মাস। বিশ্বকর্মা হলো তাদের কর্মের দেবতা। তাই তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই একমাস কাজ থেকে বিরত থাকে। যদিওবা কোনো কোনো মৃৎশিল্পী কাজ করেন কিন্তু তার তৈরি করা দ্রব্য না গড়ে ভেঙে যায় এবং তার পরিবারের লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমন বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পরিবারের শান্তির জন্যে তারা এই মাস কাজ থেকে বিরত থাকেন এবং মাস শেষে হলে পূজা করে পুনরায় কাজ আরম্ভ করেন।

www.pathagar.com

নাটোর অঞ্চলে তৈরি করা মৃৎ-দ্রব্যাদির বেশিরভাগ বাড়ি থেকেই পাইকারি হিসেবে বিক্রি হয়। হাটে বাজারে খুব কমই নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য কিছু কিছু মৃৎশিল্পী ঘাড়ে করে, ডালিতে ঝুলিয়ে গ্রামে গ্রামে ছোটো ছেলেদের-মেয়েদের খেলনাপাতি বিক্রি করেন। এগুলো মেলায়ও বিক্রি করা হয়। এই এলাকায় বিনিময় প্রথায়ও এগুলো বিক্রি হয়। টাকা ছাড়াও ধানের বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রি হয়ে থাকে। তাদের তৈরি করা দ্রব্যাদির মধ্যে ঝাঁঝর (যা মুড়ি ভাজার কাজে লাগে)-এর দাম একটু বেশি। আর জালের কাঠি বিক্রি হয় ১৫ থেকে ২০ টাকা কেজি দরে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এসব দ্রব্যাদি কিনে থাকেন। তবে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা একটু বেশি কেনেন।

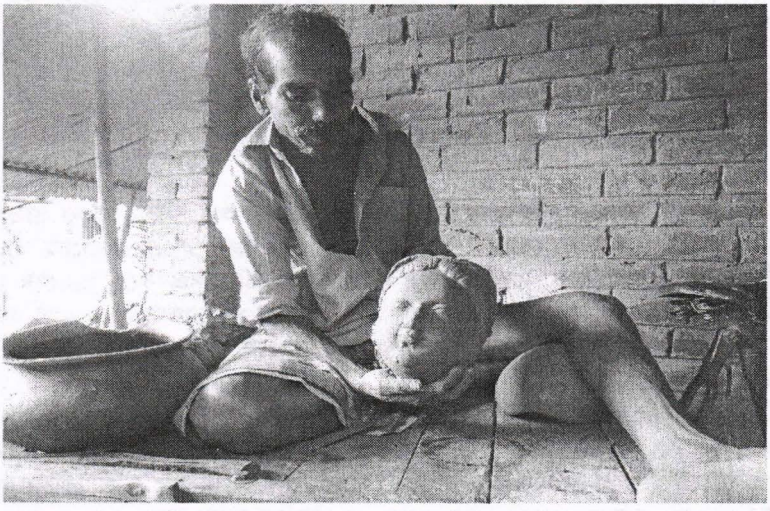

মূর্তি তৈরি করছেন সুরেন পাল

মৃৎশিল্পীরা বংশপরম্পরায় এসব কাজ করে থাকেন। তারা দেখে দেখে তাদের কাজ শেখেন। হাতে ধরে কেউ তেমন একটা শেখায় না। সিংড়া থানার কলম গ্রামে প্রায় ৭ ঘর লোক এই পেশায় নিযুক্ত আছেন এবং শেরকুল গ্রামের ২৮ ঘর লোক এই পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন যাদের কাউকেই হাতে ধরে কাজ শেখানো হয়নি। তাদের পূর্বপুরুষের অনুসৃত পদ্ধতি দেখে দেখে তারা হাতের কাজ শিখেছেন। কলম গ্রামের কুমারপাড়ার সবচেয়ে দক্ষ কারিগর হলো ধীরেন্দ্রনাথ পাল। তিনি ৫২ বছর ধরে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে কাজ শিখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে তাঁর ভাইয়েরা ও তার ছেলেমেয়েরা কাজ শিখেছে। তেমন অর্থ নেই বলে তিনি তাঁর নাতি নাতনিদের এই পেশায় নিয়োজিত করতে চান না। তাদের লেখাপড়া শেখাতে চান।

নাটোর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের বিয়ে তাদের গোত্রের মধ্যেই হয়। অর্থাৎ একজন কুমোরের মেয়ের সাথে অপর এক কুমোরের ছেলের বিয়ে হয়। একই গোত্রে বিবাহের

www.pathagar.com

কারণ তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন বিয়ের পর পুত্রবধু তাদের কাজে সহায়তা করতে পারেন। অন্য গোত্রের মেয়ে আনলে তাদের কাজে সহায়তা করতে পারবে না। তাকে নতুন করে কাজ শেখাতে হবে আর তাদের গোত্রের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজ শিখে থাকে বাবার বাড়ি থাকাকালীন অবস্থাতেই।

লোকমেলায় প্রদর্শিত মৃৎশিল্প

নাটোর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে। এ পেশায় তেমন কোনো লাভ নেই। যা আয় হয় তা দিয়ে কোনো রকমে খেয়ে পরে জীবন চলে যায়। এতে কোনো রকম সম্পত্তি করা তো অনেক দুরের ব্যাপার, জীবনধারণই কষ্টকর। অন্য পেশায় না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন—বাপ দাদার পেশা, তাই ছাড়তে পারি না। তাছাড়া এই কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ জানি না যে সেই পেশা গ্রহণ করব। ফলে নাটোর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা শত কষ্টের মাঝেও তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন। অবশ্য, বর্তমান প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই পেশার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তারা নিজেরাও সন্দিহান। নাটোর অঞ্চলের মৃৎশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন— বর্তমান প্লাস্টিক-ম্যালামাইনের প্রতিযোগিতায় খুব বেশি এগোতে না পারলেও এই অঞ্চলের মৃৎশিল্প কখনোই শেষ হবে না কেননা এখনও গ্রাম বাংলায় মাটির জিনিসের কদর রয়েছে। এখন পানি ঠাণ্ডা রাখার জন্যে মাটির কলসের ব্যবহার গ্রাম ও শহর সব জায়গায় প্রচলিত রয়েছে। তাদের বিশ্বাস মতে অনেকে গ্যাস্ট্রিক এড়াতে মাটির পাতিলে ভাত খেয়ে থাকেন। এ রকম নানা কারণে এই শিল্প টিকিয়ে রাখা সম্ভব বলে তাদের ধারণা।

২. শাঁখাশিল্প

বাংলার লোকশিল্পগুলোর মধ্যে শাঁখা শিল্প নানা কারণেই এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই শঙ্খশিল্পজাত দ্রব্য আমাদের হাতে পৌছতে অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয়। অলংকরণ পদ্ধতি তেমনই একটি স্তর। কোনো জিনিস অলংকরণ করা হয় তার

www.pathagar.com

সৌন্দর্য বৃদ্ধির নিমিত্তে। লোকশিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এসব জিনিসের অলংকরণ করে থাকেন। এই অলংকরণ পদ্ধতি অনেক সময় বংশ পরম্পরায়ও চলে আসে। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে যোগ বিয়োগ ঘটে এই পদ্ধতিতে। নাটোর জেলার শাঁখাশিল্পেও এই অলংকরণ পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

অলংকরণ পদ্ধতির প্রথমধাপে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের দ্রবণে ডুবিয়ে শাঁখাকে উজ্জ্বল করা হয়। তারপর নাইট্রিক এসিড, মোম এবং জিঙ্ক পাউডারের বিশেষ দ্রবণে শাঁখার ফাটা বা পোকায় খাওয়া অংশ ভরাট করা হয়। কলমকাঁটা যুক্ত বাটালের সাহায্যে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে শঙ্খের ওপর নানা ধরনের নকশা তোলা হয়। এসব নকশার মধ্যে থাকে ফুল, লতা, ধানের শিষ, মাছ, পাখি ইত্যাদি। বহু সময় লাগে একটি শাঁখায় নকশা ফুটিয়ে তুলতে। নাটোরের শঙ্খশিল্পী শ্রী মিঠুন সেন বলেন আমারা ডিজাইনের কোনো বই-পত্র পাই না। নিজের মনে যা আসে তাই ফুটিয়ে তুলি শাঁখ ও শাঁখাতে। তবে মহাজন অনেক সময় ডিজাইন বলে দেন। ফুল কিংবা পাতা ডিজাইনই বেশি প্রচলিত। যদিও প্রথম শাঁখাতে মনমতো অলংকরণ করা যায় কিন্তু দ্বিতীয়টাতে ডিজাইন তোলা সহজ নয়।

আগে খুব যত্নের সাথে অলংকরণ করা হলেও বর্তমানে এক্ষেত্রে তেমন সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় না। কেননা, ভালো নকশা করতে সময় লেগে যায় বলে এর দামও বেড়ে যায়। কিন্তু সাধারণত নিম্নবর্গীয়রা চান যত সস্তায় শাঁখা কেনা যায় তত ভাল। ফলে দামি শাঁখা তেমন কেউ কিনতে চান না। তাছাড়া বেশি অলংকরণ করা শাঁখা সবসময় হাতে পড়ে থাকলে দ্রুত ময়লা লেগে যায়, ফলে এর সৌন্দর্য নষ্ট হয় বলে দাম দিয়ে বেশি অলংকরণ করা শাঁখা সবসময় হাতের জন্যে এখন তেমন কেউ একটা কিনতে চান না। যেহেতু সবসময় হিন্দু সধবা রমণীদের হাতে শাঁখা পড়তে হয় এজন্যে তারা কম দামি শাঁখাই বেশি ব্যবহার করেন। এছাড়া অলংকরণের জন্যে শ্রমিকদের যে হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা অতি সামান্য। সময় নিয়ে নিখুঁতভাবে এই অলংকরণ করতে হয় বলে একঘেয়েমি লাগায় অনেক শিল্পীই এ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে নাটোরে মাত্র কয়েক ঘরেই এই অলংকরণ পদ্ধতি এখনো টিকে আছে।

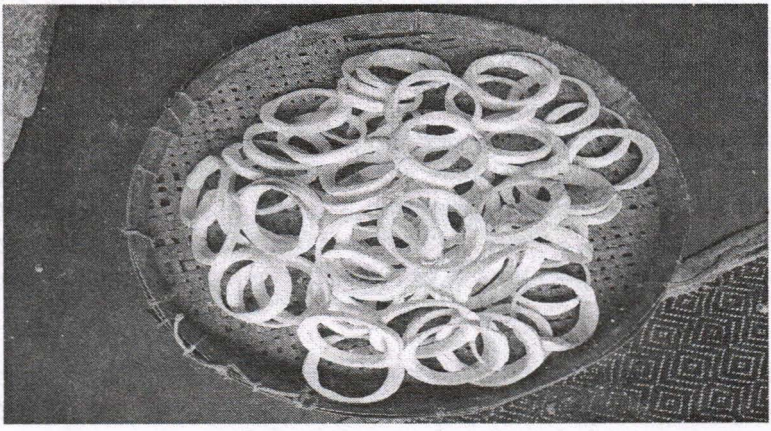

সাদামাটা শাঁখাবলয় (জামনগর)

www.pathagar.com

বিপণন-ব্যবস্থা

শঙ্খশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে অন্যান্য অঞ্চলের মতো নাটোরের একটা অবস্থান রয়েছে। নাটোর জেলার শাঁখাসমূহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রির জন্যে পাঠানো হয়। অনেক দোকানদার শাঁখারিদের কাছ থেকে এসব পাইকারি দরে কিনে নেন। অনেক সময় মহাজন দাম নির্ধারণ করে দেন শাঁখার। তবে নির্ধারিত দামের বেশি বিক্রি করতে পারলে শঙ্খকারের লাভ তাতে। ঐ অর্থ তখন নিজের করে পান তিনি। নাটোর বাজারে অনেক দোকান আছে যেখানে শাঁখা ও শাঁখ বেচাকেনা হয়। জেলার উৎপাদিত শাঁখাসমূহ ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড় ও লক্ষীপুর জেলার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নিয়ে যান বিক্রির উদ্দেশ্যে। এছাড়া কান্তজির মন্দির ঘিরে যে মেলা ও খেতুরের মেলাতেও এই শাঁখা বিক্রি হয়। শঙ্খকাররা বাসা থেকে অনেক সময় শাঁখা বিক্রি করে থাকেন যেগুলো জোড়া প্রতি দাম পড়ে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। এছাড়াও শাঁখা তৈরির সময় যেসব গুড়ো বের হয় সেগুলো আবার কেজিদরে বিক্রি করা হয়। ময়লাসহ ৩০ টাকা কেজি এবং পরিষ্কারগুলো ১০০ টাকা কেজি। এগুলো পাইকারি দরে বিক্রি হয়। ৫০ জোড়া ভালো শাঁখা বানাতে খরচ হয় ১৪ থেকে সাড়ে ১৪ হাজার টাকা, সেই শাঁখা বাজারে বিক্রি করে দাম পাওয়া যায় বড়জোর ১৬ হাজার টাকা। এই ৫০ জোড়া শাঁখা তৈরি করতে একজন শ্রমিকের অন্তত পাঁচ দিন সময় লাগে। ফলে গড়ে প্রতিদিন দুইশ থেকে আড়াইশ টাকা আয় হয়। আর ৫০ জোড়া গুরুদক্ষিণা শাঁখা (জোড়াতালি দিয়ে তৈরি বলে এই নামে ডাকা হয়) বিক্রি হয় সর্বোচ্চ ২৫০০ টাকায়, একজন শ্রমিক প্রতিদিন গড়ে ২৫ থেকে ৩০ জোড়া গুরুদক্ষিণা শাঁখা তৈরি করতে পারেন। সেই হিসেবে এই শাঁখা তৈরি করে গড়ে প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০ টাকা আয় করা সম্ভব। ১০ বছর আগে এক জোড়া ভালো শাঁখা তৈরি করে চার/পাঁচ হাজার টাকা লাভ হতো। কিন্তু আগের মতো এই ব্যবসায় আর লাভ হয় না। সারা বছরই নাটোর জেলায় শাঁখা কেনা বেচা হয় তবে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাগুন এ মাসগুলোতে বেশি বিক্রি হয়। কেননা এই সময় আয়োজন থাকে হিন্দুদের বিয়ের। এছাড়া আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় শাঁখা বেশি বিক্রি হয়। নাটোর জেলার শঙ্খশিল্প মূলত পুঁজিবাদীদের চেষ্টায় টিকে রয়েছে। কেননা যাদের পুঁজি রয়েছে তারাই নতুন শাঁখা তৈরি করতে বা করাতে পারেন আর যাদের পুঁজি নেই তারা শাঁখা জোড়া দিয়ে তৈরি করেন খারাপ বা নষ্ট শঙ্খ থেকে। নাটোর জেলার শঙ্খকাররা কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দাবি করলেও তেমন একটা ফল তারা পান নি। তবে তারা আশাবাদী এই শিল্প নিয়ে। যথাযথ পদক্ষেপ নিলে এখান থেকে তৈরিকৃত শিল্প দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

আচার, বিশ্বাস ও সংস্কারে শাঁখা

পৌত্তলিক যুগ থেকেই নানা ধর্মাবতারে বিশ্বাস এবং দেবতার পূজার পদ্ধতি শুরু হয়। পরবর্তীতে কালক্রমে একেশ্বরবাদী ও নিরাকার এক সৃষ্টিকর্তার অনুসরণে নতুন ধর্মের আর্বিভাব হয়। মানুষ শত-সহস্র বছরের ব্যবধানে তাদের নিজস্ব ধর্মই পালন করে

www.pathagar.com

আসছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য মানুষের বিশ্বাসে ধর্ম সর্বদাই সকলের অস্তিত্ব-সঙ্গী হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এভাবে বিশ্বের সকল দেশের মানবগোষ্ঠী, জাতি, উপজাতি ও আদিবাসীসহ গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নানা লোকবিশ্বাস, লোকপ্রথা, লোকউৎসব, লোকাচার, শিষ্টাচার বিনিময়, লোকচিকিৎসা, বনৌষধি-চিকিৎসা এবং লোকসংস্কারে বিশ্বাস করে এসেছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তারা তা দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করছে শাঁখা কিভাবে আচার, বিশ্বাস ও সংস্কারে প্রভাব ফেলছে জানার আগে তিনটি বিষয় সম্পর্কে একটু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

শাঁখারি কর্তৃক শাঁখা পড়ানো (ভাটুদাঁড়া কালীমায়ের মেলা)

লোকাচার শব্দটির আভিধানিক অর্থ সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা সংক্ষেপ। সামাজিক আচার শব্দটির সাথে যোগ করে বলা যায় লোকাচার। বাংলা অভিধান অনুসারে প্রথা, নিয়ম পদ্ধতি, রীতি বা সংস্কার। লোকাচার মানুষের সামাজিক রীতি নীতি, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ ও পদ্ধতিগত লোক সংস্কারের পালনীয় কর্ম, যা সম্পাদনে আন্তরিক শান্তি এবং মনোতুষ্টি মেলে।

লোকবিশ্বাস মানুষের ধর্মবোধ ও ধর্মীয় চেতনা। ধর্মের অনুশাসন ও প্রাপ্তি থেকেই তৈরি হয় লোকবিশ্বাস। কোনো ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব কিংবা নৃতাত্ত্বিক ধারায় উৎপত্তি না হয়ে বরং সমাজের বিশ্বাস থেকেই এটি তৈরি হয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি মৌলিক বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় এবং সেই বিশ্বাসের রূপারোপই লোকবিশ্বাস। বিশ্বাস মানেই দৃঢ় চেতনার অভিব্যাক্তি। যার কাছে যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয় না বা হতে পারে না।

লোকসংস্কার মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, শুভাশুভ বোধ থেকে উদ্ভুত। সংস্কার হলো মানুষের কিছু আচার আচরণ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন মানুষ কোনো বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অনুবর্তী আচরণ পালন করে তাই লোকসংস্কার।

www.pathagar.com

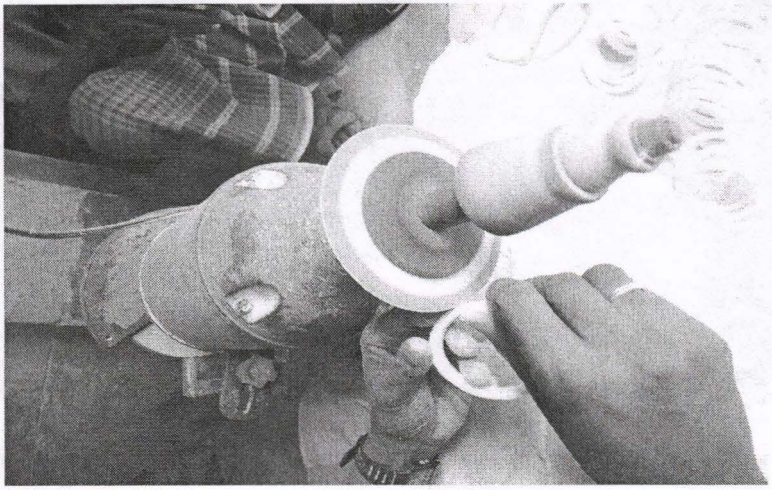

মেশিনে শাঁখা মসৃণ করা হচ্ছে (জামনগর)

আচার, বিশ্বাস ও সংস্কার সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের লক্ষ্য পূরণের তাগিদ। শাঁখা কেন্দ্রিক সংস্কারগুলোতে সেই সত্যই প্রতিফলিত হয়। শাঁখা যে শঙ্খ থেকে তৈরি হয় তাকে মানুষ বেশ গুরুত্ব দেয়। তবে এই গুরুত্ব দেওয়ার পেছনে বেশ কতগুলো কারণ রয়েছে। অতীতকাল থেকেই হিন্দু সংস্কৃতিতে শঙ্খ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান তৈরি করেছে। শঙ্খ-শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা পৌরাণিক কাহিনি, মিথ বা লিজেন্ড। অশুভবিনাশী শঙ্খকে মানুষ দেখে এসেছে দেব- শক্তির আধার রূপেই। তাই অন্যান্য নানা কিছুর মতো শঙ্খকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা বিশ্বাস ও সংস্কার। হিন্দুদের জীবনে অন্যতম একটি পর্যায় বিবাহে রয়েছে শাঁখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিয়ের কনেকে পরিয়ে দেওয়া হয় সাদা শাঁখা ও পলা। বিয়ের কনেকে লাল শাঁখা, আলতা ও সিঁদুর দিয়েও সাজানো হয়। দেহের রক্ত লাল, রক্তবর্ণকে উদ্দাম ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত করে দেখাই আমাদের রীতি। আবার হাতের শাঁখা বাঙালি হিন্দু রমনীদের কাছে পরম পবিত্র ও মূল্যবান অলংকার বলেও গণ্য। এ হলো সধবা নারীর চিহ্ন। স্বামীর মঙ্গল কামনায় স্ত্রীর হাতের শাঁখা তার স্বামীর ভালোমন্দের সাথে জড়িত এটাই বিশ্বাস। তাই কখনো তা খুলতে নেই বলে সংস্কার আছে। এমনকি শাঁখা ভাঙলেও তা ভেঙেছে বলতে নেই, বলতে হয় শাঁখা বেড়ে গেছে। শাঁখা পরিষ্কার করার সময়েও শাঁখা খোলার কথা না বলে বলতে হয় 'হাত শিখলানো হচ্ছে'। এর মূলে রয়েছে বৈধব্যভীতি। পাছে স্বামীর মৃত্যু ঘটে তাই এত নিষেধাজ্ঞা। চির এয়োস্ত্রীর কামনা সহজাত। এক হাতের শাঁখা ভাঙলেও তাই স্বামীকে দিয়ে অন্যহাতের শাঁখা খুলিয়ে নিতে হয়। তবে গর্ভবতী অবস্থায় শাঁখা পরতে নেই এ হলো প্রচলিত নিয়ম। আবার শাঁখা কখনও খালি মেঝেতেও রাখতে নেই।

www.pathagar.com

শাঁখা পালিশ করা হচ্ছে (জামনগর)

আবার যারা শাঁখা তৈরি করেন সেই শঙ্খকার বা শাঁখারিদের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে নানা সংস্কার। তারা এই শিল্পকে কেন্দ্র করে নানা আচার পালন করে থাকেন। ভাদ্র মাসের শেষ দিনে বিশ্বকর্মার পূজা করেন। এই সময় তারা তিন দিন কাজ বন্ধ রাখেন। শ্রাবণ মাসের শেষ সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে গানের আয়োজন করা হয়। বিশ্বকর্মার পূজা করলেও শাঁখারিরা কিন্তু অগস্ত্যমুনিকে অধিক মান্য করেন। কারণ লোক ঐতিহ্য অনুসারে অগস্ত্যই শাঁখের করাতের আবিষ্কারক। নাটোর জেলার শাঁখারিদের মধ্যে দক্তমণ্ডল, কুণ্ডু, ধর, সেন প্রভৃতি পদবিধারী মানুষ দেখা যায়। তাদের এই গোত্র নিয়েও প্রচলিত আছে নানা সংস্কার।

শাঁখা শিল্পের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে শাঁখা শিল্পের অস্তিত্ব বিদ্যমান। নাটোর জেলা তার অন্যতম। নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া থানার একটি গ্রাম হলো জামনগর। যা গোটা নাটোরে শঙ্খশিল্পের জন্যে প্রসিদ্ধ। শঙ্খশিল্পের জন্যে প্রসিদ্ধ হলেও এখানে মূলত শাঁখা ও শাখই তৈরি হয়। এই গ্রামের প্রসিদ্ধ শাঁখা শিল্পী হলেন জয়দেব চন্দ্র সেন, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সেন, শ্রী মিঠুন সেন, দুর্জয় কুমার ধর, বাবলু কুমার ধর, সুমন কুমার ধর, দুর্গাপদ ধর প্রমুখ। বয়সে এরা প্রবীন ও নবীণ। এদের মধ্যে কেউবা শুধু সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, আবার কেউ কেউ সামান্য লেখাপড়াও শিখেছেন। অনেক শাঁখা শিল্পী আবার যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েও জাত ব্যবসা ছাড়েননি। পারিবারিক সাহায্য অল্পবিস্তর সকল শিল্পীই পেয়েছেন। কেউ কেউ পাকা বাড়িও করেছেন। সকলেই যে জাতে শাঁখারি এবং পুরুষানুক্রমিক শিল্পী এমন নয়। কেউ কেউ পূর্বপুরুষের পেশা ত্যাগ করে কিংবা অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকেও এ পেশায় চলে এসেছেন। তবে জাত শাঁখারি ও পুরুষানুক্রমিক শিল্পীর সংখ্যাই এই গ্রামে অধিক। পরিবারের মহিলারাও এ শিল্পের সাথে যুক্ত। শিল্পীরা তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ করেন শ্রীলংকা থেকে। তবে এই কাঁচামাল তারা সংগ্রহ করেন মহাজনের মাধ্যমে। কোনো কোনো শিল্পী আবার অন্য শিল্পীর কাছে মজুর হিসেবেও কাজ করে থাকেন। তবে একথা ঠিক যে বর্তমানে কাঁচামাল প্রাপ্তির নানান অসুবিধা দেখা দেওয়ায় অনেক শাঁখা শিল্পী অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করছেন।

www.pathagar.com

অনেকে অন্য জায়গা থেকে শঙ্খ কেটে এনে বাড়িতে পালিশ করে জাত ব্যবসা ধরে রেখেছেন। নাটোর জেলার জামগ্রামের অনেক শাঁখা শিল্পী শঙ্খ কাটিয়ে আনেন খুলনা থেকে। কারণ শাঁখা উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্রাদি যা প্রয়োজন সেই সব আধুনিক যন্ত্রাদি বা বিদ্যুৎচালিত মেশিন কেনার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া এসব যন্ত্র চালাতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় সেই বিদ্যুৎ বিল দেবার মত ক্ষমতা তাদের অনেকেরই নেই। তারপরেও যে এই গ্রামে শঙ্খকাটার মেশিন নেই তা নয়। এ গ্রামের মাত্র দুই ঘরে এই মেশিন রয়েছে। তারা এই মেশিনে শাঁখা তৈরির জন্যে শঙ্খ কাটাতে নেয় প্রতিটি ২ টাকা করে। আগে মাদ্রাজ থেকে শঙ্খ আনায় এই শিল্পের অবস্থা বেশ ভালো ছিল। কিন্তু শঙ্খের মান খারাপ হওয়ায় সেখান থেকে শঙ্খ আনা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মহাজন ধরে শঙ্খ আনাতে বেশ বেগ পেতে হয় বলে এই শিল্পের উন্নতি বাধাগ্রস্থ হয়। আগে এই গ্রামে ১০০ ঘর লোক শাঁখা শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন বর্তমানে মাত্র ৭০ ঘর এই শিল্পের সাথে জড়িত আছেন। একটি বছরে শঙ্খ লাগে ৩ থেকে ৬ বস্তা। এক বস্তা (৭৫ পিস) শঙ্খের দাম পড়ে অন্তত ৪৫ হাজার টাকা। এক বস্তা শঙ্খ কেনার সামর্থ্য অনেকের থাকে না বলে তারা মহাজনের তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকে এবং বিক্রি করা অর্থ দিয়ে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। তারপরও যে এই শিল্প বিলীন হয়ে গেছে তা কিন্তু নয়। সভ্যতার অগ্রগতি মানুষকে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই দিয়েছে। তেমনি শাঁখা শিল্পের ক্ষেত্রেও সভ্যতার অগ্রগতি কিছুটা হলেও সুবিধা বয়ে নিয়ে এসেছে। মানুষের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। আগে সারাদিন খেটে ৪টা শাঁখা তৈরি করতে বেশ কষ্ট করতে হতো অথচ বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় এক দিনে ২৫ জোড়া শাঁখা বানানো সম্ভব হচ্ছে। সভ্যতা যেমন বিভাজন করে শহর ও গ্রামকে তেমনি শাঁখার ডিজাইনেও গ্রাম ও শহরের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নাটোর শহরে যেসব ডিজাইন বেশি চলে তার মধ্যে ধানছড়া, মাছের আঁশ, কঙ্কন, এম, তারপ্যাঁচ প্রধান। আর গ্রামে বেশি চলে সাবিত্রী এবং জিকজাক। তবে যাই হোক বিভিন্ন জেলার মতো নাটোর জেলার শঙ্খশিল্পী সমাজও যে ঐতিহ্য পরম্পায় আমাদের উপহার দিয়ে চলেছেন শঙ্খজাত নানা দ্রব্যাদি তাতেই তারা বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন শাঁখা শিল্পীই এখানে সরকারি পুরস্কারে ভূষিত হন নি।

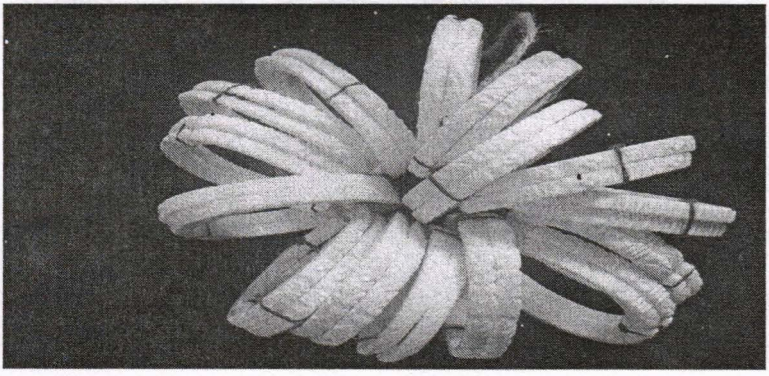

বিক্রির জন্যে প্রস্তুতকৃত শাঁখার গোছা (নাটোর শহর)

www.pathagar.com

মেলায় শাঁখা ক্রয়রত হিন্দুরমণী

শাঁখা শিল্পের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট যেমন বিশেষ বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতির জন্ম দেয়, তেমনি তার ক্রমবির্বতনেও পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সামাজিক পরিবর্তনশীলতা এবং মানুষের রূচিবোধের পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শাঁখাশিল্পের ওপর। পরিবর্তমান আধুনিকতার চাপে শাঁখাশিল্পের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন প্রায়। শাঁখাশিল্পের উদ্ভবের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস। সেই ধর্মবিশ্বাসে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে বর্তমানকালে। অনেক সধবা হিন্দু নারী শঙ্খ পরিধানকে এখন আর অনিবার্য বলে মনে করেন না। ফলে বাংলাদেশের অভিজাত শিক্ষিতা বিবাহিত হিন্দু নারীর অনেকেই আজ হাতে ধারণ করেন না শাঁখা। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণেও শাঁখার ব্যবহার দিনে দিনে কমে আসছে। এক জোড়া শাঁখা কিনতে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন, সে টাকায় সংসারের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা সম্ভব। ফলে নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেকেই শাঁখা ব্যবহারের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠছেন। এ কারণেও শাঁখা শিল্প আজ বিপন্ন।

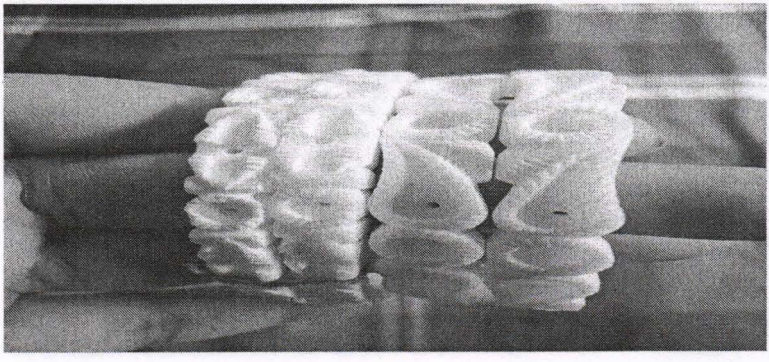

সম্পূর্ণ নকশায় শাঁখা (জামনগর)

www.pathagar.com

আধুনিক প্রযুক্তির অবদানে এখন নানা ধরণের চুড়ি ও বালা তৈরি হচ্ছে যা অতি অল্প মূল্যেই ক্রেতারা কিনতে পারছেন। এই চুড়ি বা বলয় শাঁখার তুলনায় অনেক টেকসই এবং মনোহর। ফলে পূর্বে যারা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য শাঁখা পরতেন আজ তারা তা করেন না। সম্প্রতিকালে এই প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আধুনিক নারীর রুচিবোধগত এই প্রবণতার ফলে শাঁখা শিল্পের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে দারুণভাবে।

অতীতকালে মুসলিম মহিলাগণ অলংকার হিসেবে শাঁখা ব্যবহার করতেন। এমন কি কোনো কোনো এলাকায় বিয়ের সময় মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে মুসলিমরা শাঁখা ও সিঁদুর পরতেন। কিন্তু বর্তমান কালে এ প্রথা একেবারেই উঠে গেছে। ফলে কমে গেছে শাঁখার ক্রেতা। কেবল ক্রেতার রুচিবোধের পরিবর্তন নয়, শাঁখারি সম্প্রদায়ের তরুণ সদস্যদের রুচি ও চিন্তায়ও দেখা দিয়েছে আধুনিকতার স্পর্শ। শর্তবর্ষের পেশা ত্যাগ করে অনেকেই আজ ভিন্ন পেশার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে শিল্পীর সংখ্যা দিন দিনই আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে।

শঙ্খের অপ্রতুলতার কারণেও এ শিল্প আজ দুরবস্থার মাঝে পতিত হয়েছে। সময় মতো শঙ্খ না পাওয়ায় জন্যে অনেকেই এ শিল্পের প্রতি ক্রমে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। নানা কারণেই শাঁখা শিল্প আজ দীনতা আর দুরবস্থার মধ্য দিয়ে কোনক্রমে তার অস্তিত্ব বজায় রাখছে। শাঁখা শিল্পের দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বলা যায় সময়ের স্রোতধারায় রুচির পরিবর্তন হলেও ঐতিহ্যকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। রুচিবোধের পরিবর্তনের ফলে নতুন অলংকারের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে পারে, সাথে সাথে ঐতিহ্যিক অলংকারের প্রতি আগ্রহ রাখলে এই শিল্প টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

শহরের স্বর্ণপট্টির শাঁখার দোকান

www.pathagar.com

বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্যতম জামনগরের এই শাঁখাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সরকারি, বে-সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অতি জরুরি। শ্রেষ্ঠমানের শাঁখাশিল্পীদের মাঝে মাঝে পুরস্কৃত করলে কাজের প্রতি তাঁদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এখানকার শাঁখারিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেলে পিতৃ-পুরুষের পেশা ছেড়ে শাঁখারিরা অন্য পেশায় সহজে যাবে না। শাঁখা শিল্পীরা নিজেরাই সচেষ্ট হবেন এই শিল্পের ব্যাপারে। কেননা প্রথানুযায়ী শিল্পকলার চর্চায় নিজেদের আবদ্ধ রাখলে চলবে না সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরকেও এগিয়ে আসতে হবে শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যে। এ বিষয়ে নিত্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক, আবশ্যক নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এন.জি.ও. ও অন্যান্য শিল্প রসিকদেরও কর্তব্য রয়েছে বিলীয়মান শাঁখা শিল্পকে চাঙা করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের। এতে এই শিল্প বিলীন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

৩. কাঁসাশিল্প

মানব সভ্যতার উষালগ্নে জীবন ও জীবিকার শুরুতে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের তাগিদে নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী ও শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছে। শহর বন্দর গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজনে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যুগ যুগান্তরের ব্যবধানে, বংশপরম্পরায় ও ঐতিহ্যগতভাবে আজ অবধি বিভিন্ন ধরণের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে চলেছেন। এবং সাধারণ মানুষ তাদের ধর্ম-কর্ম, বিবাহ, আনন্দ-উৎসব, পূজা-পার্বন, আহারে-বিহারে, শিক্ষা সংস্কৃতিতে, আলোচনায়, সমাবেশে, নান্দনিকতা ইত্যাদিতে তা ব্যবহার করে চলেছেন। তাই এই শিল্পকর্মগুলো শুধু প্রাচীন নয় বরং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, রীতি-বৈচিত্র্যে বহুবিধ আঙ্গিকে আজও সমুজ্জ্বল। এরূপ একটি শিল্পকর্ম হচ্ছে কাঁসা শিল্প।

ফোকলোরের বস্তুকেন্দ্রিক শাখার মধ্যে প্রাণবন্ত উৎকর্ষময় বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে লোকশিল্প। আর এই লোকশিল্পের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে কাঁসাশিল্প।

লোকশিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু কারও একক মতবাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে সামগ্রিকভাবে লোকশিল্প কি তা নিচে দেওয়া হলো–

"সংহত সমাজের গোষ্ঠী-চরিত্র বহনকারী আদিবাসী লোকশিল্পীগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই পূর্বপুরুষ ও সমাজ পারিপার্শ্বিকতা থেকে যে জ্ঞান আহরণ করেন এবং সমাজের মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে বুদ্ধিমত্তা, নান্দনিকতা ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা ঐতিহ্যগতভাবে যে দৃশ্যমান ও প্রয়োগ ধর্মী চারুকারু শিল্প সৃষ্টি করেন তাই লোকশিল্প"।

কাঁসাশিল্প লোকশিল্পের একটি অন্যতম শাখা হওয়ায় শিল্পটির স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে কাঁসা শিল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো–

- কাঁসাশিল্পকর্ম কোনো ইন্ড্রাস্ট্রিতে তৈরি হয় না, হয় লোকআঙ্গিকে ছোটো-বড়ো কুটিরে। যেমন, নাটোরে চকজোতদৈবকি গ্রামে যে কারখানাটি রয়েছে তা মাটি ও খড়ের তৈরি।

www.pathagar.com

- কাঁসাশিল্প তৈরিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশীয় কাঁচামাল ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। শুধু রংটা বাইরে থেকে আমদানি করা হয়।
- কাঁসাশিল্প উৎপাদনকারী কারিগররা আমাদেরই আপনজন, তারা এদেশরই ভূমিজ সন্তান।
- দক্ষ কারিগর দ্বারা সৃষ্ট কাঁসাশিল্পের নানা পণ্যসামগ্রী নান্দনিকতায় সুষমামণ্ডিত হওয়ায় তা সকলের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই নানন্দিকতা কাঁসাশিল্পের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- কাঁসাশিল্প উৎপাদনকারী কারিগররা পুথিগত বিদ্যায়তনিক জ্ঞান ছাড়াই দেখে দেখে বংশপরম্পরায় এই শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন।
- কাঁসার দ্রব্য তৈরি করতে দেশীয় যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
- কাঁসার জিনিস তৈরিতে মিশ্র ধাতু ব্যবহৃত হওয়ায় অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় তা অধিক টেকসই হয়।
- সর্বজনগ্রাহ্যতা কাঁসাশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এর ব্যবহারকারী। এক সময় ছিল যখন কাঁসার জিনিস ব্যতীত ধর্মীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠান অকল্পনীয় ছিল। এমনকি এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণায় কাঁসার তৈরি ঘণ্টা ব্যবহার করা হয়।
- বাঙালিজাতি মাত্রই আনন্দ-উৎসব প্রিয়, তাই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কাঁসার দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আনন্দ উৎসবে সংশ্লিষ্টতা এই শিল্পকর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- বর্তমানকালে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, সাধারণ বাঙালি, পেশাদার-অপেশাদার ও বিত্তবানদের ঘরে প্রাচীন কাঁসাশিল্পের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী লক্ষ্য করা যায়। এতে ঐতিহ্যকে তাদের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত কাঁসাশিল্প বাঙালির আত্ম-পরিচয়ের ধারক ও বাহক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ধাতব পদার্থ মানুষের শরীরের জন্য উপযোগী। যেহেতু কাঁসা মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি তাই কাঁসা-নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী মানুষের শরীরের জন্য উপকারী। এদিক থেকে এটি লোকচিকিৎসার উপকরণ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

কাঁসাশিল্পের নন্দনতত্ত্ব

আমাদের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে মোটামুটিভাবে তিনটি উপকরণজাত শ্রেণিতে বিভাজন করা যায়। যথা—

ক. বস্ত্র বা উপকরণজাত
খ. আকৃতিগত এবং
গ. বিভিন্ন নক্শা সংবলিত

কাঁসাশিল্প একটি আকৃতিগত ধাতব শিল্প। যার ফলে কাঁসা-নির্মিত সামগ্রীতে একমাত্র আকৃতিগত দিক ছাড়া বাহ্যিক কোনো নকশা হয় না। যদিও আকৃতিগত ভাবে

www.pathagar.com

ফিলিগ্রির কাজ ও মিনার কাজ মাঝে মাঝে দেখা যায়। এ শিল্পের একমাত্র নান্দনিক দিক নির্ভর করে এর ধাতব মিশ্রণ ও মসৃণতার ওপর।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাঁসা একটি মিশ্র ধাতব শিল্প। কাজেই এর নান্দনিক সৌন্দর্য ও সৌকর্য নির্ভর করে ধাতুর এই মিশ্রণের ওপর। কোন ঘরানার কারুশিল্প, কারুশিল্পে কতটুকু তামা, দস্তা, রাং বা অন্যান্য ধাতব পদার্থ মিশ্রণ করবেন তার ওপরেই নির্ভর করে এর স্বচ্ছতা, মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা।

এই মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি কারিগর সম্প্রদায়ের কাছে একান্ত গোপনীয় ব্যাপার। যেমন, একমাত্র বাংলাদেশেই অঞ্চলভেদে এর মান ও গুণের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কাজেই মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি একমাত্র পারিবারিক ও বংশগত একটি কারুশিল্প। কিন্তু বর্তমানে কাজের জন্যে একজন শিল্পীকে কারখানায় বাইরে থেকে কারিগর হিসেবে শ্রমিক নিয়োগ করতে হয় বলে সেই গোপনীয়তা আর থাকে না। তবুও কারিগর সম্প্রদায় অতি সচেতনভাবেই এ কাজটি ঐতিহ্যগতভাবে গোপন রাখতে সচেষ্ট হন।

কাঁসা নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী

কাঁসা দিয়ে ঘটি বাটি থেকে শুর করে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্প-সামগ্রী তৈরি হয়। এখানে কয়েকটি শিল্পকর্মের প্রচলিত নাম উল্লেখ করা হলো :

থালা

কান্তেশ্বরী, রাজভোগী, রাঁধাকান্তি, বগী, বেতমুড়ি, চাইনিজ, মালা থালা, দরাজ রাজেশ্বরী, রত্ন-বিলাস, কান্তশ্রী, বেলি, বকুল থালা, ইত্যাদি।

গ্লাস

গুল্টা, কলতুলা, সাদাকাঁচের নমুনাযুক্ত গ্লাস, স্বন্দেশ গ্লাস, (চারপার্ট) গেনি।

জগ

কৃষ্ণচুড়া, ময়ূরকণ্ঠী, বগঠোঁটি, ময়ূর আঁধার, মল্লিকা ইত্যাদি।

বাটি

সাদাবাটি, দুধবাটি, জামবাটি, কাংরিকাটি, বোলবাটি, রাজভোগী, রাধেশ্বরী, জলতরঙ্গ, রামভোগী, গোলবাটি, ফানাইলাল, কাজলবাটি, ঝিনাইবাটি, গঞ্জবাটি, ফুলতুলিবাটি, মালাবাটি, কৃষ্ণ কান্তি ও চায়নিজ বাটি।

চামচ

বোয়ালমুখি, হাতা, চন্দ্রমুখি, চাপিলামুখি, পদ্মমুখি, পদ্মখোলা, ঝিনাইমুখি, কইতর ঠোঁট ইত্যাদি।

এছাড়াও বদনা, বালতি, কলস, ডেকচি, খুন্তি, পানের বাটা, সরতা, চিলুমচি, পিকদানি, মোমদানি, আগরদানি, ফুলদানি, সুরমাদানি, ধূপদান, দুধদানি, তরিতরকারির পাত্র, গাছপাত্র, রাশিচক্র, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও ছোটো ছেলে

www.pathagar.com

মেয়েদের খেলনা পুতুল ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এসব দ্রব্যসমূহের বাইরে মন্দিরে পূঁজা অর্চনায় ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন আসবাবপত্র রয়েছে। যার সংখ্যা অনেক। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে কোসা–কোষি, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গলঘট, কাঁসার বাদ্য ইত্যাদি। তবে কাঁসা নির্মিত এইসব দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে বর্তমানে নাটোরে কয়েক ধরনের-থালা, বাটি, গ্লাস চামচ ও পূঁজা-অর্চনায় ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা হয়।

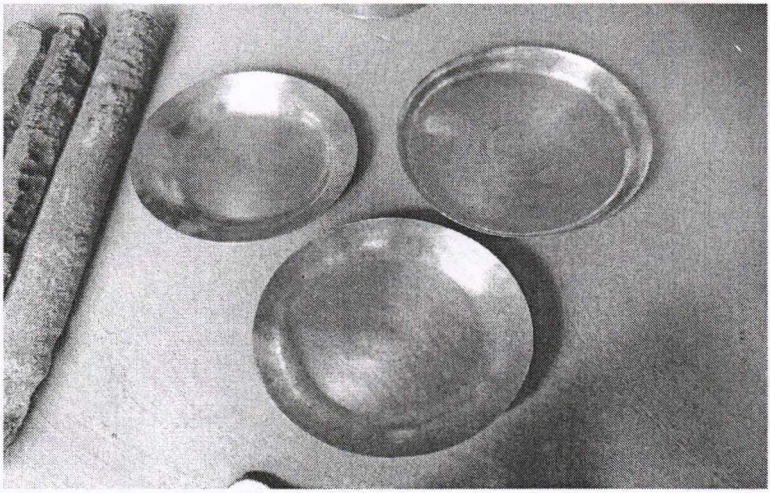

কাঁসার তৈরি বগিথাল (লালপুর)

কাঁসার শিল্প-সামগ্রী তৈরির অঞ্চল

বাংলাদেশের কাঁসা শিল্পীরা সাধারণত পেশাগত কারণেই পারিবারিকভাবে একটি পাড়ায় বা মহল্লায় থাকতে অভ্যস্ত। যা কাঁসারিপাড়া বা কাঁসার পাড়া নামে পরিচিত। এ শিল্পীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন ধামরাই, শিমুলিয়া, টাঙ্গাইল কাগমারী, মগড়া, জামালপুর, ইসলামপুর, বগুড়ার শিববাড়ি, রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ, পালং, চট্টগ্রাম ও নওগাঁ, নাটোরের লালপুর ইত্যাদি এলাকা, পাড়া বা গ্রামে বসবাস করেন। তবে একজন বিজ্ঞ কাঁসাশিল্পীর মতে নাটোরেই প্রথম বাইরে থেকে কংস বণিকেরা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে এরা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েন।

কাঁসাশিল্পের মোটিফ

কাঁসানির্মিত দ্রব্যসামগ্রীতে খোদাই করে বিভিন্ন নকশা তোলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফুল, লতাপাতা পাখি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং জ্যামিতিক নক্শা অঙ্কন করা হয়। বিভিন্ন থালাতে, কলসিতে, বাটিতে এই ধরণের নক্শা দেখা যায়। যদিও বর্তমানে এই নক্শা প্রবণতা অনেকটা কমে গেছে।

www.pathagar.com

নির্মাণ পদ্ধতি

নাটোর জেলার লালপুরে মূলত তিন পদ্ধতিতে কাঁসা শিল্পের কাজ হতো–

১. কাদামাটির ছাঁচে ঢালাই পদ্ধতি
২. কালোমাটির ছাঁচে ঢালাই পদ্ধতি
৩. পিটানো পদ্ধতি

উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি হলো পিটানো পদ্ধতি এবং খুব সম্ভব এটিই লালপুর অঞ্চলের ধাতুশিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। প্রথমেই কাঁসা দ্রব্যের প্রচলিত পিটানো পদ্ধতি ও নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

কাঁসা শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

পিটানো পদ্ধতি

মানব সভ্যতার আদি পর্বে মানুষ তামা ও তামাজাত অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে পিটিয়ে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যাদিতে আকৃতি দিতে শিখেছিল। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন নবপলীয় যুগ থেকে তাম্রপ্রস্তর যুগে প্রবেশ করে, তখন থেকে ধাতু পিটিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরির ধারা প্রচলিত হয়। লালপুর অঞ্চলে পেটানো পদ্ধতিতে থালা, বাটি, চামচ, কলসি, ঘণ্টা, কাঁসি, ছেনি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। তবে এগুলোর প্রত্যেকটির নির্মাণ পদ্ধতিতে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে পিটানো পদ্ধতিতে লালপুর অঞ্চলের চকজোতদৈবকী গ্রামের শ্রী অবনীচন্দ্র হালদারের

www.pathagar.com

কারখানায় নির্মিত থালা তৈরির কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার পূর্বে থালা তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জানা যাক–

থালা নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

পেটানো পদ্ধতিতে থালা নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধারণত উপকরণ হিসেবে মাটি, পানি, রাং, তামা, কাঠ, কয়লা, ধুপ, ধানের তুষ, ইটের গুঁড়ো, মেটাল পলিশ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় এবং হাতিল, হাতুলি, শাবল (ছোটো, বড়ো), সাঁড়াশি, অঙ্কনশলাকা, র‍্যাত, লেই, বেরি, কাটানি, বিভিন্ন মাপের লোয়ালি, কুনযন্ত্র, মুচি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

থালা নির্মাণ কৌশল

পিটানো পদ্ধতিতে দ্রব্যাদি তৈরির জন্যে বিশেষ ধরণের ছাঁচ তৈরি করা হয়। এজন্যে বাড়ির কাছাকাছি জায়গা জায়গা থেকে কারিগরেরা কালো মাটি সংগ্রহ করেন। কালো মাটির সঙ্গে তুষ ও পানি মিশিয়ে বিশেষ ধরনের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণ দিয়ে ১.৫ ইঞ্চি পুরু ও ৭/৮ ইঞ্চি ব্যাসের গোলাকার ধরণের ছাঁচ তৈরি করা হয়। এই ছাঁচকে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নেওয়া হয়। এর ওপর প্রায় ৬ ইঞ্চি ব্যাসের এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি উঠিয়ে আগুণে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়। এই ছাঁচগুলো তখন ঢালাইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়। এভাবে তৈরি ছাঁচ প্রায় কয়েক মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে।

কারখানাগুলোতে মূলত সন্ধ্যার দিকে ঢালাইয়ের কাজ করা হয়। সাধারণত রাং ও তামার মিশ্রণে কাঁসা তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণে সাড়ে ৩ কেজি তামার সাথে ১ কেজি রাং ব্যবহার করা হয়। তাই এই কারখানায় রাং ও তামা গলানোর জন্যে ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট মুচি ব্যবহার করা হয়। মুচিকে কেউ কেউ ফর্মা বলে থাকেন। এক সঙ্গে প্রায় ১৫-২০ টি মুচি ধাতুপূর্ণ করে চুল্লির ভেতর স্থাপন করা হয়। সাধারণত এইসব কারখানায় কোনো নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে চুল্লি তৈরি করা হয়। এর সঙ্গে পাইপ যুক্ত করে হাতিল দিয়ে বাতাস করা হয়।

এ ধরনের কারখানায় মূলত ৭-৮ জন কারিগর কাজ করেন। থালা তৈরির ক্ষেত্রে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ ক্ষেত্রে একজনই অনেকের কাজ সম্পাদন করে থাকেন। থালা তৈরির প্রতিস্তরেই কারিগরদের আলাদা নাম রয়েছে। যেমন :

- গড়নদার
- বারনদার
- হাননদার
- মাঠনদার
- চাঁছনদার
- কুননদার
- টাননদার

www.pathagar.com

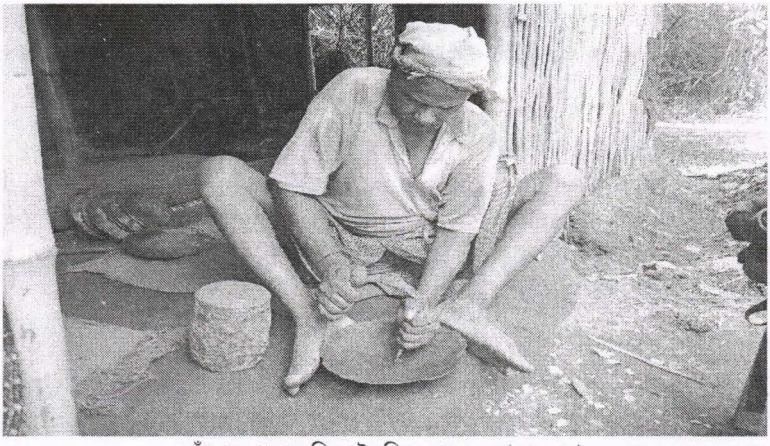

কাঁসার থালার ডিমা তৈরি করা হচ্ছে (লালপুর)

ঢালাইয়ের পদ্ধতিতে ধাতু গলানোর সময় মুচিগুলির মুখ বন্ধ করা হয় না। ধাতু গলে গেলে একজন কারিগর সাঁড়াশি দিয়ে মুচিগুলো একটা একটা করে বের করেন এবং সারি সারি সাজিয়ে রাখা ছাঁচের মধ্যে ধাতু ঢালতে থাকেন। উত্তপ্ত ও গলিত ধাতু ছাঁচে ঢালার পরই 'সোহাগা' ছিটিয়ে দেওয়া হয় যেন ধাতুমল ওপরে উঠে আসে। সোহাগা হিসেবে সাধারণত ধানের তুষ ব্যবহার করা হয়। ধাতুমল ওপরে জমা হলে তা ফেলে দেওয়া হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধাতু জমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন ছাঁচ থেকে ঢালাইকৃত দ্রব্যটি বের করা হয়। স্থানীয় ভাষায় এটিকে 'ডিমা' বলে। এভাবে প্রতিদিন এ ধরনের কারখানায় ২০-৩০টি পর্যন্ত ডিমা তৈরি করা হয়। মূলত এই অংশটুকুর কাজ গড়নদার সম্পন্ন করে থাকেন।

এভাবে ডিমা তৈরির পর ওজন করে ৫-৬টা কিংবা ১০-১২ ডিমা একত্রে হাতিলের সাহায্যে চালিত ছোটো চুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়। লালবর্ণ ধারণ করলে ডিমাগুলোকে হাতুড়ি দিয়ে অনেকে মিলে একসঙ্গে পেটানো হয় আয়তন বৃদ্ধির জন্যে। এজন্যে কারখানার ভেতর একটি গর্ত তৈরি করা হয় এবং গর্তের মাঝখানে লোহারদন্ড স্থাপন করা হয় যেটার ওপর রেখে ডিমাগুলো পেটানো হয়। স্থানীয় ভাষায় এই লোহার দণ্ডকে 'লেই' বলে। কারিগরেরা গর্তের চারপাশে গোল হয়ে বসেন এবং পর্যায়ক্রমে ডিমাগুলো কিছুটা বাঁকা, মোটা ও ভারী হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে থাকেন। এসময় একজন মূল কারিগর ডিমাগুলো একটা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে রাখেন এবং প্রয়োজনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডিমাগুলোর আয়তন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। করিগরেরা এমনভাবে ডিমা পেটাতে থাকেন যেন কারও হাতুড়ি অন্য আরেকজনের হাতুড়ি স্পর্শ না করে। এভাবে একদফা আঘাত করার পর প্রধান কারিগর পুনরায় গরম করার জন্যে ডিমাগুলোকে চুল্লির ভেতর রাখেন। এভাবে ৭-৮ মিনিট উত্তপ্ত করা হলে আবার লেই এর ওপর ডিমাগুলো স্থাপন করা হয়। পুনরায় কারিগররা হাতুড়ি দিয়ে সকলে মিলে একযোগে পেটানোর কাজ করেন। এ রকম কয়েক দফা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ডিমাগুলো ১৫ থেকে ১৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়। অবশ্য এটি মহাজন যে মাপের থালা তৈরি করতে বলবেন বা যে

www.pathagar.com

থালা তৈরি করতে বলবেন সেই আকারের ওপর নির্ভর করে। মূলত এই অংশটুকুর কাজ বারনদারেরা করে থাকেন।

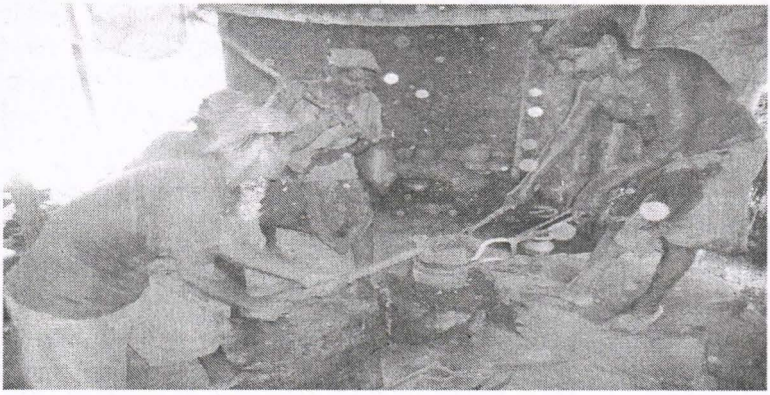

কাঁসার থালা পেটানো হচ্ছে (লালপুর)

এরপর একটি পেটানো ডিমা নিয়ে লবন পানি মেশানো কাদামাটির হালকা প্রলেপ দেওয়া হয়। কাদামাটির প্রলেপযুক্ত ডিমাকে হাতিল চালিত কয়লার ছোটো চুল্লিতে শুকানো হয়। এই ডিমাকে খুব উত্তপ্ত করে সাঁড়াশি দিয়ে তুলে কারখানায় এক পাশে স্থাপিত একটি গাছের গুড়ির এক প্রান্তে গর্ত করে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়। এটা করা হয় উদ্‌গত প্রান্ত অর্থাৎ থালার ক্ষেত্রে কান্দা তৈরির জন্যে। এভাবে পর্যায়ক্রমে কয়েকবার উত্তপ্ত করে এবং পিটিয়ে উদ্‌গত প্রান্ত তৈরি করা হয়। এই অংশটুকুর কাজ হাননদার করে থাকেন। মূলত হাননদারই ঠিক করেন থালাটি কি থালা হবে। বগিথালা, বেলিথালা নাকি রাধাকান্তি থালা।

কাঁসার থালা পেটানো হচ্ছে (লালপুর)

www.pathagar.com

এরপরের কাজটি হলো মাঠনদারের। মাঠনদার থালা নিখুঁতিকরণের প্রাথমিক পর্যায়টি সম্পন্ন করেন। তিনি একটি অঙ্কন শলাকা দিয়ে পেটানো ডিমাকে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের আকার প্রদানের জন্যে থালার কান্দার বাড়তি অংশ চিহ্নিত করে হাতুড়ি ও ছেনি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে থাকেন। এছাড়া থালা ট্যারা-বাঁকা হয়ে থাকলে তা সোজা করা এবং পৃষ্ঠদেশ হাতল দিয়ে পিটিয়ে সমতল করা হয়। সামান্য প্রোথিত একটি পাথরের ওপর রেখে এই কাজটি করা হয়। এভাবে প্রায় পূর্ণাঙ্গ থালা তৈরি হয়ে গেলে এটাকে পানি ভর্তি একটা পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়।

চাঁছনদার কুর্নির মত লোহার তৈরি লোয়ালি দিয়ে থালাটিকে দুই পায়ের তলায় রেখে পরিষ্কার করেন। নিখুঁতিকরণের প্রথম পর্যায়ে র‍্যাত দিয়ে কান্দার ওপরের প্রান্ত মসৃণ করা হয়। এরপর লোয়ালি দিয়ে ভেতরের অংশ চাঁছা হয় এবং লোহার দণ্ড দিয়ে ঘষা হয়। নিখুঁতিকরণের সর্বশেষ পর্যায়টি সম্পন্ন করেন কুননদার।

হাতিলের সাহায্যে কয়লার ছোটো চুল্লিতে আগুন জ্বালানো হয়। উক্ত উত্তপ্ত কয়লা থালাটির মাঝখানে রেখে থালা গরম করা হয়। এরপর কুনযন্ত্রটি উত্তপ্ত থালার মাঝ বরাবর নিচে ধরে আটকানো হয়। কুনযন্ত্রটির মাথায় গলিত ধুপ লাগানো থাকায় থালাটি খুলে যায় না। এরপর থালা থেকে কয়লা ফেলে মূল যন্ত্রের সাথে কুনটি যুক্ত করা হয়।

কাঁসার বুনযন্ত্রে থালা লাগানো হচ্ছে (লালপুর)

এই কাজে কুননদারকে সাহায্য করেন টাননদার। টাননদার রশির সাহায্যে টেনে কুনযন্ত্রটি চালান এবং কুননদার লোয়ালি দিয়ে চেঁছে থালাটি মসৃণ করে থাকেন। এরপর অতি সাধারণ নকশা তৈরি করে থালা তৈরির কাজ শেষ করা হয়। তবে ইদানিং বৈদ্যুতিক কুনযন্ত্র ব্যবহার করায় টাননদারের প্রয়োজন পড়ে না। থালা তৈরির কাজ শেষ হলে থালার নিচে যে কালো কালো দাগ থাকে তা ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা হয় এবং থালার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি জন্যে এতে মেটাল-পালিশ দিয়ে ঘষা হয়। এভাবে এই কারখানাগুলোতে ১ দিনে ৬০ টির মতো থালা তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

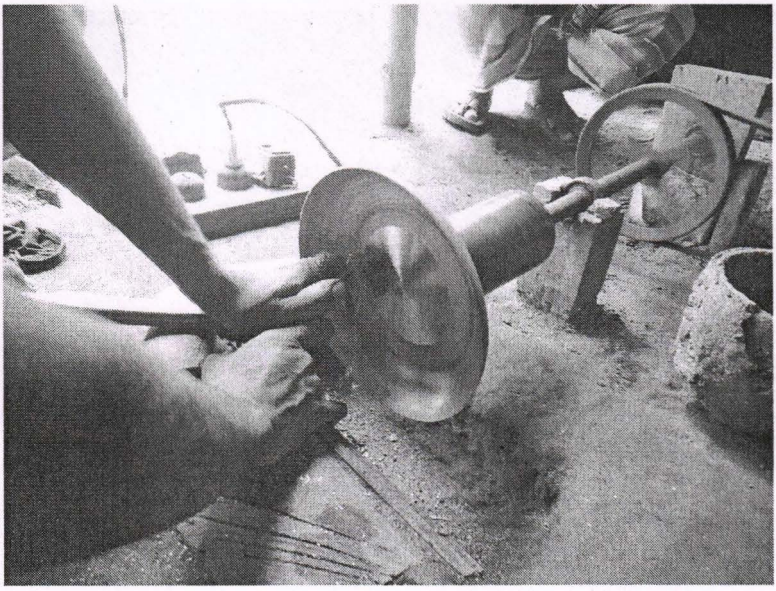

কাঁসার থালা মেসিনে ফিনিশিং করা হচ্ছে (লালপুর)

কাঁসাশিল্পের অতীত ও বর্তমান চালচিত্র

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই একসময় কাঁসারি কিংবা কর্মকারদের আবাস ছিল। এই পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা কোথাও কম, কোথাও তুলনামূলক বেশি ছিল। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে কাঁসারি কিংবা কর্মকার শ্রেণি বিশেষ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতেন। অতীতে এ ধারার পেশাজীবীগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহসামগ্রী, শৌখিনদ্রব্য ও দেবমূর্তি তৈরি করতেন। এ সমস্ত জিনিসপত্রের গায়ে বিভিন্ন ধরণের নকশা এবং কারুকার্য থাকত। এ কারুকার্য থেকে সেকালে তাদের শিল্প নিপুনতার পরিচয় পাওয়া যেত। গ্রাম-গঞ্জে, নগরে, হাটে- বাজারে সবখানেই এদের পদচারণা ছিল। মাথায় অথবা বাকের সাহায্যে ঝুড়িতে রেখে কাঁধে বয়ে এরা গ্রামে গ্রামে এসব জিনিস বিক্রির ঘুরতেন। হাটে-বাজারে, বন্দরে, গঞ্জে, মফস্বল শহরে কাঁসারুদের দোকান ছিল অপ্রতুল।

আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাঁসার তৈরি বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল। ঘর-গেরস্থালিতে ব্যবহার ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় উৎসব ও আচরণ পালনে এমনকি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপহার হিসেবেও কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদি ব্যবহারের চল ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই সময় পর্যন্ত কাঁসার জিনিসের ব্যাপক চাহিদা ছিল দেশজুড়ে।

www.pathagar.com

লালপুর কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাঁসার থালাবাসন

সেই সময় গোস্ত-সওদাগরি ব্যবসার প্রচলন ছিল। ঘোড়ার পিঠে বস্তা ভর্তি করে কাঁসা শিল্প নির্মাণের উপাদান দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হতো। তারা বছরে দুইবার এই বাণিজ্যের জন্যে দেশের বাইরে যেতেন এবং এই উপাদানগুলো দিয়ে দেশীয় কারিগররা দ্রব্য-সামগ্রী নির্মাণ করতেন। সাধারণত ভারত ও মালয়েশিয়া থেকে এই কাচামাল আমদানি করা হতো। নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় এক সময় এই ব্যবসা করে অনেক মানুষই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

আশির দশকে বাজারে প্লাটিক, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসপত্রের প্রচলন ঘটে। অল্প কিছুদিন পরেই আবির্ভাব ঘটে মেলামাইনের বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্রের। এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় এবং আরও নানাবিধ কারণে মানুষ কাঁসার তৈরি জিনিসপত্রের পরিবর্তে এসব নতুন জিনিস ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে কাঁসার তৈরি দ্রব্যের বাজার সংকুচিত হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই বাজার সংকুচিত হলে চাহিদা কমে যাবে এবং চাহিদা কমে গেলে উৎপাদান হ্রাস পাবে। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো নাটোর জেলাতেও কাঁসার যে সব দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হতো তার বাজার এবং চাহিদা দুটোই কমে গেছে, কমে গেছে উৎপাদনও। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত অল্প কয়েকজন ব্যক্তি এখনও অনেকটা বাধ্য

www.pathagar.com

হয়েই এই শিল্পটি ধরে রেখেছেন। বিপুল সংখ্যক কারিগর এই পেশা ত্যাগ করেছেন কিংবা করার কথা ভাবছেন।

অতীত কাল থেকে কাঁসা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারিগর, কারখানার মালিক ও মহাজনদের ভেতর একটা পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। এই শিল্পকর্মে তিন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বরাবরই মহাজনরা বেশি সুবিধা ভোগ করেন এবং কারিগর শোষিত হন। তবে কাঁসার দ্রব্য তৈরির ক্ষেত্রে যে কাঁচামাল (রাং ও তামা) ব্যবহার করা হয়, অতীতে তার দাম কম থাকায় এই শ্রেণিবৈষম্যের প্রভাব সেরূপ কার্যকর হয় নি। বর্তমানে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পর্যাপ্ততা না থাকায় এই শ্রেণিবৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে ১ কেজি রাং-এর দাম ৩ হাজার টাকা এবং তামা কেজি প্রতি ৫০০ টাকার মতো। ফলে ব্যয়বহুল এই শিল্পকর্ম টিকিয়ে রাখাও এখন অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। মহাজনের সাথে কারখানার মালিক ও কারিগরদের সম্পর্ক কিরূপ তা বোঝার জন্যে বিষয়টি আরও একটু ব্যাখা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার চকজোতদৈবকী গ্রামের শ্রী অবনীচন্দ্র হালদারের কারখানার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়–

এই কারখানাটিতে পিটানো পদ্ধতিতে কাঁসা নির্মিত থালা, বাটি, কলসি তৈরি করা হয়। এখানে মহাজনের ফরমায়েশের ভিত্তিতে কাজ করা হয়। মহাজন যখন কারখানার মালিককে ফরমায়েশ দেন তখন প্রয়োজনীয় উপাদান (ঘাটতিসহ) সরবরাহ করা হয় ধরা যাক, ২০ কেজি জিনিসের অর্ডার দেওয়া হলো, সে ক্ষেত্রে কারখানার মালিককে দেওয়া হয় ২৫ কেজি কাঁসা। কারখানার মালিক কারিগরদের সহায়তায় দ্রব্য উৎপাদন করেন এবং উৎপন্ন দ্রব্য মহাজনকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর প্রতি কেজি হিসেবে কাজের মজুরি দেন। পিটানো পদ্ধতিতে এই মজুরি হয় কাঁসার ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ১১৫ থেকে ১২৫ টাকা। কারখানার মালিক এই টাকা থেকে একটা অংশ নিজের জন্যে রেখে বাকিটা শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেন। কারিগররা শ্রমের মজুরি হিসেবে ১০০ থেকে ১০৫ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন। এভাবে একজন শ্রমিক সপ্তাহে ৬০০ থেকে ৬৩০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন। তবে এই হিসাব সাধারণ কাঁসার থালা নির্মাণের ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে মহাজন উৎপন্ন দ্রব্য ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন। কাঁসার দ্রব্য বিক্রি হয় ওজনের ভিত্তিতে। কাঁসার দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য প্রতি কেজি ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকার মতো। ফলে লক্ষ করলে দেখা যাবে সবকিছু মিলে মহাজন মুনাফার মোটা অংশ পকেটস্থ করছেন। অনেক সময় এসব মহাজন বিভিন্ন জায়গা থেকে কাঁসার বিভিন্ন দ্রব্য তৈরির অর্ডার পান। যেমন, জনৈক মহাজন আব্দুল লতিফ কুষ্টিয়া, রাজশাহী, নওগাঁ থেকে বেশি কাজের অর্ডার পান কেননা সেখানে হিন্দুর সংখ্যা বেশি। হিন্দুরা কাঁসার জিনিসপত্র বেশি ব্যবহার করেন। এই ফরমায়েশি কাঁসা পণ্য তখন মহাজন কারখানার মালিককে বুঝিয়ে দেন। এভাবেই মহাজনদের সাথে কারখানার মালিক ও কারিগরদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অধিকাংশ কারিগরদের নিজস্ব কোনো পুঁজি নেই। খুব অল্প কয়েকটি কারখানাতেই কারখানার মালিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেন। লালপুর অঞ্চলে বর্তমানে

www.pathagar.com

যে দুটি কারখানা রয়েছে তাতে কারখানার মালিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি অংশ নেন। কিন্তু অন্যরা এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেভাবে অংশগ্রহণ করেন না। বরং তারা পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফার মোটা অংশের টাকা আত্মসাৎ করেন।

বর্তমানকালে এই শিল্পের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির কারণ এবং সম্ভাবনাময় দিকসমূহ :

নাটোর জেলার যে দুটি উপজেলায় কাঁসা শিল্পের উৎপাদন বেশি হতো সে-সকল অঞ্চল কাঁসা শিল্পের জন্যই বিখ্যাত ছিল। কলমগ্রাম, চকজোতদৈবকী গ্রামের বুধপাড়াতে যেখানে সকালের ঘুম ভাঙত হাতুড়ি পেটানোর শব্দে, আজ তা ক্রমেই ধ্বংসের পথে। এমনকি অনেক কলকারখানা এরমধ্যে ধ্বংস হয়েও গেছে। আগে নাটোরে ৩০০ থেকে ৪০০টি কারখানা ছিল। বর্তমানে তার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেতে পেতে এমনকি লালপুর অঞ্চলে চকজোতদৈবকী গ্রামের যে দুই একটি কারখানা ছিল তাও হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই এই সকল কারখানাগুলোতে কমতে শুরু করেছে। আগে যেখানে ৩০ থেকে ৪০ জন শ্রমিক বা কারিগর কাজ করতেন, সেই সব কারখানায় বর্তমানে ৬ থেকে ৭ জন, আবার কোনোটিতে ২ থেকে ৩ জন কারিগর কাজ করছে। কারণ এখন এই শিল্প-কর্মের চাহিদা ও উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে তারা তাদের বাপ দাদার পেশা ছেড়ে অন্যান্য পেশাতে নিযুক্ত হচ্ছে। আর এই বিলুপ্তির পেছনে চিহ্নিত দুটি বিষয় মূলত গুরুত্বপূর্ণ–

প্রথমত, গত দুই দশকে আধুনিক প্রযুক্তিতে উৎপাদিত প্লাস্টিক, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম এবং মেলামাইন সামগ্রীর দাম অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এগুলোর ব্যবহার বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে এসব সামগ্রীর আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁসার সামগ্রীর চাহিদা, ব্যবহার এবং উৎপাদন স্বাভাবিক কারণেই হ্রাস পেয়েছে। এমনকি, কাঁসা-সামগ্রী উৎপাদন হয় যে বাড়িতে, সেই বাড়ির মহিলারাও এগুলো ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছেন। শহরে তো বটেই, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামেও ঘর গেরস্থালির কাজে কাঁসার সামগ্রীর গ্রহণযোগ্যতা আগের মতো নেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কাঁসার সামগ্রী প্রদানের রেওয়াজও প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। ধর্মীয় উৎসবে এসব সামগ্রীর চল এখনো থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিকল্প সামগ্রীর।

দ্বিতীয়ত, গত কয়েক বছরে ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় ভাঙারির অপর্যাপ্ততা, এমনকি সময় মতো ভাঙারি না পাওয়ার কারণে এই শিল্প বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, নাটোর জেলায় কাঁসা শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে যা ব্যবহৃত হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় 'ভাঙারি' বলে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কাঁসা পিতলের পুরাতন তৈজসপত্র এবং অন্যান্য জিনিস, যেগুলো স্থানীয় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তাই 'ভাঙারি'। ফেরিওয়ালারা গ্রামগঞ্জ থেকে এসব পুরাতন ভাঙা কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র সংগ্রহ করে আনেন। চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় জাহাজ ভাঙা থেকেও পর্যাপ্ত 'ভাঙারি' আসত বলে জানা যায়। যদিও এখন জাহাজ ভাঙা থেকে তামার পাত সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই 'ভাঙারি' এখন আর সহজলভ্য নেই। ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া এমন অভিযোগও শোনা গেছে যে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কাঁসা-পিতলের ব্যাপক চাহিদা থাকায়,

www.pathagar.com

চোরাচালানের মাধ্যমে এদেশীয় ভাঙারি সীমান্তের ওপারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ভাঙারি কিংবা কাঁসার অপর্যাপ্ততা ও মূল্যবৃদ্ধির এটাও একটা কারণ বলে স্থানীয় কারিগররা মনে করেন। কাঁসার তৈরি জিনিস বেশি ব্যবহার করতেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। দেশভাগের পর, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের পরও কয়েক দশকে বিশাল অংশের হিন্দু সম্প্রদায় দেশান্তরী হয়েছেন। কাঁসার জিনিসপত্রের চাহিদা কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে এরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দারা আরও বলেন, মহাজনের স্বৈরশাসন, শোষণের জন্যেও এই শিল্পের অবক্ষয় ঘটেছে।

নাটোর জেলার কাঁসাশিল্পের সঙ্গে জড়িত কারখানার মালিক ও কারিগর, এমনকি মহানজনরাও আর্থিক দুরবস্থার শিকার হয়েছেন। চাহিদা এবং উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় কারখানা মালিকেরা অনেকে বাধ্য হয়ে অন্যান্য পেশার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কারিগররাও পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। যারা এখনো এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, তারা অনেকটা বাধ্য হয়ে আছেন। কেননা, তাদের ভাষ্য অনুযায়ী আর কোনো কাজ তাদের জানা নাই। কাঁসাশিল্পের এই দুরবস্থা দেখে পুরনোরা তাদের সন্তানদের এ পেশায় আসতে উৎসাহিত করছেন না। নতুন প্রজন্মও এই পেশায় আগ্রহী নয়। ফলে নতুন কারিগর তৈরির সম্ভাবনা বিনষ্ট হচ্ছে। যদিও যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় লালপুর ও সিংড়া উপজেলার কলম ও বুধপাড়া গ্রামে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার কাঁসা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।

এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে সর্বপ্রথম জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এমনকি কাঁসার তৈরি তৈজসপত্রের গুণাগুণ কিংবা গুরুত্ববিষয়ক কোনো বিজ্ঞাপণ টিভি-চ্যানেলে প্রচারের মাধ্যমে এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন ও নতুন করে আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। যেমন, কাঁসার তৈরি জিনিসপত্র মেলামাইন কিংবা স্টিল কিংবা প্লাস্টিক নির্মিত তৈজসপত্রের চেয়ে টেকসই বেশি হয়। আবার কাঁসার থালা বা বাটি কোনো কারণে ভেঙে গেলেও তা যে দামে কেনা হয়েছিল তার চেয়ে কিছু টাকা কম দামে ভাঙারি পট্টিতে বিক্রি করে দেওয়া সম্ভব। ফলে এর ক্ষয় নেই যা প্লাস্টিক বা মেলামাইন এর ক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং কাঁসার তৈরি তৈজসপত্রের এই দিকগুলো বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে সচেতন করা যেতে পারে।

বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি সুষ্ঠ বিক্রয় ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। তবে সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টা নিশ্চিত করা তা হলো ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ। এমনকি সরকার কর্তৃক যদি এই কাঁচামালের সুষ্ঠ জোগান দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখা যাবে, এবং ভাঙার চোরাচালানের মাধ্যমে অন্য দেশে পাচার হয়ে যাওয়াও রোধ করতে হবে যা সরকারের একান্ত দায়িত্ব।

এছাড়া এ শিল্পের উন্নয়নের জন্যে প্রান্তিক পর্যায়ের কারিগরদের সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে যে বিষয়টি জরুরি তা হলো বাজার সৃষ্টি করা যেখানে কারখানার মালিক স্বয়ং পণ্যের অর্ডার পাবেন এবং

www.pathagar.com

তিনি নিজেই তা বিক্রি করে আসবেন। এতে করে মহাজনের একনিষ্ঠ স্বৈরশাসন অনেকটা বিলুপ্ত করা সম্ভব। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে কাঁসা শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন দেখানো যেতে পারে যা বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন ঘটলেও, সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে যদি নির্মাণকৌশল ও পদ্ধতির উন্নয়ন করা সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষ তো বটেই, পৃথিবীর আরও অনেক দেশের মানুষ নাটোরে উৎপাদিত কাঁসার তৈরি নানা রকম দ্রব্যের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে।

নাটোরের কাঁসাশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আর্থসামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের পূর্বে কাঁসাশিল্পীদের সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া যাক–

গৃহস্থালি কাজ-কর্মে ব্যবহারের জন্যে তামা, কাঁসা ও পিতল দিয়ে যারা নানা দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন তাদের কংসকার বা কাঁসারি বলা হয়। কবি কঙ্কন মুকুন্দ রচিত 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে কাঁসারুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যে কাসারুদের পরিচয় এভাবে পাওয়া যায়–

কাঁসারি পাতি আশাল ঝারি খুরি গড়ে খাল
বাটী ঘটি বট লই শিপ।

পেশাগত দিক থেকে তাদের নিচু জাত বলে অভিহিত করা হয়। সূবর্ণবণিক সম্প্রদায় থেকে কাঁসারিদের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। কাঁসারিদের বিস্তৃত পরিচিতি ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণে বিবৃত–"স্বর্গের অপসরা অভিশপ্ত ঘৃতাচি ও অভিশাপগ্রস্ত ব্রাহ্মনরূপী বিশ্বকর্মার নয় জাতির অন্যতম কাঁসারি",

আবার বৃহদ্ধর্ম পুরাণ মতে ব্রাহ্মনের ঔরসে বারাঙ্গনার গর্ভে অম্বষ্ট, গন্ধানিক, শঙ্ককার ও কসংকার জাতির উৎপত্তি।

ভার্গবরামের জাতিমালা মতে–

গান্ধিক ঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংসিকো মনিকারক ঃ
সুবর্ণবনিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিক স্মৃতাঃ॥
শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতস্তাম্র কাংস্যোপজীবিকাঃ॥

অর্থাৎ বণিক বা বেনিয়া জাতি পাঁচ প্রকার–গন্ধবণিক, শঙ্খবনিক, কংসবনিক (কাঁসারি), মনিকার ও সুবর্ণবণিক। গন্ধবণিকের ঔরসে শঙ্খবণিক কন্যার গর্ভে তাম্র ও কাংস্য উপজীবী কংসবণিকের উৎপত্তি হয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশের কংসকারদের পূর্বপুরুষগণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসেছিলেন। কাঁসারিদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। তবে শৈব হিন্দুরাই মূলত এই পেশার সঙ্গে বেশি জড়িত এরা বিশ্বকর্মার পূজা করেন। পূজার দিন তারা কোনো কাজকর্ম করেন না। আবার কাঁসারিদের মধ্যে হিন্দুদের ক্ষেত্রে পদবি, ঘর ও ভিন্ন ভিন্ন গোত্র দেখা যায়। যেমন–

হিন্দুদের ক্ষেত্রে–কুণ্ড, প্রামানিক, দাস, দাঁ, পল, নন্দন, দে, হালদার ইত্যাদি।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে– মণ্ডল, সরদার ও প্রামাণিক।

www.pathagar.com

এবার আসা যাক কাঁসারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রসঙ্গে–

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো নাটোরে যে সকল কাঁসাশিল্পী রয়েছেন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশ পরিবারের বসতবাড়ি অত্যন্ত নিম্নমানের। বৈদ্যুতিক সুবিধা থাকলেও সিংহভাগ পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বৈদ্যুতিক সংযোগ নিতে পারছেন না। তরুণদের মধ্যে শিক্ষাবিরতি ও শিক্ষাকালীন সময়ে ঝরে যাওয়ার প্রবণতা অত্যধিক। এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক সংকট। নাটোরের কাঁসাশিল্পীরা বেশিরভাগ কৃষিকাজে অনভ্যস্ত। তাদেও বসতবাড়িটি ছাঁড়া চাষযোগ্য জমি নেই বললেই চলে। ফলে তাদের আর্থিক ব্যয় সংকুলানের জন্য কাঁসা শিল্পের নানাবিধ তৈজসপত্র নির্মাণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে এখন কেউ কেউ বংশাশ্রিত পেশা ছেড়ে ছোটো খাটো ব্যবসায় যেমন, সোনার কাজ, মুদিখানার দোকানদারি, কাঠের কাজ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন যদিও পূর্বে এই পেশার মাধ্যমে অনেকে প্রচুর টাকা আয় করতেন। এবং সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতেন কিন্তু বর্তমানে তাদের উত্তরাধিকারীগণ চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছে।

আর্থিক দীনতার মতো সামাজিকভাবেও তারা অত্যন্ত নাজুক। অশিক্ষা, যৌতুকপ্রথা, অপরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা তাদের সামাজিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। এই কাঁসারিদের মধ্যে পূর্বে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংঘ বা সমিতি গড়ে উঠতে দেখা গেলেও বর্তমানে তার কিছুমাত্রও দেখা যায় না। নিজস্ব পেশাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের উন্নত বাণিজ্যিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। বৈবাহিক ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো সামাজিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপন করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ঋণগ্রহণ ও সামর্থের অধিক ব্যয় করার প্রবণতা খুব বেশি। ফলে এ সকল সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে আর্থিক বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসে।

কল্পিত নিচু জাত হওয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ স্বাগোত্রে বিবাহ হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যে এই সম্প্রদায়ে জন্ম নেওয়া ছেলে বা মেয়ে ছোটো থেকেই এই কর্মের সাথে জড়িত হওয়ায় তারা অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ করতে নারাজ। তবে বর্তমানে এই ধারণা শিথিল হয়ে গেছে। কেননা অনেকে এই পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তবে আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, বর্তমানে এই পেশার সাথে জড়িত শ্রমিক বা কারিগরদের সাথে একই সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ে দিতে অনেক পরিবারই দ্বিধাবোধ করছে। কারণ তারা জানেন এই পেশার কারিগরদের সাথে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিলে মেয়ে খুব ভালো থাকবে না। এমনকি বিয়ের পর বউরা চায় না তাদের স্বামীরা এই পেশায় জড়িত থাকুক। ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিষয়টি এখন দারুন জটিল রূপ নিয়েছে।

এছাড়া হিন্দু সমাজের ঘৃন্য বর্ণ প্রথার দরুন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে অনেক নিচে অবস্থান করছে। ফলে সমাজে তাদের সম্মানও কম দেওয়া হয়। অতীতে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা যতটুকু সম্মান পেত বর্তমানে তাও পাচ্ছে না।

www.pathagar.com

নাটোরের যে সকল স্থানে কাঁসা শিল্পীদের সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। দুই তিন ঘর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নিয়ে তাদের বর্তমান অবস্থান। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক অসংগতির জন্যে তাদের সিংহভাগ আজ ভারতে অভিভাসন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে তাদের গোষ্ঠীচেতনা ও গোত্রনির্ধারিত পেশার যথেষ্ট শিথিলতা লক্ষণীয়।

তথ্যসহায়ক

১. আবদুল সালাম, পিতা : সবির উদ্দীন প্রামাণিক, মাতা : সালেহা, বয়স : ৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ৩৬ বছর, গ্রাম: চকজোতদৈবকী, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর

২. সুবল চন্দ্র হালদার, পিতা : খোকারাম হালদার, মাতা : কিরণমালা হালদার, বয়স : ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ৫০ বছর, গ্রাম: চকজোতদৈবকী, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর

৩. মো: শামীম ইসলাম, পিতা : মো: নজরুল ইসলাম, বয়স : ২৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম শ্রেণি, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ১০ বছর, গ্রাম: চকজোতদৈবকী, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর

৪. মো. সুজন, পিতা : মৃত আবুল কালাম, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ৩৬ বছর, গ্রাম: চকজোতদৈবকী, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর

৫. মো. ফারুক প্রামাণিক, পিতা : মো: আওজার প্রামাণিক, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ৮ বছর, গ্রাম : চকজোতদৈবকী, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর

৬. আকবর আলী মণ্ডল, পিতা : ওমেজ উদ্দীন মণ্ডল, মাতা : রূপজান, জন্ম : ১৩৪৮ সালে (বাংলা সন), বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ৬০ বছর, গ্রাম: কলম, পোস্ট : কলম, থানা : সিংড়া

৭. শ্রী অবনীচন্দ্র হালদার, পিতা : খোকারাম হালদার, মাতা : কিরণমালা হালদার, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ৪০ বছর, গ্রাম : চকজোতদৈবকী, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর

৮. বীরেন সাহা, পিতা : বলাই চন্দ্র সাহা (মৃত), মাতা : অন্ন সাহা, বয়স : ৫৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এল.এল.বি, পেশা : উকিল ও মহাজনী ব্যবসা, গ্রাম : লালপুর, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর

৯. সেন্টু সরকার, পিতা : মো. মাজেদ আলী সরকার, মাতা : আনোয়ারা বেগম, বয়স : ৩৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : কাঁসারি, অভিজ্ঞতা : ২৮ বছর, গ্রাম: চকজোতদৈবকী (বুধপাড়া), পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

জীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অতীন্দ্রিয় রসের বৈচিত্রম্যয়তাই এ দেশের লোক সংগীতের মূলমন্ত্র। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক নানা অনুসঙ্গে লোকসংগীত অপরূপ শিল্পচাতুর্যে প্রাণময়। অঞ্চলভেদে ঋতুপ্রবাহে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বাউল গান, পল্লিগীতি ও জারি-সারির শত ধারা। নাটোর জেলা লোকসংগীতের এক সমৃদ্ধলোক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রেম, দ্রোহ, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সচেতনতাই এখানকার লোকসংগীতের মূলমন্ত্র।

১. বাউল গান

ক.
জগৎ শরৎ কল্পতরু
আমি তোমার দাসের দাস,
আমি বাংলার বাউল হব
এই ত শুধু মনের আশ॥ (২)
একতারা মোর জীবন সাথী
তাইতো সুরের মালা গাঁথি
দয়াল, খুঁজি তোমায় দিবস রাতি
দুঃখটিতে বারমাস॥
বাংলা মায়ের পথে পথে
ঘুরব সহজিয়া মতে
গান গাহিয়া আপন হতে
নিলাম অনুরাগের ফাঁস॥ (২)
খ্যাতি যশের নাই কামনা
নাই প্রয়োজন কাঞ্চন সোনা
ভক্তিধীন এই পাগল জনা
কার্তিক চায় না ফুলের বাস॥ (২)

খ.
বেলা গেলে ভবের খেলা
হবেরে মন ভঙ্গা
দুই দিনের এই দুনিয়াতে
করিনু কতই রঙ্গা॥ (মিছেই) (২)
করলি কত বেচাকেনা মনের দোকানদারি
শূন্য হাতে ফিরবিরে তুই একলা সবই ছাড়ি

www.pathagar.com

(হায়রে) দম ফুরালে হবে মাটি
তোরই সোনার অঙ্গা॥ (২)
কেবা আপন বন্ধু সুজন কেবারে তোর পর
শুদ্ধজ্ঞানে কার্তিক বলে তাহাই স্মরণ কর,
(ওরে) থাকতে সময় নে ভোলামন
মানুষ গুরুর সঙ্গা॥ (২)

গ.
তুই রঙ্গিলা কতই লীলা
করলি রে মন চোরা
খেললি নিঠুর মধুর খেলা
না দিলি তুই ধরা॥ (২)
এই অন্তরে প্রেমের অভাব
না শিখাইলি ভক্তি ও ভাব
মন মজনো নিত্য স্বভাব
সব ছলনায় ভরা॥ (২)
সংসারে আমায় আনিয়া
কাঁদাইলি অবলার হিয়া
তোর লাগিরা সব সঁপিয়া
হলাম জ্যান্তে মরা॥ (২)
তোরে পাব পাব বলে
বিফলে যায় জন্ম চলে
অজ্ঞার হইছে ব্যথায় জ্বলে
কার্তিকের কপাল পোড়া॥ (২)

ঘ.
কামের ঘাটে তিনটি রসের
তিনটি সরোবর বয়ে যায়
ক্ষ্যাপা তুই ডুববি যদি
সাধন জেলে আয়॥ (২)
মায়ার বশে হোসনে উতলা
শুদ্ধ জ্ঞানে করবি খেলা ওরে মন ভোলা
ভুল করলে পড়বি মারা
কাম কুমিরে যদি খায়॥ (২)
সাধু গুরুর প্রেম-পরশ নিলে
মহাযোগে অটল রূপে নিষ্ঠা শুধা মিলে
করন জেনে নিতে সেথায়
জীবন্তে মরিতে হয়॥ (২)

www.pathagar.com

ঙ.

ওরে ভোলা যায়রে বেলা
আন্দাজি হেলায় হেলায়
থাকতে সময় ভর্তি হ'তুই
গুরুর পাঠশালায়॥ (২)
ত্বরায় কর তুই শিক্ষা সাধন
কর না আগে ভাগে
গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রেখে
ভক্তি অনুরাগে
(তরে) কর্মদোষে সব হারালে
পস্তাবি তুই শেষ বেলায়॥ (২)
মায়ায় ভরা অসার ধরা
রকমারি সংসারে
লোভ লালসায় ডুবে থাকিস
বিষয় রত্নভারে
(ও তোর) ত্রিতাপ জ্বালা করেই দূরে
গুরুজি হলে সহায়॥ (২)

চ.

অধম বলিয়া দিও না ফেলিয়া
চরণে তোমার দিও মোরে ঠাঁই
চরণে তোমার দিও মোরে ঠাঁই (ও গুরুগো)॥ (২)
অসার ধরায় এসে, হায় কামনার বশে
পেলাম কী ভুলে মায়ার জালে
কী করিতে আসিলাম; কী আমি করিলাম
তুমি বিনে দয়াল আপন আর কেউ নাই॥ (২)
ভব নদীর পাড়ে, মন আমার কাঁপে ডরে
বসিয়া আছি তোমায় ভরসায়
যদি তুমি আমার হও আমারে সঙ্গে লও
মনের এই আকিঞ্চন তোমায় শুধু জানাই॥ (২)

ছ.

দেখিলাম কত পাগল
ভবের রং মেলায় (ভোলামন)
এক পাগলে পাগল করে
আর এক জনায়॥
বিষয় বিষে কেউবা পাগল হয়
প্রেমে পাগল হইয়া কেউ দুঃখ জ্বালা সয়
(কেহ) কাম কামিনীর পাগল হইয়া গো

www.pathagar.com

নিজের পুঁজি সব হারায়॥
ল্যাংটা পাগল টোধারী পাগল বাউল কেশী
লাভের এবং লোভের পাগল সংখ্যায় তারাই বেশি॥
অধর পাগল দেয়নারে ধরা
সেই পাগলে তালাশ করে কেউ জ্যান্তে মরা
(ভবে) কার্তিক উদাস বন্ধুর পাগল গো
প্রাণবন্ধু তর কোন জাগায়॥ (২)

জ.

ওগো নাই যার তারাই জানে
শ্যাম পিরিতির বেদনা
আমি অধম তাই জানিনা
ও তার প্রেমের সাধনা॥ (২)
এই পিরিতে ডুবল যারা
পিরিত কি ধন জানল তারা
আমি শুধু ভেবেই সারা
হটাও কামের সাধনা॥
ঐ পিরিতে মত্ত হলে
কঠিন শিলা ভাসে জলে
কু-বৃক্ষেতে সুফল ফলে
বল গো সাধু জনা॥ (২)
ঐ পিরিতের এমনি ধরণ
জ্যান্তে কারো হয়রে মরণ
কার্তিকের দিন যায় অকারণ
লয়ে বিষয় ভাবনা॥ (২)

ঝ.

ভবের বাহার রঙের বাহার
দোকান রকমারি
মোকাম চিনে সওদা কিনো
ওরে মন ব্যাপারি॥ (২)
নিত্য হেথায় বেচাকেনায় মত্ত সবাই অতি
কার করে কেউ লাভ করে আরও হয় বা কার ক্ষতি
কেউ পুঁজি ধন কর হানায়ে
হয়রে পথের ভিখারি॥ (২)
কী ধন লয়ে আইলাম ভবে
ভাবছ কিরে মন
বলছে কর্ম কিনতে হবে

www.pathagar.com

ভক্তি প্রেম-রতন॥ (২)
আছেন বসে মন-মহাজন হিসাব নিবেন পরে
দোকানদারি শেষ করিয়া ফিরব যখন ঘরে
আসল ছাড়া নকল কিনলে
হবেরে বিপদ ভারি॥ (২)

ঞ.
(আশার) টানতে ঘানি জীবন পানি
হইলরে এ সংসারে
(গুরু) তুমি বিনে মনের দুঃখ
জানাব কারে॥ (২)
মিছে মায়ার ভব সাগরে
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে সদায় পড়েছি ফাঁপরে
টাকা-কড়ি বিষয় চিন্তায়
ফেললো ফেরে আসবে॥ (২)
ছয়টি রিপু দেহের মাঝে
করছে কেবল তাড়া
কোন পথে যাই ভেবে না পাই
বড়ই দিশেহারা॥ (২)
গুরু তুমি ঘুচাও বেদনা
দেখাও প্রাণরাম সাধন পথের সঠিক ঠিকানা
কার্তিক উদাস তোমার দয়া
তা বিনে শুধু কারে জানে॥ (২)

ট.
কী চমৎকার কলের গাড়ি
চলছে তেল আর হাওয়াতে
পাকা ওস্তাদ পারে কেবল
সেই গাড়ি চালাতে॥ (২)
ড্রাইভার সাবের ধৈর্য বেশি ক্লান্তি বেশি নাই
রাতে দিনে চালায় গাড়ি সবাই জানি ভাই
হেলপার যারা ব্যস্ত তারা
ওস্তাদকে হেল্প করিতে॥ (২)
কেউবা চলে কুটুমবাড়ি মাসে দু একবার
ঢাকাইজীবি মানুষেরা ডেইলি প্যাসেন্জার
মাটির নাড় ছাইরা বড়ো
যায়রে বিপুল গাড়িতে
দক্ষ চালক চালায় গাড়ি লক্ষ্য চতুর্দিক
দেহগাড়ি পাংচার হলে চলবে না আর ঠিক

www.pathagar.com

টায়ার টিউব ঠিক করসো ভাই
ভাইবো সময় থাকিতে॥ (২)

ঠ.

রাখো মানুষে ভক্তি
হবে জীবনে মুক্তি
পাবে তুমি শক্তি অন্তরে॥ (২)
মানুষের মাঝে সে করে বিচরণ
জন্য গুরু কল্পতরু প্রভু নিরঞ্জন
মানষ গুরুর সঙ্গে, মিলে অন্তরঙ্গে
প্রেম যমুনার তরঙ্গে ভাসো রে॥ (২)
মানুষের প্রতিমা মানুষেই গড়ে
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু এ চরাচরে
চিনে মানুষ রতন
ধরো তাহার শ্রীচরণ
শান্তি সুধা মিলবে সংসারে॥ (২)

ড.

মন তুই করিস মিছেই অহংকার
এই দুনিয়ায়
করিস মিছেই অহংকার॥ (২)
বাড়ি গাড়ি টাকা-কড়ি বিষয়-মালামাল
মানুষ রয়নাকো চিরকাল
কী চমৎকার পরিপাটি
মানব দেহ হয়েও মাটি
ভেবে দেখ্না কে কাহার॥ (২)
সত্য পথে চলরে মনা মিথ্যে গৌরব ছেড়ে
ভক্তি প্রেমের বশে আপন কর না মানুষেরে
তাই উদাস কার্তিক বলে
সু-স্মৃতি রয় অতলে
অনিত্য মায়া-ই-সংসার॥ (২)

ঢ.

(তোর) ইঞ্জিনে জং ধরেছে
কখন বন্ধ হয় গাড়ি
ক্ষ্যাপা চলরে এবার
আপন বাড়ি॥ (২)
হাট-বাজারে ঘুরলিরে ক্ষ্যাপা করলিরে বেচাকেনা
মহাজনে ছাড়বেনা তো হয় যদি গো দেনা

www.pathagar.com

ঠেকলে পরে দেনার দায়ে
রক্ষা পাবি কি উপায়ে
পাছে তোমার বিপদ ভারী
ভাবোরে মন বেপারি॥ (২)
রঙ্গারসের এই জীবনে নাইরে কামনার শেষ
মায়ার বাঁধন ছিড়ে ক্ষ্যপা চিনে নে আপন দেশ,
শিশুকালের ধূলি-খেলা
দয়াল বিনে আমি একা
নয়তো কেহই আমারি॥ (২)

ণ.

যোগ বিয়োগে অংক কষে
কিবা পেলে সংসারে
মন চলো যাই এবার গুরু
প্রেম বাজারে॥ (২)
অমূল্য ধন সওদা কত
বিজয় সেথা অবিরত
যে হয় গুরুর অনুগত
সে জন-ই কিনতে পারে॥ (২)
প্রেম বাজারে সাধন বৃক্ষে
ফলে মধুর ফল
গুরু দিলে তবেই শিষ্য
খেয়ে হয় অটল॥ (২)
নিষ্ঠা ভজন ভক্তি ভাবে
ত্রিতাপ জ্বালা তাতেই কমে
(উদাম) কার্তিক কানা কুম্ভাভাবে
কাঁদে যে পথের ধারে॥ (২)

ত.

সংসার জ্বালায় অজ্ঞা কালা
সাধ মিটেনা ভবে
জনম ভরে মিথ্যে আশায়
টানছি ঘানি সবে॥ (২)
একটি জ্বালা দূর হলে হায় আরেকটি যে আসে
মনের কথা বলব খুলে কারে কোন বিশ্বাসে,
ধুলো খেলায় গেল বেলা
সুখ হবে আর কবে॥ (২)
স্ত্রী-পরিজন পুত্র-কন্যার

www.pathagar.com

কতই যে মমতা
টাকা কড়ি না থাকলে কয়
তারাই কটু কথা॥ (২)
আত্মার আত্মীয় বলে ভাবি তা কোন্ জনে
ভূতের বোঝা বইতে গিয়ে কী পেলাম জীবনে
কার্তিকের প্রাণ ছাড়লে দেহ
সব জ্বালা শেষ হবে॥ (২)

থ.

গুরু যাহার হয়গো সহায়
তার মরণের ভয় কিসে
অমৃত রস মিলতে পারে
কাল ভুজঙ্গা বিষে॥ (২)
গুরুর ধ্যান করিলে পরম চেনা যায়
ভব-জ্বালা ত্রিতাপ তখন অনাসে পালায়
মহতেরা বলছে থাকো
সদাই গুরুর সঙ্গে মিশে॥ (২)
গুরু প্রেমে হয় উদাসী শিষ্য রসিক যে জন
অকূল পাথার দেয় যে পাড়ি এক তরিতে দুজন
সহজ মানুষ সহজ গুরু দয়াল আমার প্রভু
এই অধীনের প্রতি বিরাগ হইও নাকো কভু
তুমি বিনা কেবা দিবে
কার্তিকের পথের দিশে॥ (২)

দ.

অধম বলে তাইতে ক্যানে
আমারে কাঁদাও
পাস করায়ে দাওরে গুরু দয়াল
পাস করাইয়া দাও॥ (২)
ফেল করিলে এই জীবনে
(তোমার) কলঙ্ক হবেই ভুবনে
স্বর্গ নরক কি প্রয়োজন
আমারে জানাও॥ (২)
ঐ চরণের ধূলি হবো
(আমি) তোমার অঙ্গে মিশে রবো
প্রেমের টানে আইলাম কাছে
দূরে না সরাও॥ (২)
সাধন ভজন নাই আমাতে

www.pathagar.com

(ওরে) প্রেম কি হবে তোমার সাথে
কার্তিক জানা পথ চিনেনা
নিতাই গন্‌জো চিনাও॥ (২)

ধ.

প্রেম করা তো নয়রে সোজা
শোন বলি পাগল মনা
প্রেমের মধু জানে হায়রে
কেবল প্রেমিক জনা॥ (২)
প্রেমের চলন বাঁকা পথে
প্রেম নারে করবি ক্ষ্যাপা ক্যামনে কি মতে
মড়ার যদি করবি পিরিত
ভুলিয়া সুখ বাসনা॥ (২)
প্রেম করিলে নিরজনে
মনের মানুষটারে ভাবে অতি সঙ্গোপনে
কইতে জ্বালা সইতে জ্বালা
হায় নিদারুন যন্ত্রনা॥ (২)
বৈদেশিয়ার সঙ্গে আমি
এ জীবনে কইরা পিরিত কান্দি দিবসযামী
হায় কি পাবো তাঁর দরশন
কার্তিকের সেই ভাবনা॥ (২)

ন.

গুরু আমার কল্পতরু
সোনার মানুষ বটে
সদায় বিরাজ করে প্রভু
আমার হৃদয় পটে॥ (২)
গুরু আমার পতিতপাবন মহৎ মানুষ তিনি
দূর করে গো ত্রিতাপ জ্বালা নিজ কৃপাতে যিনি
ভব পারের কাণ্ডারি মোর
নিদানে ঘোর সংকটে॥ (২)
গুরু আমার জ্ঞানের কাণ্ড অন্ধ নয়ন পাতে
প্রেমের ঠাকুর প্রেমের কথা বলে আমার সাথে
তারে ছাড়া কখন জানি
কি সর্বনাশ ঘটে॥ (২)
গুরু আমার বরণডালা আমার নয়নধারা
সেই ধারাতে ধুয়ে মুছে বদলাইলো চেহারা
গুরু ছাড়া আর কাউকে
ভজিও না কেউ মোটে॥ (২)

www.pathagar.com

প.

ইরাবতী নদীতে নাও বাইও
ও নাগরী
পিঙ্গাল যমুনায় তরি বাইও॥ (২)
সুষমা নদীতে সাধু দিও সাঁতার ডুব
ত্রিধারাতেই মিলবে তোমার আপনার স্বরূপ
বেচক-পূরক কুম্ভক করো
গুরু বাক্য ধরি॥ ও নাগরী (২)
ইরাবতীর জলে যদি হেরবি চাঁদ-মুরতি
দমের করুণ করে রসের যোগেতে স্থিতি
রসিক জনের সঙ্গে তুমি
নির্ভয়ে দাও পাড়ি॥ (২)
তিনটি ধারা এক করিলে হবেই সুধা বারি
জীব-পরমের সব ব্যবধান ঘোঁচবে তাড়াতাড়ি
ডক্টর হাসান গুরুর চরণ বিনে
কার্তিক ডুবে মরি॥ ও নাগরী (২)

ফ.

কাঙালের অদিনে গুরু তোমার বিনে
কেবা আর আছে দয়াল
পারের কাণ্ডারি॥ (২)
এ ভবের দরিয়ায় না দেখি হায় উপায়
কেমনে উদ্ধারিব ভেবে মরি
অমূলে ব্যাকুল হয়ে
আছি গো ভয়ে ভয়ে
দয়া করিয়া লও মোরে উদ্ধারি॥ (২)
সংসারে মোর মায়ায় শিকলেতে বান্ধা হায়
অভাবে স্বভাব নষ্ট বলো কি করি
চাওয়া পাওয়ার বাসনা
মনের ভ্রম গেল না
'সভ্য' সাজিয়া হইলাম সখে সংসারী॥ (২)
আমার গুরু হও দয়াল দূর করো মনের জঞ্জাল
ভাব-ভক্তি দাও অন্তরে কৃপা করিয়া
কার্তিক উদাস তাইতে
অভয় চরণ পাইতে কাতরে ঝরাইলো দুই নয়নের বারি॥ (২)

ব.

রাখো মানুষে ভক্তি
হবে জীবনে মুক্তি

www.pathagar.com

পাবে তুমি শক্তি অন্তরে॥ (২)
মানুষের মাঝে যে করে বিচরণ
জগৎ গুরু কল্পতরু প্রভু নিরঞ্জন
মানুষ সবার সঙ্গে
মিশো অন্তরঙ্গে
প্রেম তরঙ্গে ভাসো সাগরে॥ (২)
মানুষের প্রতিমা মানুষেই গড়ে
বিশ্বাসে মিলে বস্তু এ ধরাচরে
চিনে মানুষ রতন
ধরো তাঁর শ্রীচরন
শরণ নিলে মরণ যাবে রে॥ (২)
মানব সেবার চেয়ে নাই কোনো ধর্ম
গোবিন্দ কয় কর কার্তিক মানুষের কর্ম
যাওরে নিতাই পুরে
ত্রিতাপ তবেই যাবে দুরে
ভয় কিসে আর ঘোর নিদানে রে॥ (২)

ভ.
দয়াল গুরু আমার বলোনা
প্রেমের-ই সাধনা
সদাই চিত্ত কামে মত্ত
বোঝালে বুঝ মানেনা॥ (২)
প্রেমের নাই কুল-কিনারা
এই কথা সকলের জানা
প্রেম তরঙ্গ পাড়ি দিতে
চাই ষোল আনা
যাই কেমনে প্রেম নগরে
হায় বোকা মদন কানা॥ (২)
ছিল ধনরত্ন মালামাল
মোকাম করিয়া বেসামাল
এখন দেখি চৌদ্দ আনাই
হইয়াছে পয়মাল
কাম-কুমিরের অত্যাচারে
আছে বাকি দুই আনারে॥ (২)
(ডক্টর) হাসান তুমি প্রেমের মহাজন
বোঝ কাতরের আকিঞ্চন
কার্তিক অহংকার কোরে করে প্রেমেতেই দাহন
এবার গেলে আর কি হবে রে?
তাই ভাবি সেই ভাবনা॥ (২)

www.pathagar.com

ম.

দেহের মাঝে বিরাজ করে
প্রভু নিরঞ্জন
নিত্য ক্ষ্যাপা ভক্তি ভাবে
কর তার যতন॥ (২)
কাঁচা বাঁশের খাঁচা দেহ হায়রে মাটির ঘরা
তার উপরে মোড়ক আঁটা চালে ছাউনি করা
জ্ঞান বিবেকের আজ্ঞাকারী
চালায় তারে মন॥ (২)
ষোল জনায় টানছে ক্ষ্যাপা সদায় দেহগাড়ি
অচিন পাখি কখন জানি পালায় খাঁচা ছাড়ি
গুরুর প্রেমে পুড়লে দেহ হয় যে পাকা খাঁটি
মহতেরা বলে তাকে ছোঁয় না আগুন মাটি॥ (২)
কার্তিকের এই দেহ পচা
ভ্রান্ত চাল-চলন॥ (২)

য.

হবি যদিরে প্রেমিক, মানুষ চিনেকগা সঠিক
মানুষের মাঝেই পাবি খুঁজে প্রেম-রতন
(হায়রে) মানুষ ছাড়া কি হবে
প্রেমের-ই সাধন॥ (২)
প্রেমের-ই ঠাকুর মানুষ মহাজন
শিব আর শক্তি রাধা জনার্দন
হইলে প্রকৃতি মিলবে আকৃতি
চৈতন্য জেনে কর তুই মানুষের যতন॥ (২)
রসের-ই কারণ জানিয়া আগে
ডুববি ক্ষ্যাপা তুই অনুরাগে
কাম আর কামিনী নিত্য হয় সঙ্গিনী
রতি উর্ধ্বগতির হয়নারে মরণ॥ (২)
নয়নে নয়নে দামিনী সুধা
অন্তরে জাগিবে প্রেমেরই ক্ষুধা
মিলনে দুই ছিনা রসিক তো যায় চিনা
কামে জন্মিয়া কার্তিক কামেই অচেতন॥ (২)

র.

পাগল মন গেলরে
মিছেই মায়া ঘুমে মানব জনম গেলরে
বদ্ধ জীবের করন মেনে
পুঁজি কি ফুরালো রে॥ মায়া ঘুমে ....(২)

www.pathagar.com

ভাব ছাড়া হায় লাভ হবে কি সুফি সাধুর রচনা
চৈতন্যজ্ঞান অনুরাগ আর ভাবের উদয় হলো না
হেলায় গেল সকাল দুপুর
বেলা পড়ে এলো রে॥ মায়া ঘুমে .....(২)
মানুষ গুরুর প্রেমাগুনে পুড়তো যদি পাগলমন
মাটির গড়া কাঁচা দেহ হইতো পাকা লাল বরন
জল মানেনা মাটির ভাণ্ডে
কাঁচা তাই গলিল রে॥ মায়া ঘুমে .....(২)
ধান্দাবাজির আন্দাজিতে সাধন কিরে আর হবে
কার্তিক বোকা চিনলোনা তাই অভয় চরণ এই ভবে
(ডক্টর) হাসান এবার কৃপা করে
উপায় একটা বলো রে॥ মায়া ঘুমে.....(২)

২. পল্লিগীতি

ক.

মান কইরো না রূপের মাইয়্যা
কইরোনা মন ভারি
সোহাগ দিমু কিইন্যা দিমু
ময়নামতির শাড়ি॥ (২)
নাইবা থাকুক অঙ্গে তোমার গয়না দামি দামি
রঙিন ফিতা কাঁচের চুড়ি আইন্যা দিমু আমি,
পাড়ার লোকে দখবো চাইয়্যা
নজর নিবা কাড়ি॥ (২)
কাষ্ঠে লোহায় ভাব করিয়া নৌকা যেমন গড়ে
পিরিতেরও ঘর বানামু আমরা তেমন করে,
দোহাই কভু ভুল বুঝিয়া
যাইও নাকো ছাড়ি॥ (২)

খ.

তোমার মাথায় কত চুল
তুমি রূপের গোলাপ ফুল
কন্যা, চুল পরিমান ভালোবাসা
দ্যাহ না আমারে॥ (২)
কাজল আঁখি টানা টানা মায়াভরা হাসি
রূপের যাদু মন কাইরাছে তাইতো কাছে আসি
তোমার গালে ছোটো তিল

www.pathagar.com

তোমার মুখটি অনাবিল
তোমায় তিলেকদণ্ড না দেখিলে
এ মন যে কেমন করে॥ (২)
দিবানিশি হৃদয় আকুল হয় যে তোমার লাগি
কখন জানি হইছি তোমার প্রেমের অনুরাগী
তোমার কপালে লালটিপ
তুমি রূপেরই প্রদীপ
তুমি প্রেমের আগুন দ্যাওনা জ্বেলে
আমার-ই অন্তরে॥ (২)

গ.

পিরিতে মজিয়া জনম যায় কান্দিয়া
কাটে না এখন যে দিন রজনি
আর কি হবে দেখা সজনি॥ (কখনো) (২)
তোমার মুখের মিষ্টি কথায় আমার পরান কাড়িয়া
দিনে দিনে মায়ার জালে আমারে জরাইলা
মোর হাতটি ধরিয়া
কইছো শপথ করিয়া
হইবা তুমি আমার চির সঙ্গিনী॥ (২)
ভেঙে গেল সুকের স্বপ্ন কালবৈশাখি ঝড়ে
কার্তিক উদাস তোমার লাগি কাঁদবে চিরতরে
বুকে চিতার আগুন লইয়া
আছি জ্যান্তে মরা হইয়া
তুমি কি ভুলেছ, আমি ভুলি নি॥ (২)

ঘ.

মনের ময়না কয় না কথা
সয়না প্রাণে আর
ভালোবাসার মালা গাঁথা
হইলোনা আমার॥ (হায়রে) (২)
বাটি ভইরা খাবার দিলাম
দিলাম আদর কতো
তবু সেতো পাষাণ বড়োই
হয়না অনুগত,
তার লাগিয়া পরান পুড়ে
শুধুই করে পর॥ (২)
হায় পিরিতের এমন রীতি
বুঝি নাই তো আগে
মন উদাসী হইলো আমার তারই অনুরাগে

www.pathagar.com

নিষ্ঠুরিয়ার মন পাইলাম না
পাইলাম কাঁটার হার॥ (২)

ঙ.
(আমার) শুইলে না ঘুম আসে রাইতে
লো ষোড়শী
মনে চায় কাছে তোমায় পাইতে, লো ষোড়শী
আমি তোমার দিওয়ানা॥ (২)
আমার বাড়ির সামনে দিয়া
যাও যে হেলিয়া দুলিয়া
রুপের মাধুরী মেরে হৃদয়টি আকুল করে
সোনার বরনী হরিণ নয়ন॥ (২)
গোপনে তোমাকে এই মন দিয়েছি
জানে না তাহা কেহ রে
বুকে যৌবনের জ্বালা, পরান করে উতলা
কাঁচা মনে সেই ব্যাথা সহেনা রে॥ (২)
যদি না পাই কাছে আপন করিয়া
জীয়ন্তে যাবো যে মরিয়া
হইবা আমার কথা দাও কার্তিকের প্রাণ বাঁচাতে
পূর্ণ করো প্রেমের সাধনা॥ (২)

চ.
মনের দুঃখ জানাই কারে
শুনেবা কোন জন
স্বজন বিনে এই জীবনে
বাঁচাই অকারণ॥ (২)
নাইরে বন্ধু বিষাদ সিন্ধু বুকের হাহাকার
রইল শুধু গোপন ব্যাথা নিত্য নিরাশার
তাইতো জ্বালা পাইলে বন্ধু
মনের-ই মতোন॥ (২)
কপাল মন্দ নাই আনন্দ
হারায়েছি সব
তাইতো এখন এই পরানে কষ্টের অনুভব
পাইতাম যদি মোর দরদি
করিতাম আপন॥ (২)

ছ.
পাইলাম নারে তোমায় সখি
আমার এ জীবনে

www.pathagar.com

প্রেমের নামে ছল করিবে
ভাবিনাইতো মনে॥ (২)
সুখে দুখে থাকিবো মোরা এইতো ছিল আশা
কোন পরানে ভুইলা গেলা আমার ভালোবাসা
দিন রজনী হায় বিরহ
সইবো কেমনে॥ (২)
থাকো সখি সুখে থাকো নাইবা আমায় ভাবো
দুঃখ ভরা স্মৃতি লয়েই জীবন টি কাটাবো
খবর পাইলে আইসো তুমি
আমারি মরণে॥ (২)

জ.

আমার শুইলে না ঘুম আসে রাইতে প্রাণও বন্ধুরে
মনে চায় কাছে তোমায় পাইতে প্রাণ বন্ধুরে
আমি তোমার দিওয়ান॥ (২)
আমার বাড়ি তোমার বাড়ি
মধ্যে ভরা নদীরে
কেমনে ও পার যাই, বলো বন্ধু বলো তাই
নিদয়া হইওনা হইওনা॥ (২)
গোপনে তোমাকে এ মন দিয়েছি
জানেনা তাহা কেহরে
একে মুই অবলা,তাতে সংসারে জ্বালা
কাঁচা মনে ব্যাথা সহেনা॥ (২)
যদি না হও তুমি আমারি সুজন
বিফলে সাধের জনম যাবে গো
(তুমি) হইবা আমার কথা দাও, কার্তিকের প্রাণ বাঁচাও
পূর্ণ করো জীবন সাধনা॥ (২)

ঝ.

তোমার প্রেমে মরতে পারি
তুমি আমার হও যদি
(দয়াল) তুমি বিনে কেবা আছে
দুখের দরদি॥ (২)
জনম বুঝি বৃথাই গেল লয়ে বেদনা
এই অধীনের মনের ব্যথা কেউতো বোঝে না
না শুনিলেও আমার দুঃখ
বলবো নিরবধি॥ (২)
সব নিরাশায় আশা তুমি তবু বারে বার

www.pathagar.com

পাইযে ফিরে স্বপ্ন ভাঙ্গার দারুন হাহাকার
দুই নয়নের লোনা জলে
বইলো যে এক নদী॥ (২)

ঞ.

সবাই চলে যাব বন্ধু
কেউতো রবে না
ক্ষণিকের এই চেনাজানা
ভালোবাসার বেদনা॥ (২)
মায়ার বাঁধনে গড়া এই সংসারে
কে কাহারা বেঁধে বলো রাখিতে পারে
মাতা পিতা ভাইবোন
আত্মীয় পরিজন
ছাড়িতে হবেরে আপনজনা॥ (২)
কত রয় চাওয়া পাওয়া ভুল বোঝাবুঝি
দু দিনের খেলাঘরে ভোগেতে সুখ খুঁজি
ডুবিলে ভবের বেলা
ফুরাবে ধূলি-খেলা
তবুও কেন মোর জ্ঞান হলোনা॥ (২)

ট.

(তুমি) কি জাদু করিয়া
নিলা পরান কাড়িয়া
ঘরে থাকা দায় গো সখি তোমায় ছাড়িয়া
ক্যামনে থাকি তোমায় না দেখিয়া॥ (২)
কী মায়াতে হায় হারালাম নিজেই জানিনা
তোমারে না দেখলে কেন রইতে পারি না
আমি তোমারি হইব
তুমি আমারি হইও
স্বপন দেখি তাই তোমারে লইয়া॥ (২)
ভালোবাসা হয় যদিগো আমার আপরাধ
আঘাতে বুঝাইয়া দিও যন্ত্রণার-ই স্বাদ
আমি লইয়া যন্ত্রণা
করব তোমার সাধনা
চাতক যেমন থাকে বৃষ্টি চাইয়া॥ (২)

ঠ.

ভুলিব ভুলিব তোমায়
ভাবি মনে যত

www.pathagar.com

পারিনা ভুলিতে হায়
কান্দে হিয়া তত॥ (২)
মায়াতে মজিয়া আমি ভাবিনি সেই কালে
সখিরও পিরিতের জ্বালা জুটিবে কপালে
(এখন) বিরহ অনলে অন্তর
পুড়ায় অবিরত॥ (২)
সরল প্রাণে দাগা দিলা হায়রে কি কারণে
মনের উত্তাপ খুব গোপনে বাড়ে নিরজনে
(আমি) বিধির কাছে বিচার দিলাম
এই জনমের মতো॥ (২)

ড.

প্রেম-রসিকা না হইলে কেউ
প্রেমের সুধা পায় না
বেরসিকের ভাগ্যে জুটে
গরল যন্ত্রণা (শুধু)॥ (২)
লাভের আশায় করলে পিরিত হারাতে হয় মূল
ভেদ বিচারে প্রেমের মানে কেউবা করে ভুল
মনের মানুষ ধরতে গিয়ে
কেউবা হারায় ঠিকানা॥ (২)
অকুল পাথার দেয় পাড়ি কেউ প্রেমের তরি বেয়ে
শুকনা গাঙে কেউবা মরে পায়ে হেঁটে খেয়ে
ত্যাগ ভুলিয়া ভোগ-বাসনা
নয়তো প্রেমের সাধনা॥ (২)

ঢ.

ও দরদি কিসে তোমায়
পাই গো বলোনা
(আমি) ভেবে ভেবে আকুল ব্যাকুল
মন যে মানে না॥ (২)
পিরিত করে এখন কাঁদি
কোন মায়াতে তোমায় বাঁধি
নির্জনে তাই বসে ভাবি
বুকে নিয়ে বেদনা॥ (২)
কি ধন আমার দেবার আছে
যাতে তোমায় পাবো কাছে
কী ফুলেতে গাঁথবো মালা
কিবা দিব গহনা॥ (২)

www.pathagar.com

তোমার রূপে হায় মজিয়া
দিন রজনি যায় বহিয়া
আমার হয়ে আসবে কাছে
এইতো শুধুই বাসনা॥ (২)

ণ.
ভালোবাসা চায় সকলে
ভালোবাসে কয়জনা কয়জনা
সুখের আশা বেশি ভালো না॥
প্রেম কথাটা অতি ছোটো
কে জানে তার মূল্য কত গো
সেই প্রেম করিতে মন দিতে হয়
না দিলে প্রেম জমে না জমে না॥
আমি পাইনি খুঁজে এই জগতে
প্রেম করিবো কাহার সাথে গো
সবাই শুধু চায় যে পেতে গো
দিতে চাহে কয়জনা কয়জনা॥
আমি সুখের আশা আর করি না
শুধু করি দুঃখের লেনা-দেনা গো
আমার এই দিনে হলো জানা
সুখ সকলের সহেনা সহেনা॥

৩. জারিগান

নাটোরের প্রখ্যাত লোকসংগীত স্রষ্টা কার্তিক উদাস বাউলগান, পালাগানের পাশাপাশি বিভিন্ন দিবস ও ঐতিহাসিক বস্তু কেন্দ্র করে জারিগান রচনা করে থাকেন। জনমানুষের কথায় সুর দিয়ে তিনি এই জারিগুলি রচনা করেন। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত নিয়ে তিনি তাঁর মতো করে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন নিরন্তর। গ্রাম্য জনতার পাশাপাশি শহুরে সমাজের মানুষ নিয়ে আয়োজিত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানেও তিনি তাঁর রচিত বিভিন্ন জারিগান পরিবেশন করেন। কার্তিক উদাস রচিত বিষয় ও দিন ভিত্তিক কিছু জারি গান এখানে উল্লেখ করা হলো :

ক.
চলনবিলের জারি
বাংলাদেশের মানুষ মোরা
বাংলা হয় ঠিকানা
ঐতিহাসিক নাটোর জেলার
নামটি সবার জানা॥
এই নাটোরের চলনবিলের
সুনাম যথা তথা

www.pathagar.com

গানের মাঝে বলবো মোরা
তাহার কিছু কথা॥
চলন বিলের খ্যাতি সবার
মুখে মুখে শুনি
জন্মে ছিলেন হেথায় কত
জ্ঞানী আর গুণী॥
শোনো শোনো দেশবাসী
সবারে জানাই
চলন বিলের মতো এমন
বিলতো কোথাও নাই॥
চলনবিলে মাছ লইয়া ভাই
কতোই যে কাহিনি
গানের সুরে গল্প-গাঁথায়
লোক মুখেতে শুনি॥
চিতল বোয়াল শিং মাগুরের
বিশাল এক ভাণ্ডার
কই মাছের ভাজি খাইতে
মনে চায় বারবার॥
চলন বিল যাদুঘর ভাই
আছে খুবজিপুরে
ঐতিহ্যময় পুরানকীর্তি
দেখবেন ঘুরে ঘুরে॥
চলন বিলের শীতল হাওয়া
প্রাণ জুড়াবে বেশ
পাখ-পাখালির সারিরা
যায়যে নিরুদ্দেশ॥
তিশিখালী গ্রামে মাজার
ঘাসীপির দেওয়ান
সুফি সাধনাতে তিনি
ছিলেন যে মহান॥
কত শত গৌরব গাঁথা
এই নাটোর-কে লয়ে
এই শহরের পাশ দিয়ে
নারদ গেছে বয়ে॥
উত্তরা গণভবনটা
বড়োই যে সুন্দর!
দেখেন যদি একবার আসি
ভরিবে অন্তর॥

www.pathagar.com

কাঁচা গোল্লা মিষ্টি স্বাদের
মণ্ডা আর মিঠাই
গুণে মানে আছে খ্যাতি
যার তুলনা নাই॥
রানিভবানী স্বরেতে
যখন কেহ যাবে
কী সে শোভা মনোলোভা!
মনটা কেড়ে নিবে॥
বনলতার দেশে আইসো
জানাই আমন্ত্রণ
দু-দণ্ড শান্তি পাবে
সুস্থ হবেই মন॥
বনলতার দেশটি মোদের
নারদ নদীর তীরে
জীবনানন্দ লেখেন কাব্য
তাই তো তাকে ঘিরে॥
এই পর্যন্ত আমরা এবার
জারি করলাম শেষ
ফুল-ফসলে ভরে উঠুক
সোনার বাংলা দেশ॥

খ.

আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস স্মরণে জারি

পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে আমি জারি করলাম শুরু
সালাম জানাই দর্শক শ্রোতা সালাম শিক্ষাগুরু ।
শোনেন শোনেন জ্ঞানীগুণী নিরক্ষর ভাইবোন
শিক্ষার জারি করব শুরু শোনেন দিয়া মন॥
বিশ্বের বুকে সোনার বাংলা একটি সবুজ দেশ
কী সে শোভা মনোলোভা, রূপের নাইকো শেষ ।
অধিকাংশ দেশের মানুষ আজ নিরক্ষর
শিক্ষার আলো জ্বালতে হবে গ্রাম গ্রামান্তর॥
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা জ্বালায় আলো
মূর্খ হয়ে এই দুনিয়ার বেঁচে কি লাভ বলো ।
বাঁচার মতো বাঁচতে হলে শিক্ষার আলো চাই
বিদ্যা-শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি যে নাই॥
সবার জন্য বিদ্যা শিক্ষার তাইতো প্রয়োজন
সেই কথাটি বলছি আমি শোনেন দিয়া মন
বিদ্যা-শিক্ষা অমূল্যধন মনে রাখা চাই
সব শিশুকেই বিদ্যালয়ে যাইতে হবে ভাই॥

www.pathagar.com

সার্বজনীন শিক্ষার তরে প্রাইমারি ইস্কুলে
শিশুকে পাঠাইতে যেন না যান কেহ ভুলে
প্রাথমিক শিক্ষা ভাইরে বাধ্যতামূলক
সবার চেষ্টায় এই আন্দোলন হোক না সফল হোক॥
ছয় বছরের শিশু হইলে আর তো কথা নাই
বাড়ির কাছে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা চাই
ছয় হইতে দশ বছরের যত শিশু আছে
যাইতে হবে বিদ্যালয়ে আইন করিয়াছে॥
বন্ধ করো শিশুশ্রম ভাই শিখাও লেখাপড়া
শিশুরাই গড়বে একদিন সুন্দর বসুন্ধরা
আছেন যত বৃদ্ধ যুবা চাচা খালা মাসি
এসো সবাই স্বাক্ষর হয়ে দেশকে ভালোবাসি॥
টিপসই আর কেউ দিব না লিখব নিজের নাম
স্বাক্ষর হলে দেশ ও জাতির বাড়িবে সুনাম
না জানিলে লেখাপড়া ঠকতে হবে পাছে
বিদ্যা-শিক্ষা জানলে তাহার বড়োই যে দাম আছে॥
নিরক্ষর আর কেউ রবোনা আমরা সব বাঙালি
আসেন সবাই স্বাক্ষর হয়ে শিক্ষার আলো জ্বালি
এই বলিয়া কার্তিক বাউল জারি করলো শেষ
শিক্ষার আলোর ভরে উঠু সোনার বাংলাদেশ॥

গ.

মাদক বিরোধী জারি

মরণ নেশায় সাধের জীবন
নষ্ট কেহ কইরো না
নেশা কইরা ধ্বংস হইয়োনা॥ ও ভাই...
সুন্দর এ ধরনী বুকে
সবাই মোরা বাঁচবো সুখে
সুস্থজীবন গড়বো আপন সাধনায়
মাদকে আসক্ত যারা
বিপথগামী হয় তাহারা
হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা॥
নেশা কইরা ধ্বংস হইয়ো না...
নেশার টাকা জোগাড় করতে
অনেকে যায়রে কুপথে
অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে তাতে
মাদকের মূল ঘাটিগুলো

www.pathagar.com

সবাই মিলে উপড়ে ফেলো
জাগিয়ে মনে চেতনা॥
নেশার কবলে পইরোনা...

ঘ.
দুর্নীতি বিরোধী জারি

করো যারা দুর্নীতি ভাই
কথা শোনেনা (তাহারা)
নিষেধ মানে না॥
চতুর তারা কৌশলে পাকা
সৎ মানুষের আবরণে চেহারা ঢাকা
যে ভাবে হোক কামাও টাকা
এমন ভাবখানা॥ (তাহারা)
(আমি) ঘুরে দেখলাম অফিস আদালত
ঘুষের টাকায় আছে নাকি খুব বেশি বরকত
তাই টাকা বিনে হয় মসিবত
ফাইল নড়ে না॥ (তাহারা)
সৎ সাহসের দরকার আছে ভাই
(এসো) সবাই মিলে দুর্নীতিকে নিন্দা জানাই
টিআইবি যে বলে সদাই
দুর্নীতি করো না॥ (তাহারা)

ঙ.
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জারি

স্রষ্টার নামটি স্মরণ করে জারি করলাম শুরু
সালাম জানাই জ্ঞানী গুণী আর শিক্ষাগুরু
সালাম জানাই যত শহিদ আরও দেশের জনগণ
মহান বিজয় দিবসের জারি করব নিবেদন॥
মুক্ত মোদের স্বদেশ সোনার বাংলা
আমরা যে আজ মুক্ত স্বাধীন
নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে
তাই পেয়েছি বিজয়ের দিন॥

বিদেশিরা শাসন শোষন
করত তারা ইচ্ছা মতন
অকারণে হায় নিপীড়ন (২)
করিতো যে রাত্রি ও দিন॥

সোনার বাংলার সোনার ফসল
লুট করিত লুটেরার দল

www.pathagar.com

রাখত নাকো কোনই সম্বল (২)
নিষ্ঠুর শুকুর দয়াহীন॥

বললে কথা করত দোষী
শাস্তি দিত আরো বেশি
অত্যাচারী হায় বিদেশি
হৃদয় তাদের বড়োই কঠিন॥

পশ্চিমা ঐ শাষকেরা
অন্তর তাদের হিংসা ভরা
ক্ষমতালোভী ছিল ওরা
বুঝল দেশের জনগণ॥

বাংলা বাসী দুঃখে কাঁদে
হায়রে বিনা অপরাধে
অবশেষে প্রতিবাদে
হইল সবে শংকাবিহীন॥

করল মিছিল জনসভা
ফুটল বুলেট ফাটল বোমা
যত ক্ষোভ আছিল জমা
করিল প্রকাশ দ্বিধাহীন॥

মানব নাকো অধীনতা
দিতেই হবে স্বাধীনতা
সবার মুখে একই কথা
সংগ্রামে তাই সজ্জিান॥

বাঙালিদের কণ্ঠ রূদ্ধ
করবে বলে, করল যুদ্ধ
হইয়া তারা ভীষণ ক্ষুদ্ধ
মারে নিরস্ত্র সাধারণ॥

পঁচিশ তারিখ মার্চ মাসে
কালো রাত্রি ইতিহাসে
সোনার বাংলা রক্তে ভাসে
পদ্মা মেঘনা হয় যে রঙিন॥

বাঙালিরা ঘরে ঘরে
জীবন মরণ লড়াই করে

www.pathagar.com

অবশেষে নয়মাস পরে
আসে যে তাই বিয়ের দিন॥

উনিশ শত একাত্তরে সেদিন ষোলই ডিসেম্বরে
যোদ্ধারা ফিরে উঁচু করে
উড়ায় যে বিজয়ের কেতন॥

চ.

হয়রত মোহাম্মদ (স.) কে নিয়ে জারি

আওয়াল আখেরে নবি নবি জাহের বাতেনে
দ্বীনের পথে চলব মোরা নবিজীকে চিনে
মধুমাখা ঐ না মুখেতে কতই যাদুভরা
আকুল হইল সৃষ্টি সকল নিখিল বসুন্ধরা॥
ওরে দীনের নবি নূরের ছবি পিয়ারা রাসূল-২
ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ নাইরে তাহার তুল

মনরে নবি মোদের পরশমনি জাবনের জীবন
সেই নবিজীর জীবনের কথা করিনু বর্ণন
বহু কাল আগের কতা আরব দেশের বুকে
মুখে শান্তি ছিলনা তখন থাকত সবাই দুখে
অন্যায় আর পাপের কর্মে লিপ্ত হইয়া হায়
ভেস্ত দোযখ হালাল হারাম সব ভুলিয়া যায়॥

মনরে অন্ধকারের যুগ নামেতে সবাই তাহা জানি
কে শোনেরে হায়রে সেথায় সত্য ন্যায়ের বাণী
কে করিবে শান্তি স্থাপন আরব জাহানে
আইয়ালে জাহেলিয়াত কে কাহারে শোনে
ধর্মপ্রাণ যাহারা ছিল কবে দিন কাটাতে
বেদীনগণের অত্যাচার নিরবে সইত॥

মনরে হেন কালে আরব দেশের মক্কানগরীতে
বেদীন কাফের হেদায়েতে দ্বিনের নবি জন্ম নিল
বারই রবিউল আউয়াল চান্দের সুবেহ সাদিক প্রহরে
জন্ম নিলেন নবি করিম মা অমিনার ঘরে
আবদুল্লাহর ঔরসজাত হযরত মোহাম্মদ
জন্মের পরেই মাতা তাঁহার করেন ইন্তেকাল॥

মনরে শিশু মোহাম্মদ বড়ো হইয়া যৌবন প্রাপ্ত হয়
সততা ও নিষ্ঠা তাঁহার সবাই জানতে পায়
পঁচিশ বছর বয়স কালে সততায় মুগ্ধ হইয়া

www.pathagar.com

বিবি খাদিজা দিলেন প্রস্তাব করতে তাকে বিয়া
খাদিজা বেগমের সঙ্গে করেন মোহাম্মদ শাদি
নিবেদিত হলেন তারপর মানুষ সেবার লাগি॥

মনরে সকলকে ডাকিয়া বলেন সত্য ন্যায়ের কথা
পাপাচার আর মিথ্যা ছেড়ে ধরিতে সততা
নবিজীর কথায় ভাইরে দিল সাড়া সবে
আরব ভূমি ভরল এবার নবিজীর সৌরভে
দলে দলে লোক আসিয়া মোহাম্মদ কে বলে
বলুন হযরত মোদের ভালো হবে কি করিলে॥

মনরে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হইলেন নবিজী চল্লিশ বছর বয়সে
হেরা পর্বতেরও গুহায় জিব্রাইল প্রথম আসে
জিব্রাইল ফেরেশতা আসি করেন মধুর ধ্বনি
প্রচার করতে হবে মোহাম্মদ আল্লাহপাকের বাণী
দীনের পথে হলেন বাহির আল্লাহর প্রচারে
ইসলাম জারি করলেন নবি ঘুরে দ্বারে দ্বারে॥

মনরে কত মুরতাদ কবুল করল সত্যেরও ধর্ম
বিদায় লইতে লাগিলরে অবিচার পাপ কর্ম
তথাপি কতিপয় কাফের না মানিল কথা
মন্দ আচরণে দিল নবির মনে ব্যথা
নবি মোস্তফা তখনি করলেন জিহাদ ঘোষণা
সহিব সব কষ্ট আঘাত পিছু হটিব না॥

মনরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করলেন শান্তির লাগিয়া
দেশ বিদেশ ঘুরে নবি তেইশ বছর ধরিয়া
মোহাম্মদ মোস্তফা হযরত তামাম জাহানে
পবিত্র ইসলামের বিধান পৌছান খোদার শানে
রবিউল আওয়াল চান্দের ১২ তারিখ হায়
করিয়া ইন্তোকাল নবি লইলেনও বিদায়॥

মনরে হাশরের ময়দানে নবি করবেন শাফায়ত
নবির নবি শ্রেষ্ঠ নবি নূরনবি হয়রত
নিখিল ধরায় প্রেমের ছবি প্রিয় মোহাম্মদ
প্রাণটি জুড়ায় পাঠ করিলে নবির ও দরুদ
পরশমনি সোনার খনি নবি পারের কর্ণধার
নবিজীরও পাক রওজাতে সালাম বারে বার॥

www.pathagar.com

ছ.
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জারি গান

ওরে বেঈমানদের বিষ–ছোবলে গেল শেখ
মুজিবের প্রাণ, ভুলিনি আমরা তাঁহার অবাদান॥

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালে শেখ
মুজিবের জীবন হলো অবসান
হায়রে শেখ মুজিবুর তুমি মরেও অমর কীর্তি রহমান॥

আমরাতো বাঙালি জাতি অবহেলায় ছিলাম অতি
নিপীড়ন করত পশ্চিম পাকিস্থান
হায়রে তিলে তিলে বাঙালিদের তারা করত অপমান॥

দুঃখে মোদের জীবন গড়া হাতে পায়ে শিকল পড়া
রয়েছে ইতিহাসে তার প্রমাণ
হায়ওে সেদিন মোদের সোনার বাংলা হলো পূর্ব পাকিস্থান॥

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণকালে
শেখ মুজিবুর রহমান করেছিল আহ্বান
হায়রে তাঁহার ডাকে জাগল সেদিন
শত কোটি বাঙালির প্রাণ॥

শেখ মুজিবুর বীরের মতন সংগ্রাম করে অবিরত
বাংলাদেশে উড়ালো বিজয়-নিশান
হায়রে বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ নজির
বিশ্ব তাহার দেয় প্রমাণ॥

মুজিব ছিল যোগ্য নেতা বাঙালিরা ভুলেনি তা
বাঙালিদের স্বাধীনতা তাঁহার দান
হায়রে এই কারণে বিশ্ববাসী ।
গায় মুজিবের গুণগান॥

সবার বুঝি আছে জানা এই দেশের অতীত ঘটনা
বাঙালিদের করত তারা অপমান
হায়রে মুজিবের নেতৃত্বে
মানুষ পেয়েছিল পরিত্রাণ॥

পূর্ব বাংলার জনগণে জোট বেঁধে মনে মনে
সকলে চায় শোষণের অবসান

www.pathagar.com

হায়রে দেশের জন্য বীর হাতে নিল
মেশিনগান॥

বীর বাঙালি জীবন দিল
বাংলাদেশ স্বাধীন হলো
রক্ষা করতে হবে স্বাধীনতার মান
হায়রে এই দেশেতে হবে না আর ঘাতক বেইমানদের স্থান॥

শেখ মুজিব লোকান্তরে লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে
সবাই মিলে রাখব মোরা দেশের মান
হায়রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান॥

আজও এই দেশের ভিতরে
বেইমানরা ঘুরে ফিরে
অকারণে নষ্ট করে দেশের মান
হায়রে, তাদের বিচার এই দেশেতে হবে দেখ বর্তমান॥

জ.
বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের ওপর নির্যাতন বন্ধ প্রসঙ্গে জারি গান

বিদ্যালয়ে অনেক শিশু নির্যাতনের শিকার হয়
এমন তো হবার কোনো কথা নয় কথা নয়॥
লেখাপড়া অমূল্যধন শিক্ষক মশাই হন গুরুজন
তাঁদের হাতে এ নির্যাতন ভাবতে বড়ো লজ্জা হয়।
বন্ধ কর নির্যাতন আর শিশুর প্রতি হও সদয়॥
বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা শিখতে আসে লেখাপড়া
তাদেরকে নির্যাতন করা কোনোক্রমেই উচিত নয়
সঠিক ভাবে জীবন গড়ার সুযোগ যেন তাদের রয়॥
শিশুর প্রতি নির্যাতনে আঘাত লাগে মনে প্রাণে
ভীতি জাগে সবার প্রাণে লেখাপড়ার বিঘ্ন হয়
চায়না যেতে বিদ্যালয়ে করে নির্যাতনের ভয়॥

বিনয় করি সবার তরে ছেলে মেয়েদের আদর করে
সুশিক্ষা দাও তাহারে আর কোনো নির্যাতন নয়
সকল শিশুর জন্য শিক্ষা হয় যেন আনন্দময়॥

www.pathagar.com

ঝ.

শিশু অধিকার ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত

জারি গান

ওরে আজকের শিশু আগামীতে অনেক বড়ো হবে
তাই শিশুদেরকে মানুষ হবার সুযোগ দিতে হবে এ.এ...
আমরা সবার তরে করি নিবেদন
ওরে সকল শিশুর মানুষ হবার সুযোগ প্রয়োজন
সবাই শোনো ভাই শোনো বোন শোনো দিয়া মন॥

ওরে গ্রাম-গঞ্জে শহর বন্ধুরে জানাই বিনয় করে
জন্ম হতেই সঠিক যত্ন দিবেন সব শিশুরে
ওরে শিশুই মোদের ভবিষ্যতের অমূল্য রতন
তাই সুযোগ দিতে হবে তাদের গড়িতে জীবন॥

ওরে সকল শিশুর মানুষ হবার আছে অধিকার
তাই শিশুর প্রতি না করিবেন কোনো অবিচার
ওরে শিশু শ্রমের প্রতিরোধের বিশেষ প্রয়োজন
তাই কোনো ক্রমেই করবেন না কেউ শিশু নির্যাতন॥

ওরে শিশুই দেশের ভবিষ্যত আর শিশুই দেশের প্রাণ
আজকের শিশু আগামীতে রাখবে দেশের মান
সকল শিশুর মাঝেই আছে সুন্দর একটি মন
সুযোগ পেলেই ফুটবে তারা ফুলের মতন॥

লেখাপড়া শিক্ষা করা শিশুর অধিকার
এই কথাটি স্মরণ রাখা সবার দরকার
ওরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র নিশ্চিতকরণ
সকল শিশুর জন্য ভাইরে বিশেষ প্রয়োজন॥

ওরে শিশু-স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করবেন মন দিয়া
লেখাপড়ার সুযোগ দিবেন ইস্কুলে পাঠাইয়া
সঠিক ভাবে শিশুর জীবন করিতে গঠন
সর্বক্ষেত্রে শিশুর জন্য সুযোগ প্রয়োজন॥

ঞ.

এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক জারি গান

শোনো দেশাবাসী জনগণ, শোনো ভাই শোনো দিয়া মন,
ঘাতক ব্যাধি এইডস রোগের প্রতিরোধ প্রয়োজন

www.pathagar.com

আমি সবারে জানাই, শোনেন মা ভগ্নি ভাই
ধরিলে এইডস রোগে বাঁচার উপায় নাই
এ কথাটি মনে প্রাণে স্মরণ রেখ সর্বক্ষণ॥

গ্রামে আর শহর বন্দরে যত লোক বেড়াচ্ছেন ঘুরে
নিবেদন করি আমি সবার হুজুরে
বাঁচতে হলে জানতে হবে এইডস রোগের কি কারণ॥

এইচ. আই. ভি. ভাইরাস যার রক্তে করে বাস
এইডস রোগ তারে বলে করে যাই প্রকাশ
এইচ. আই. ভি. ভাইরাস থেকে দুরে থাকা প্রয়োজন॥

নিবেদন সবার চরণে, কথাটি রাখিবেন মনে,
সতর্ক থাকতে হবে দৈহিক মিলনে,
মেনে গুণে চলতে হবে ধর্মীও অনুশাসন॥

অবৈধ দৈহিক মিলনে, শোন ভাই মা ভগ্নিগণে
এইডস রোগ ছড়াইতে পারে জনে জনে,
অবৈধ মেলামেশা কইরোনা আর কেউ কখন॥

মায়ের এইডস থাকিলে সে গর্ভে সন্তান জন্মিলে
সন্তানের দেহে এইডস যাবে যে বসে
ঐ জন্মদাতা পিতার দেহেও এইডস করে আক্রমণ॥

আমি আরও বলতে চাই সবাই শোনো ভাইরে ভাই
রোগ ব্যাধিতে চিকিৎসায় সর্তক থাকা চাই
রক্তের মাধ্যমে এইডস শরীরে করে গমন॥

ইনে্জকশান নেবার কালে লক্ষ্য রাখুন সকলে
পুরাতন সিরিন্জ কেহ নিবেন না ভুলে
আবার রক্ত দেয়া নেয়ার কালে সতর্কতা প্রয়োজন॥

কারো যদি এইডস হয়, ভাই কতা মিথ্যা নয়
চিকিৎসা বিহনে তাহার অকাল মৃত্যু হয়
আমি তাই বলি ভাই মা ভগ্নিগণ থাকো সবে সচেতন॥

ট.

জনসংখ্যা বিষয়ক জারিগান

ওরে দিনে দিনে বাড়ছে মানুষ, বাড়ছেনাতো জমি আর
নিয়ন্ত্রণ করিতে হবে অধিক জন্মহার গো॥

আয় বুঝিয়া ব্যায় করিলে সংসারে সুখ শান্তি মিলে
অধিক সন্তান কম সম্পদে নাই কোনো দরকার

www.pathagar.com

ব্যায়ের বোঝা বেড়ে গেলে সংসার যায় রসাতলে
সংসারে সুখ পেতে হলে থেকো হুশিয়ার গো॥

সন্তান বেশি যে সংসারে চেয়ে দেখ তাদের ঘরে
অভাব দুঃখ বিরাজ করে অশান্ত সংসার
অল্প সন্তান হইলে পরে অভাব দুঃখ রয়না ঘরে
সুখ শান্তি বিরাজ করে উন্নতি হয় তার গো॥

সুখ যদি চাও পরিবারে সংসার গড়ো হিসাব করে
একটি সন্তান হইলে পরে নাই প্রয়োজন আর
বিধাতা সংসারের রাজা ভুল করিলে হয়গো সাজা
অধিক সন্তান হইলে বোঝা হয় যে অনেক ভার॥

সন্তান বেশি হইলে ঘরে মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে
রোগ ব্যাধিতে ঘিরে ধরে ঐ না পরিবার
নাই ঘরে তার ঔষধ পানি সংসারে হয় টানাটানি
জনম ভরে দুঃখের ঘানি টানতে হবে তার গো॥

অল্প সন্তান হইলে ঘরে শিক্ষা দিতে পারবে তারে
অভাব দুঃখ পরিবারে থাকবে নারে আর
তাই বলি ভাই ঘরে বাইরে সকল বিষয় চিন্তা করে
জনসংখ্যা প্রতিকারে থেকো হুশিয়ার গো॥

আমি অধম বিনয় করে জানাই প্রতিকার ঘরে
পরিকল্পনা গ্রহণ করে গড়িও সংসার
অল্প সন্তান লইয়া ঘরে বিদ্যা শিক্ষা দাও তাহারে
সুখের বাতি জ্বলবে ঘরে থাকবে না আর অধিকার গো॥

ঠ.

দেশাত্ববোধক জারি গান

ওরে প্রথমে বন্দনা করি আল্লা নবির নাম
দশের হুজুরে জানাই আদাব ও সালাম
এই দেশটি মোদের মায়ের মতো আমরা তার সন্তান
বাংলাদেশের বাউল মোরা গাহি বাংলার গান
সবুজ শ্যামল দেশটি মোদের সোনার মতন
সম্ভাবনার সোনার বাংলা রূপসী বরন॥

সবাই শোনো ভাই শোনো বোন শোনো দিয়া মন
বাংলাদেশের কথা কিছু করিগো বর্ণন

www.pathagar.com

ফুল ফসলে ভরা মোদের সোনার বাংলাদেশ
হিজল তমাল তাল নারিকেল গাছের শোভা বেশ
এই দেশেতে জন্মে মোদের ধন্য এ জীবন
দেশকে ভালোবেসে মোদের হয় যেন মরণ॥

দক্ষিণেতে আছে মোদের বঙ্গোপসাগর
শীতল বাতাস এসে মোদের জুড়ায় সে অন্তর
বিশ্বাখ্যাত শিল্প মোদের আছে পর্যটন
সমুদ্র সৈকতের কথা জানেন সর্বজন॥

পূর্ব দিকে পাহাড়-পর্বত আছে সারি-সারি
কি শোভায় সোনার বাংলা অতীব সুন্দরী!
ঝর ঝর ঝর্নাধারা জুড়ায় দু-নয়ন
নানা বর্ণের পশুপাখি করছে বিচরণ॥

জলের জন্য নদী নালা আছে শতশত
প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরা বইছে অবিরত
পাখির ডাকে নদীর বাঁকে জুড়ায় যে জীবন
সম্পদে সৌন্দর্যে ভরা মোদের সুন্দরবন॥

বিলে ফোটে শাপলা শালু স্বর্ণশস্য মাঠে
পল্লিবধূ জল আনিতে যায়রে নদীর ঘাটে
চাবাগানের রূপের কথা করি গো বর্ণন ।
রূপের শোভা ছাড়াও করে অর্থ উপার্জন॥

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদের শোভবেশ
নীল আকাশের নিচে সবুজ সোনার বাংলাদেশ
নদীর জলে নৌকা চলে, চাষির মুখে পান
রাখাল বসে বাজায় বাঁশি জুড়ায় মোদের প্রাণ॥

রূপলাবণ্যে ভরা মোদের সোনার বাংলাদেশ ।
আম কাঁঠালের শীতল ছায়ায় জুড়ায় মোদের জান
এই দেশেতে জন্ম মোদের ধন্য এ জীবন
দুঃখ সুখে সবাই মোরা সবার আপন॥

সকল দেশের সেরা মোদের সোনার এ দেশ ভাই
বাংলা ভাষায় কথা বলি বাংলাতে গান গাই

www.pathagar.com

মায়ের মুখের বাংলাভাষা মধুর মতন
বাবার মধুর ভালোবাসায় জুড়ায় রে জীবন॥

সকল খাত বলতে আমার জারি বেড়ে যাবে
দেশকে ভালোবেসে মোদের ধন্য হতে হবে
দেশের জন্য প্রাণ দেব ভাই হলে প্রয়োজন
এই মিনতি রেখে জারি করি সমাপন॥

তথ্যসহায়ক

১. মো. আবুল কালাম আজাদ, পিতা : মৃত কয়েন উদ্দিন, গ্রাম : বুড়ির ভাগ, পোস্টঃ নলডাংগা, থানা : নলডাংগা, বয়স :৪৮ বছর, পেশা : শিক্ষকতা এবং কৃষি

২. কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস (কার্তিক দাস), পিতা : জোতিন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা : কাদম্বিনী বিশ্বাস, গ্রাম : হাজরা, পোস্ট : নাটোর, থানা ও জেলা : নাটোর, জন্ম : ৫ নভেম্বর

www.pathagar.com

লোকউৎসব

বাঙালি জাতিসত্ত্বার সাথে একটি কথা জড়িয়ে আছে, আর সেটি হলো বাঙালির 'বারো মাসে তের পার্বণ'। বিভিন্ন আনন্দ-উৎসব ও পরবে বাঙালিরা একত্রিত হতে চায় এবং একত্রিত হয়ে তাদের উপলক্ষ্য বা আয়োজনকে উৎসবে পরিণত করার চেষ্টা করেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির বাইরেও বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষ্যে নাটোর জেলার বিভিন্ন জায়গায় লোকউৎসবের আয়োজন করা হয়। সেরকম কিছু উৎসব বা মেলার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. বৈশাখি উৎসব

সারা দেশের বিভিন্ন জেলার মতো নাটোর জেলাতেও ঐতিহ্যগত ভাবে বৈশাখি মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন নাটোর জেলার বিভিন্ন স্থানে বৈশাখি মেলা বা উৎসবের আয়োজন করা হয়। মেলা উপলক্ষ্যে সমস্ত জেলাতে এক ধরনের সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। সবাই বৈশাখি পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। নাটোর সদর উপজেলা, সিংড়া, বাগাতিপাড়া, গুরুদাসপুর, লালপুর সব জায়গাতেই মেলার আয়োজন করা হয়।

বৈশাখি মেলায় কাগজের ফুল বিক্রেতা

নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াসে ও প্রাণের টানে সবাই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এ নিয়ে গ্রামেগঞ্জে এক ধরণের বিশ্বাস বা সংস্কার প্রচলিত আছে যে, বছরের এই দিনটি অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটি যদি ভালোমতো কাটানো

www.pathagar.com

যায় বা এই দিনে যদি ভালো খাওয়া দাওয়া করা যায় তবে বছরের বাকি দিনগুলোও ভালোমতো কাটানো সম্ভব। এই বিশ্বাস থেকে সবাই দিনটি ভালো করে কাটাতে চায়। নাটোর জেলার অদিবাসীদের মধ্যেও এই দিনটি আলাদা তাৎপর্য বহন করে।

২. নবান্ন উৎসব

লোকসংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান নাটরের সাধারণ মানুষ যুগ যুগ ধরে পালন করছেন নবান্ন উৎসব। কৃষিনির্ভর সভ্যতায় গ্রামীণ পটভূমিতে নবান্ন উৎসব অনন্য। প্রধাণত আমন ধান তোলার সময় গ্রামের পর গ্রাম এ উৎসবে মেতে ওঠে। চারিদিকে শাঁখের আওয়াজ, ঢেঁকিতে ধান কোটার শব্দ, নতুন পোশাকে শিশুদের কলোরব সবকিছুই এ উৎসবের অনুসঙ্গ। বাড়িতে বাড়িতে অতিথির আগমন উপলক্ষ্যে নানা রকম পিঠা-পায়েসের আয়োজন হয়ে থাকে। আঙিনায় বসে সান্ধ্যকালীন কীর্তনসহ বিভিন্ন লোকগানের আসর। নাটরের সাঁওতাল সম্প্রদায় নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দে পালন করেন 'সোহরায়' উৎসব। এ সময় তারা পান-ভোজনে মত্ত হয়ে ওঠে। সকলের সাথে আনন্দে সামিল হওয়াই যেন এ উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

৩. রথ উৎসব

বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় নাটোর জেলার গুরুদাসপুরে ঐতিহ্যবাহী রথ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজন হয় মেলার। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিংবা জেলার বাইরের নানারকম জায়গা থেকে দোকানিরা বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসেন গুরুদাসপুরে। এছাড়াও ধর্মভীরু মানুষ নিজেদের পূণ্য লাভের আশায় এখানে আসেন এবং মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

রথের মেলা ১৭ই জৈষ্ঠ্য থেকে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

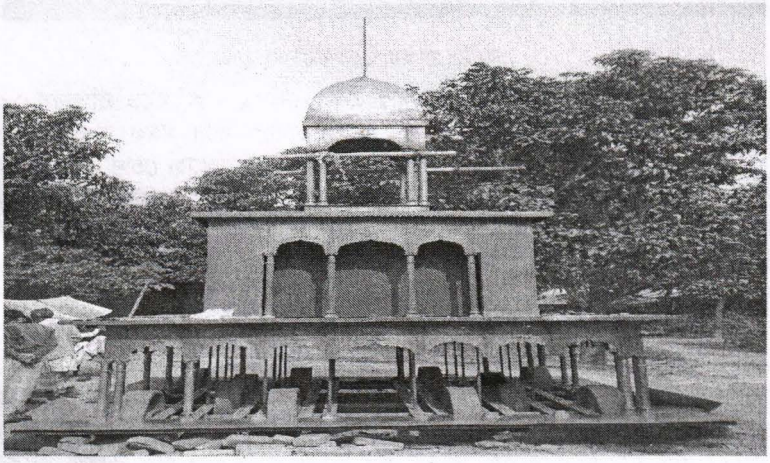

সাধনগরের পিতলের রথ

www.pathagar.com

রথযাত্রার ইতিহাস

ধারণা করা হয় রথযাত্রাটির উৎপত্তি হলো পুরীর জগন্নাথ ধামে। পুরীর ধাঁচে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়। রথ গমনের ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় মাসির বাড়িতে ৭ দিনের জন্যে জগন্নাথ দেব বেড়াতে আসেন। তবে তাঁর আসল বাড়ি হলো গোবিন্দ-বাড়ি। এটা তাদের বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গুরুদাসপুরে প্রায় ১০০ বছর ধরে রথের মেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে মনে করা হয়। মেলাটি বহু পুরুষ আগে শুরু হয়েছে এবং তাদের উত্তর পুরুষরা এটি এখনোও পরিচালনা করে আসছেন। রথটানার সময় রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অর্থাৎ এই ৯ দিন নিরামিষ খাবার খাওয়া হয়ে থাকে।

নাটোর রাজবাড়িতে রথটানা হচ্ছে

মেলার সময় ৪ বেলা ভোগ দেওয়ার প্রচলন আছে এবং গড়ে প্রতিদিন ১০০ অতিথির সেবা এখানে হয়ে থাকে। সকালের ভোগকে বলে মঙ্গল আরতি ভোগ, দুপুরের আগে একটি ভোগ হয় বাল্যভোগ, দুপুরের ভোগ 'মধ্যাহ্ন ভোগ', সন্ধ্যা ভোগ 'দুধ ভোগ'। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের তিথি অনুযায়ী, আবার কোনো কোনো শ্রাবণ মাসে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় অথবা পঞ্জিকার তিথি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব মন্দির কর্তৃপক্ষই পালন করেন, কেউ যদি ভোগ দিতে চায় তবে সেটি গ্রহণ করা হয়। পারিবারিকভাবে এই মেলাটি আয়োজিত হয়ে থাকে। গুরুদাসপুরের রথের মেলার সময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই প্রসাদ বা ভোগ দিতে পারেন। যে যার মনোকামনা পূরণ করার লক্ষ্যে এই কাজটি করে থাকেন। মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলে জানান, জাতি বা বর্ণ প্রথার ভেদাভেদ ঘোচানোর জন্যে এই রথের মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তারা মতপ্রকাশ করেন রথটানার সময় যে দড়ি ধরে টানা হয় তাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র, বৈশ্য সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। এখানে কোনো ভেদাভেদ করা হয় না।

www.pathagar.com

রথটানার সময় বলা হয়–

জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বলো
এ নাম যতই বলো ততই ভালো
গোবিন্দ বলো
জয় রাধে রাধে গোবিন্দ

রথ টানার সময় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এই কীর্তন গাওয়া হয় আর রথটানা হয়। রথের মেলায় রথটানার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা হয়। যেমন যে মন্দির থেকে রথ টানা হয় সেই মন্দিরের ঠাকুরকে রথের ওপর উপনিবেশ করতে হয়। তিনি রথের ওপরে উঠে সবার উদ্দেশ্যে বাতাসা বা খাগরাই ছুড়ে মারেন। সমস্ত মেলার সময়ে ঐ ঠাকুরই পূজা-কার্য পরিচালনা করে থাকেন।

তথ্যসহায়ক

শ্রী হরিপদ কুণ্ডু, পিতা : স্বর্গীয় জগন্দ্রেনাথ, গ্রাম : গুরুদাসপুর (পশ্চিম পাড়া), পোস্ট : গুরুদাসপুর, থানা : গুরুদাসপুর, বয়স : ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি পাস

www.pathagar.com

লোকমেলা

নাটোর বাংলাদেশের লোকঐতিহ্যের এক কিংবদন্তিতুল্য আবাসভূমি। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নাটোরের সাধারণ মানুষই এসব লোকঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করেও আনন্দ বিনোদনের উৎস হিসেবে যুগ যুগ ধরে তারা আয়োজন করছে বিভিন্ন রকম মেলার।

১. পুষনার মেলা : নাটোর জেলার বিভিন্ন স্থানে পৌষ সংক্রান্তির সময় পুষনার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সে রকমই একটি স্থান হলো নাটোর সদর উপজেলার সন্ন্যাসীতলা। এখানে প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষ দিন মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানিরা পণ্য নিয়ে আসেন এখানে বিক্রি করার জন্যে। মেলায় বিনোদন হিসেবে সাঁওতাল ধর্মাবলম্বীদের নৃত্য পরিবেশিত হয়। তারা তাদের নিজের ভাষায় সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন। পুষনা উৎসব মূলত তাদেরকে কেন্দ্র করেই পালিত হয়ে থাকে।

পুষনার মেলায় বাঁশজাত দ্রবের দোকান

www.pathagar.com

২. ঘোড়াবাইচের মেলা

নাটোর জেলার গুরুদাসপুরের মোকিমপুর। এখানকার একটি অন্যতম মেলা হলো ঘোড়াবাইচের মেলা। চৈত্র্যমাসের পয়লা দিন এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার

মেলায় কাঁসা-পিতলের দোকানি, জয়কালী মন্দির, নাটোর

প্রধান আকর্ষণ ঘোড়ার বাইচ বা ঘোড়া দৌড়। জেলার বা জেলার বাইরের বিশেষ করে পাবনা, সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ ঘোড়া নিয়ে আসে বাইচ দেওয়ানোর জন্যে। মেলার প্রথম দিনেই বাইচের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রথম পুরস্কার হিসেবে কাঁসার কলস উপহার দেওয়া হয়। যে দ্বিতীয় হয় তাকে কাঁসার বদনা দেওয়া হয়ে থাকে। তৃতীয় স্থান অধিকারীকে কাঁসার প্লেট অথবা তোয়ালে দেওয়া হয়।

৩. বৌ-মেলা

চৈত্র মাসের প্রথম দিন নাটোরের গুরুদাসপুরের মোকিমপুরে ঘোড়াবাইচের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার দ্বিতীয় দিনে গ্রামের বিবাহিত রমণীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় বৌ-মেলার। ঐ দিনটিতে কোনো পুরুষ মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। গ্রামের বৌয়েরা শুধুমাত্র মেলাটি ঘুরেফিরে দেখেন। তারা একটি উৎসবমুখর পরিবেশে বছরের এই বিশেষ দিনটিতে একত্রিত হন। শখের জিনিসগুলো উৎসাহ নিয়ে দেখেন এবং নিজ নিজ পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলো ক্রয় করেন। তাদের সাথে থাকে শিশুরা। তারাও যার যার মা অথবা পরিবারের আত্মীয়ার সাথে মেলা উপভোগ করে। বিবাহিত নারীর জন্যে এ এক অনন্য উৎসব। বৌ-মেলা দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

লোকাচার

লোকাচার লোকমানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। জীবন ও জীবিকার কঠিন আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া এ দেশের সাধারণ মানুষ কিছুটা বৈচিত্র, চিত্তবিনোদন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মিশেলে নানা ধরনের অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। নাটোরে যুগ যুগ ধরেই এসব লোকাচার পালিত হয়ে এসেছে। শিশুর জন্ম পূর্ববর্তী সময় থেকে বেড়ে ওঠার বিভিন্ন স্তরে, এমনকি মৃত্যু পরবর্তী সময়েও এসব আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ধর্মীয় আচার তো রয়েছেই।

এখানে নাটোরের উল্লেখযোগ্য কিছু লোকাচারের কথা তুলে ধরা হলো :

১. সাদ বা সাত খাওয়ানো

লোকাচার সম্পর্কে বলা যায় যে, মানুষের মনের লোকবিশ্বাসগুলিকে কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করাই লোকাচার। নাটোর জেলার মানুষের কাছে প্রতিটি লোকাচারই গুরুত্ব। আগত সন্তানের মঙ্গল কামনায় গর্ভধারিনীকে সাত বা সাদ খাওয়ানো হয়ে থাকে। সাদ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়। যে মহিলাকে সাদ খাওয়ানো হবে তাকে তার বাপের বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। গর্ভধারণ করার সপ্তম মাসে সাদ বা সাত খাওয়ানো অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। মনে করা হয় গর্ভধারিনী মহিলার কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করলে যদি সে খেতে না পারে, তবে নবজাতক শিশুর মুখ দিয়ে লালা পড়বে। সাত খাওয়ানো অনুষ্ঠানে সাত রকমের মিষ্টি জাতীয় খাবার থাকে। ধারণা করা হয় সাত রকমের মিষ্টির কারণে এই অনুষ্ঠানটিকে সাত খাওয়ানো অনুষ্ঠান বলা হয়। আবার এক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলা যায় যে, গর্ভধারিনী যদি চান তবে তাকে সাত রকমের বেশি মিষ্টিও খাওয়ানো যাবে তবে মিষ্টির পরিমাণ কোনো মতেই সাত রকমের কম হবে না। সাত খাওয়ানোর সময় মহিলাকে একটি শপ বা পাটির ওপর বসানো হয়। তার সামনে সাত রকমের মিষ্টি রাখা হয়। তার পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা এসে সাত খাইয়ে যান। যদি কেউ ইচ্ছে করেন সাত খাওয়ানোর সময় উপহার হিসেবে অর্থ বা অন্য কোনো উপঢৌকন প্রদান করতে পারেন।

২. গড়গড়া দেওয়া

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে হাঁটতে শেখা পর্যন্ত বাবা-মায়ের মনে এক রকম ভয় কাজ করে যে শিশুটি ঠিকমতো হাঁটতে চলতে পারবে কিনা। সেজন্যে পরিবারের পক্ষ থেকে গড়গড়া দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

গড়গড়া তৈরি

প্রথমেই পানির মধ্যে আনুপাতিক হারে ময়দা মিশিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। ময়দা সিদ্ধ হয়ে গেলে এর সঙ্গে গুড় অথবা চিনি এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে নারিকেল কুড়ে মেশাতে হবে। এরপর পাতিল থেকে তুলে নারিকেল ও গুড় মিশ্রিত ময়দা হাতের তালুতে ডলে ডলে গোলাকার করে নিতে হবে যেন দেখতে অনেকটা রসগোল্লার মতো হয়। আচার অনুষ্ঠানে এটি ব্যবহারের পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবেও এই গড়গড়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গড়গড়া দেওয়ার নিয়ম

নাটোর জেলার বাসিন্দাদের মনে এক ধরনের বিশ্বাস আছে যে, পর্যাপ্ত বয়স হওয়ার পরেও যখন কোনো শিশু নিজে হাঁটতে পারে না তখন গড়গড়া দিলে সে হাঁটা শিখবে। গড়গড়া দেওয়ার সময় শিশুটিকে পাটি বা শপের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর গোলাকৃতির গড়গড়া গুলি তার মাথার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ঐ শিশুর আশেপাশে যে সকল আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী অবস্থান করেন তারা সবাই সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে যে যার ইচ্ছেমতো খাওয়া শুরু করেন এবং সবাই মনে মনে দোয়া করেন যে, শিশুটি যেন শীঘ্রই হাঁটতে শেখে।

৩. মুখে-ভাত বা অন্নপ্রাসন

নাটোর জেলার মানুষের কাছে অতি পরিচিত একটি লোকাচার হলো সন্তানের মুখে ভাত দেওয়া। শিশু যখন কোনোমতে খাওয়া শেখে তখন তার মুখে খাবার তুলে দেওয়া হয়ে থাকে। সন্তানের বা শিশুর মুখে ভাত দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশকিছু নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করা হয়। যেমন শিশুর মুখে প্রথম ভাত তুলে দেবেন শিশুর মামা। আর যদি মামা না থাকেন তবে চাচা শিশুর মুখে খাবার তুলে দেবেন। আবার এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, শিশুর মুখে ভাত দেওয়ার জন্যে যে খাবার রান্না করা হয় সেটি রান্না করেন শিশুর খালা। অনুষ্ঠানে শিশুর শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রতিবেশীরা উপস্থিত থাকেন। তারা শিশুর মঙ্গল কামনা করেন।

৪. গায়ে হলুদ দেওয়া

সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিবাহকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নাটোর জেলার মানুষও গায়ে হলুদের রীতি মেনে আসছে সেই দীর্ঘদিন থেকে। কথিত আছে বিয়ের বর কনের ওপর যাতে কোনো ধরণের অপদেবতার বা অপশক্তির প্রভাব না পড়তে পারে সেজন্যে বর ও কনেকে হলুদ দেওয়া হয়। আবার বলা হয় হলুদ হলো শুভ্রতার প্রতীক। সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরণের বিশ্বাস বা সংস্কার আছে যে কোনো ভালো কাজের আগে অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

বিয়ের সময় হলুদ দেওয়ার মঞ্চটি খুব সুন্দর করে সাজানো হয়। চারকোণায় চারটি কলাগাছ পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। দড়িগুলোতে রঙবেরঙের

www.pathagar.com

কাগজের ফুল কেটে সুন্দর ভাবে সাজানো হয়। বরের বাড়িতে বরকে আর কনের বাড়িতে মঞ্চ করে কনেকে সেখানে বসিয়ে হলুদ বেটে তাদের মুখে মেখে দেওয়া হয়। এতে পরিবারের সবাই এবং বিয়েতে আগত সকলে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এ-সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু লোকাচার নাটোর অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে একটি হলো বিয়ে বাড়িতে মাছ ও পান পাঠানো। বরযাত্রীরা বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পূর্বে উপহার স্বরূপ কনের বাড়িতে মাছ, পান সুপারি পাঠিয়ে থাকেন। বরের ছোটো ভাই বা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কেউ সেই মাছ ও পানপাতা নিয়ে কনের বাড়িতে হাজির হন। উল্লেখ্য যে, মাছ ও পান পাতাকে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধারণা করা হয় নবদম্পতির জীবনে সন্তান-সন্ততির কোনো সমস্যা হবে না এবং তারা অনেক খুশি থাকবে। তাই বংশ পরম্পরায় আজও নাটোর জেলায় বিয়ে বাড়িতে এই লোকাচারগুলো পালিত হয়।

৫. মৃত্যুর পর পালিত লোকাচার

মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচারগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নাটোর জেলায় এ সংক্রান্ত বেশ কিছু লোকাচার রয়েছে। প্রথমত ধরা যাক কোনো মানুষ মারা গেলে সেই দিন সেই বাড়িতে অর্থাৎ মরা বাড়িতে থাকায় (চুলায়) কোনো প্রকার আগুন জ্বলবে না। প্রয়োজনে পাশের বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার দিয়ে যাওয়া হবে। আবার মৃত ব্যক্তির কোনো নিকটাত্মীয় যদি মৃতের বাড়িতে এসে সেই দিন ফিরে যেতে না পারেন তবে তাকে চারদিন পর্যন্ত সেই বাড়িতে থেকে যেতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা গেলেন তার মেয়েদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অবশ্য-পালনীয় বলে বিবেচনা করা হয়।

ক. চতুর্থ দিনে ফকির খাওয়ানো

গ্রামের কোনো মানুষ মারা গেলে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করার জন্যে এলাকার ফকির মিসকিনদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলা হয় যেমন মানুষ মারা যাওয়ার পর চারদিনের দিন ফকির খাওয়াতে হয় আর ফকিরের সংখ্যা সব সময় বিজোড় হতে হয়। কখনও জোড় সংখ্যক ফকির খাওয়ানো হয় না, আর চতুর্থ দিনের বেশি হলে তা অমঙ্গলের প্রতীক বা বিদেহী আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা স্বরূপ বিবেচিত হয়। আরেকটি বিষয় এখানে পরিলক্ষিত হয়, মরা লাশ যেখানে রাখা হয় লাশ দাফন করার পর সেই জায়গাতে একটি লোহার দাওলি বা হাইস্যা রাখা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, এতে অশুভ শক্তি ঐ মৃত আত্মার ওপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারে না ।

খ. চল্লিশা অনুষ্ঠান

মানুষ মারা যাওয়ার পর তার রূহের মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ মাহ্‌ফিল করা হয়ে থাকে। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই প্রবণতা অনেক বেশি। নাটোর জেলার মানুষ মৃত্যুকেন্দ্রিক যে সকল লোকাচার পালন করেন তন্মধ্যে মৃত মানুষের নামে চল্লিশা করা

www.pathagar.com

অন্যতম। চল্লিশা অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে চল্লিশতম দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন মারা যাবেন সেই দিন থেকে গণনা করে চল্লিশ দিনের দিন চল্লিশা অনুষ্ঠান করা হয়। চল্লিশা অনুষ্ঠানে গ্রামের সবাইকে বা সাধ্যানুযায়ী যার যত জনকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়ে থাকে। আর বেশ কিছু মহিলাকে দাওয়াত দেওয়া হয় পবিত্র কোরান পাঠ করার জন্যে। তারা একটি নির্দিষ্ট ঘরে বসে সর্বদা পবিত্র কোরান পাঠ করেন এবং খতম দিয়ে থাকেন। মানুষের মনের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, মৃতের আত্মা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং চল্লিশ দিন পরে আত্মা বাড়িতে ঢুকতে পারে না। তাই চল্লিশতম দিনে তার আত্মাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে এই আয়োজন করা হয়।

৬. সাঁওতালদের আচার-অনুষ্ঠান

সাম্প্রদায়িত সম্প্রীতির দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এখানে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ একত্রে বাস করেন। ধর্ম ও সম্প্রদায়গত কারণে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও নীতিগত দিক গিয়ে তারা একে অন্যের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেন। নাটোর জেলায় বেশ কিছু সাঁওতাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

সাঁওতাল পাড়ায় ৩২ থেকে ৩৫টি সাঁওতাল পরিবার বসবাস করেন। বৃটিশ আমল থেকে তারা এখানে বসবাস করছেন। তাদের সংস্কৃতি, প্রাত্যহিক জীবনাচরণ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে তাদের প্রধান খাদ্য ভাত, পোশাক লুঙ্গি ও জামা, প্রধান ফসল কুশাইল বা আখ। এখানে উল্লেখ্য যে প্রতিটি সাঁওতাল পরিবারেরই নিজস্ব কিছু জমিজমা আছে। প্রধান পেশা কৃষি, এর বাইরেও তারা বছরের একটি সময় যখন হাতে কোনো কাজ থাকে না তখন শিকার করতে বের হন। শিকার করার অস্ত্র হিসেবে তারা তীর ও ধনুক ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন বা দুইজনকে তারা ডেকে নিয়ে যান। সারাদিন শিকার করার পর যে পরিমাণ শিকার পান তার মাংস সবাই ভাগ করে যে যার বাড়িতে নিয়ে যান। প্রধান উৎসব পুষনা। উৎসবটি পালনের ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতালদের সঙ্গে নাটোর জেলায় বসবাসকারী সাঁওতালদের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে তারা এই উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। এ উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে যাকে পুষনার মেলা বলা হয়। বর্তমান সময়ে এসে সাঁওতালরা মুসলমানদের মতো বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন। কিন্তু যখন নিজেদের মধ্যে কথোপকথন হয় তখন তাদের যে ভাষা আছে সেটি তারা ব্যবহার করেন। যেমন, চেলেকা মিনামা–আপনি কেমন আছেন? ও কাতেম চালা কালা–আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

সাঁওতাল পাড়ার বেশির ভাগ বাড়ি মাটির তৈরি। যাকে তারা মাটির দেওয়াল বলে অভিহিত করছে। তবে দেওয়াল গুলিতে বিভিন্ন ধরনের আল্পনা থাকে যার মাধ্যমে সাঁওতালদের শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নাটোর জেলায় বসবাসকারী সাঁওতালদের মধ্যে পদবির বেশ কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন হেমব্রম, সরেন,

www.pathagar.com

কিসকু ইত্যাদি। সাধারণত মুসলিম বা হিন্দুদের সঙ্গে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তারা আদাব বা নমস্কার ব্যবহার করেন। কিন্তু যখন নিজেদের কাউকে সম্বোধন করেন তখন মাথা নিচু করে জোহার বলেন। এর মাধ্যমেই তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের ভাবের আদান প্রদান হয়ে থাকে।

বিবাহ-অনুষ্ঠান

অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের মতো সাঁওতালদের মধ্যেও বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। বিয়ের ক্ষেত্রে স্বগোত্র বা স্বজাতিকে বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। নাটোর জেলার সাঁওতালরা তাদের বিবাহ-কার্যের জন্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলের সাঁওতালদের বেছে নেন। কনে ও বরের মধ্যে বিয়ের আগে কথাবার্তার প্রচলন সাঁওতাল সমাজে নেই। সাঁওতালদের মধ্যে যিনি সাহেব তিনি এবং বর অথবা কনের বাপ এবং অন্য পক্ষের অভিভাবকেরা একসঙ্গে কথা বলে বিয়ের কথা পাকাপাকি করে থাকেন। তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ পরিলক্ষিত হয় না। বিয়ে অনুষ্ঠানে গ্রামের সকলে আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। সাঁওতালদের মধ্যে কনের মাথায় বরের সিঁদুর পরিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এদের বিয়ের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের সংগীত পরিবেশন করা হয়। যেমন :

বেকের বেকের য়্যানগেম জনম লি দিন
কোনর কোনর য়্যানগিম হরলি দিন
বাতি রে বাসা ডাক মলি রে সুনুম
কোতু জোতুঞ্চেতে য়্যানগিম হর লি দিন
বম দয়ালে নায়ো বাম্যা আলেঞ্চে
তালা নিঞ্চদা মিনহুম মেরোম
লেকা য়্যামগির ছুটি কি দিন।

সাঁওতালরা যেহেতু পিতৃপ্রধান তাই বিয়ের পর নবদম্পতি বরের বাবার বাড়িতে অবস্থান করেন। গান-বাজনা ছাড়াও বিয়েতে সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরনের লোকাচার পালন করেন। এদের মধ্যে বাম হাতে উল্কি আঁকার প্রবণতা দেখা যায়। উল্কিকে তারা ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশের পাশাপাশি দেহের সৌন্দর্য্য বর্ধনের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন। নাটোর জেলায় বসবাসকারী সাঁওতালদের মধ্যে উল্কি অঁকার চিত্র খুব একটা বেশি চোখে পড়ে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তারা দেহে উল্কি আঁকিয়ে নেন। নাটোর জেলায় বসবাসকারী সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমানে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ হিসেবে তারা বলে আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্যে তারা বর্তমানে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন। উৎসব-অনুষ্ঠান তারা ইচ্ছেমতো করতে পারেন না। ধর্মীয় মূল্যবোধ বুকে ধারণ করে আজও তারা নিজস্ব সংস্কৃতি লালন করে চলেছেন।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

অঞ্চল ভেদে মানুষের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন দেখা যায়। উপাদানের প্রাপ্যতার ওপর এটি ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। বাঙালি মাত্রই ভোজনরসিক। বিভিন্ন সময় উৎসব আয়োজন উপলক্ষ্যে, বাড়িতে অতিথি এলে বা নিজেদের মধ্যে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মুহূর্তে তারা বিভিন্ন ধরনের শৌখিন খাবারের আয়োজন করে থাকে। এ বিষয়ে এক সময় নাটোর জেলার সুখ্যাতি ছিল। নাটোরের ঐতিহ্যবাহী কাঁচাগোল্লা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। দেশের সব বিভাগ ও জেলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো হওয়ার কারণে এ অঞ্চলে প্রায় সব ধরনের কাঁচামাল বা খাদ্য-উপাদান পাওয়া যায়। ফলে নাটোর অঞ্চলের রয়েছে কিছু নিজস্ব সংস্কৃতি যা লোকখাদ্যেও বিদ্যমান। প্রথমেই আসা যাক পিঠার কথায়:

১. আন্দোসা পিঠা বা পাকোয়ান পিঠা

আন্দোসা বা তেলের পিঠা নাটোর জেলার অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি পিঠা। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, অতিথি আগমন উপলক্ষ্যে, শীতের সময়ে বা কেউ যদি খেতে ইচ্ছে করেন তবে তাৎক্ষণিক এ আন্দোসা পিঠা বানানো হয়ে থাকে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার বাড়িতেই পিঠা বানানো হয়ে থাকে। এই পিঠা বানানোর জন্যে বিভিন্ন ধরণের উপকরণ দরকার হয়।

উপকরণ : আলো চালের গুড়া, গুড় অথবা চিনি, পানি ও তেল। আন্দোসা পিঠা বানানোর জন্যে প্রথমে আলো চালের গুড়া নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির সাথে ঘুটে বা মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর যার যেটি সামর্থ সে অনুযায়ী ইচ্ছেমতো গুড় বা চিনি পরিমাণমত মেশাতে হবে। মেশানোর পর পানি, চালের গুড়া ও চিনি অথবা গুড়ের মিশ্রণটি দেখতে অনেকটা আঠালো পদার্থের মতো মনে হবে। এমন অবস্থায় আকার (চুলার) ওপর করাতে ফুটতে থাকা তেলে সেই মিশ্রণ চামচের সাহায্যে পাইল্লা (পাতিল) থেকে তুলে ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে তেলের মধ্যে সেই পিঠাটি ফুলতে থাকবে।৩০ থেকে ৪০ সেকেন্ড ফুটতে দেওয়ার পর সূচালো কিছু একটি দিয়ে তেল থেকে পিঠাটি তুলে ঠান্ডা করে পরিবেশন করতে হবে।

২. পাটিজোরা পিঠা

নাটোর অঞ্চলের মানুষের আরেকটি প্রিয় পিঠা হলো পাটিজোরা পিঠা। বিভিন্ন উৎসব, আয়োজন উপলক্ষ্যে অথবা বিকেলের নাস্তা হিসেবে এই পিঠাটি অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার হিসেবে পরিচিত। পাটিজোরা পিঠা দেখতে অনেকটা ডিমভাজির মতো লম্বা হয়ে থাকে। এ পিঠা ঝাল ও মিষ্টি দু ধরনেরই হতে পারে। স্বাদ ভেদে কিংবা অবস্থার প্রেক্ষিতে যে ভাবে ইচ্ছা সেভাবেই এই পিঠা তৈরি করা যায়।

www.pathagar.com

পাটিজোরা পিঠা বানানোর জন্যে আন্দোসা পিঠার মতো একই ধরণের উপকরণের প্রয়োজন। আন্দোসা পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে করাতে ডুবো তেলের প্রয়োজন হয় কিন্তু পাটিজোরা পিঠা বানাতে করাতে সামান্য পরিমাণ তেল দিলেই হবে। ঝাল বা মিষ্টি যা দিয়েই মিশ্রণ তৈরি করা হোক না কেন তা লম্বালম্বি ভাবে করাতে ছেড়ে দিতে হবে। এর পর ছুন্নি (এক ধরণের হাতা) দিয়ে সেটি নেড়ে দিতে হবে বা ডিমের মতো করে হাতিয়ে নিতে হবে। কেউ যদি ইচ্ছা করেন তবে পাটিজোরা পিঠা বানানোর আগে পিঠার মধ্যে কলা, নারকেলসহ আরো অনেক উপাদান দিতে পারেন যাতে করে পিঠাটি খেতে সুস্বাদু হয়। এর পর পিঠা তৈরি হয়ে গেলে ছুন্নির সাহায্যে করা থেকে তুলে ঠান্ডা করে পরিবেশন করা হবে।

৩. কুসলি পিঠা

কুসলি অত্যন্ত স্বাদের একটি পিঠা। কথায় আছে যত গুড়, তত মিষ্টি। কুসলি সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে। যেমন, ভাজা কুসলি পিঠা ও ভেজানো কুসলি পিঠা।

কুসলি পিঠা বানানোর জন্যে প্রথমেই আলো চালের গুড়া সিদ্ধ করে নিতে হবে। সিদ্ধ করা হয়ে গেলে রুটি পিঠার মতো একটু মোটা করে বেলতে হবে। রুটি বানানো হয়ে গেলে একটির মধ্য থেকে গোলাকার করে আরও অনেকগুলো পিঠা তৈরি করতে হবে। জর্দ্দার কৌটার মুখ দিয়ে অনেক সময় এগুলো কাটা হয়। এরপর এর মধ্যে মাংসের টুকরা, ভুড়ি অথবা নরম হালুয়ার পুর দেওয়া হয়। যদি কেউ এই পিঠা ভেজে খেতে চান তবে তেলে ভেজে খাওয়া যায়। আবার কেউ যদি পিঠা ভিজিয়ে খেতে চান তবে খেজুরের রস অথবা দুধে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

নাটোর জেলার ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সারাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত ও সমাদৃত। নাটোরে রয়েছে খেজুর গুড়ের অপূর্ব সমাহার। শীতের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাটোরের খেজুর গুড়ের চাহিদা বেড়ে যায়। গ্রামের মানুষের ঘুম ভাঙ্গো গাইছ্যা (যারা খেজুরের গুড় সংগ্রহ করে)-দের হাঁক ডাকের মাধ্যমে। জনসংস্কৃতির পরিমন্ডলে যা কিছু ব্যবহার্য অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, নাটোর অঞ্চলে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। তারগ্রামের গাইছ্যারা ভোরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে ছিকা, বাইক (রস বাহন করার উপাদান) ও রস সংগ্রহ করার জন্যে পাতিল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রাতে কোরেতে (রস পড়ার পাতিল) রস পড়ে জমা হয়ে থাকে। গাইছ্যারা সেগুলি গাছ থেকে নামিয়ে বড়ো পাতিলে সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে আসে। এর পর ছাঁকনা দিয়ে তাদের তৈরি চুলাতে করার ওপর জ্বাল দিতে থাকে। অনেকক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পর রস লাল রং ধারণ করে। লাল রং ধারণ করলে সেটি আকা (চুলা) থেকে নামিয়ে ফর্মাতে ঢেলে একটি একটি করে শক্ত পাটালি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে।

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হলো, নাটোর জেলায় খেজুর গুড়ের পাশাপাশি আখের গুড়ের প্রাপ্যতাও রয়েছে। নাটোর সদরের একটি জায়গার নামই রয়েছে গুড়ের আড়ৎ। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে গুড়

www.pathagar.com

বিক্রি করতে আসেন। আবার ব্যপারিরাও আসেন গুড় ক্রয় করতে। এখান থেকে গুড় কিনে তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেগুলো বিক্রি করেন। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, নাটোরের প্রধান ফসল আখ। আখের গুড়ের সহজলভ্যতার পেছনে নাটোরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪. আচার

নাটোর জেলায় বিভিন্ন ধরণের আচার পাওয়া যায়। মৌসুম ভেদে এসব আচার তৈরি করা হয়ে থাকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য। যেমন, আমের আচার, তেঁতুলের আচার, বড়ইয়ের আচার, জলপাইয়ের আচার, কামরাঙার আচার প্রভৃতি।

নাটোরে প্রচলিত আচারগুলোর মধ্যে বরইয়ের আচার অন্যতম। বরইয়ের সহজলভ্যতাই এর কারণ। গাছ থেকে কাঁচা বরই সংগ্রহ করে প্রথমে শুকাতে হবে। বরই শুকানো হয়ে গেলে গুড় দিয়ে সেদ্ধ করে আবার রোদে শুকানো হয়। অবশেষে তাতে সরিষার তেল, জিরার গুঁড়া, পাঁচফোড়ন গুঁড়া, দিয়ে কাঁচের বয়ামে সংগ্রহ করতে হয়। সবশেষে মরিচের গুঁড়া বা ভাজা মরিচ আচারের সঙ্গে মেখে দিতে হবে।

আচারের প্রকারভেদের কথা বিবেচনা করে উল্লেখ করা যায় যে, এক ধরণের আচার আছে যেগুলোতে সরিষার তেল দেওয়া থাকে। আবার কোনো কোনো আচার আছে যা তেল ছাড়া বা শুধুমাত্র গুড়ের সঙ্গে চটকে নিয়ে তৈরি করতে হয়। সাধারণত মুড়ি, খিচুড়ি (চাল-তেলানি)'র সঙ্গে বা অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে এই আচার ব্যবহার করা হয়।

একই ভাবে এখানে নানারকম আমের আচারও তৈরি করা হয়।

৫. জিলাপি পিঠা

প্রথমে চালের আটা সিদ্ধ করে নিতে হবে। এরপর রুটি বানানো পিড়ির ওপরে হাত দিয়ে টিপে টিপে লম্বা ডেলা করতে হবে। এর পর আটার অংশ জিলাপির মতো প্যাঁচাতে হবে। প্যাঁচানোর পর সয়াবিন তেলে ভালোমতো ভেজে নিতে হবে। ভাজা ভাজা হওয়ার পর পিঠাগুলি তুলে দুধ, নারকেল কুড়া, গুড় অথবা চিনি দিয়ে তৈরি রসে ডুবাতে হবে। সাধারণত গ্রামের মহিলারা রাতে পিঠা ডুবিয়ে সকালবেলা পরিবারের সবাইকে পরিবেশন করেন।

৬. সিরিন্জ পিঠা

ফোকলোরের অনুসঙ্গগুলোর আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে ফোকালোরের বিভিন্ন উপাদানেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়ে থাকে। জিলাপি পিঠার একটি অন্যতম আধুনিক সংস্করণ বলা যায় সিরিন্জ পিঠাকে। সিরিন্জ পিঠা তৈরি করার জন্যে প্রথমে ময়দা, গুড় অথবা চিনি, একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এমনভাবে মেশাতে হবে যেন তা আঠালো হয়ে থাকে। একেবারে তরল হলে হবে না। মেশানোর পরে সেই মিশ্রণগুলি একটি সিরিন্জে করে (ইনজেকশান করার মোটা সূঁচ) তুলে নিতে হবে।

www.pathagar.com

সিরিনজে তোলার আগে অবশ্যই এটি ভালো করে ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর গুড় বা চিনি, ময়দা ও পানির দ্রবণটি করাতে ফুটন্ত সয়াবিন তেলের ওপর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ছেড়ে দিতে হবে যাতে দেখতে জিলাপির মতো হয়। পিঠাগুলো করা থেকে তুলে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করতে হবে।

আবার অনেক সময় শুধুমাত্র আটা, ময়দা ও পানি দিয়ে তৈরি পিঠা ঠাণ্ডা হওয়ার পর ওপরে চিনি ছড়িয়ে পরিবেশন করা হয়।

৭. নাটোরের ঐতিহ্যবাহী কাঁচাগোল্লা

বিল চলন, গ্রাম কলম, কাঁচা গোল্লার খ্যাতি
অর্ধ-ভূবনেশ্বরী রানি ভবানীর স্মৃতি
উত্তরা গণভবন রাজ-রাজন্যের ধাম
কাব্যে ইতিহাসে আছে নাটোরের নাম।

প্রকৃতির লীলাভূমি চলন বিল, বাংলার মহীয়সী শাসনকর্ত্রী মহারানি ভবানী, উত্তর বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ভবন উত্তরা গণভবন, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি জীবনানন্দের বনলতা সেন, শিকড়-সন্ধানী ঔপন্যাসিক শফিউদ্দীন সরদার, সবকিছু নিয়ে একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে নাটোর। কিন্তু এত কিছুর পরও নাটোরের নাম হলেই যে নামটি সকলের আগে মনে আসে তা হলো নাটোরের বিখ্যাত কাঁচা গোল্লা।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, নাটোরের ঐতিহ্যবাহী কাঁচাগোল্লা প্রায় দুই আড়াই'শ বছরের পুরনো সুস্বাদু মিষ্টি। কাঁচাগোল্লা সৃষ্টির কাহিনি তথ্যের অভাবে উদ্ধার করা কষ্টকর হলেও জনশ্রুতি আছে নিতান্তই দায়ে পড়ে এই মিষ্টি তৈরি করা হয়েছিল। কাহিনিটি আজ গল্পের মতো শোনা গেলেও তা আদৌ গল্প নয়, জানালেন নাটোর শহরের লাল বাজারের দ্বারিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কর্মরত কয়েকজন বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা ব্যবসায়ী। তাদের মতে—১৭৪০ থেকে ১৭৫০ সালের দিকে নাটোর শহরের লালবাজার এলাকায় মধুসূদন দাসের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ছিল একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান। দোকানে বেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো চুলা ছিল। এসব চুলায় মধুসূদন দাস প্রতিদিন দেড় থেকে দুই মণ ছানা দিয়ে রসগোল্লা, পানতোয়া, চমচম প্রভৃতি মিষ্টি তৈরি করতেন। দোকানে কাজ করত ১৫ থেকে ২০ জন কর্মচারী। হঠাৎ একদিন দোকানে কোনো কর্মচারী না আসায় এত ছানা দিয়ে কি হবে, এই ভেবে মধুসূদনের অবস্থা খারাপ হওয়ার দশা। ছানাগুলো নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে চিনির রসে ঢেলে জ্বাল দিয়ে নামিয়ে রাখলেন মধুসূদন। এরপর দেখা গেল ছানাগুলো প্রচন্ড রকমের সুস্বাদু হয়েছে। নতুন মিষ্টির নাম কি হবে তা নিয়ে শুরু হলো চিন্তা ভাবনা। যেহেতু চিনির রসে ডোবানোর আগে কিছুই করতে হয়নি এবং এতে কোনো রস নেই তাই এ মিষ্টির নাম দেওয়া হলো কাঁচাগোল্লা। রসগোল্লা, পানতোয়া, সন্দেশ, চমচমকে হার মানিয়ে দিলো এই কাঁচাগোল্লার স্বাদ। ধীরে ধীরে ক্রেতারা কাঁচাগোল্লার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল।

www.pathagar.com

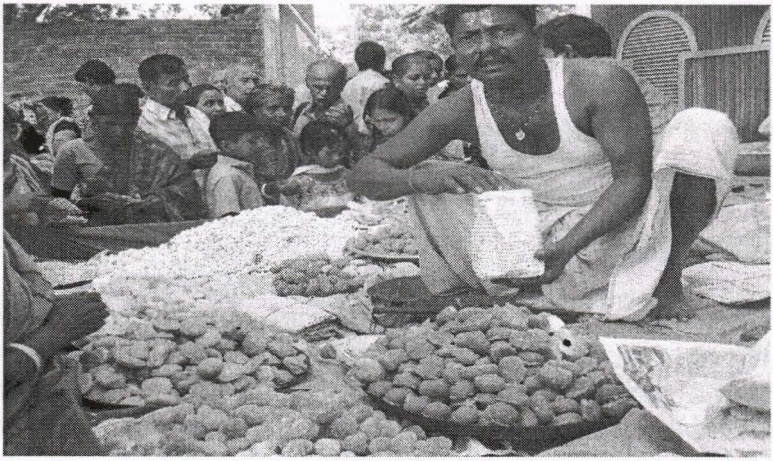

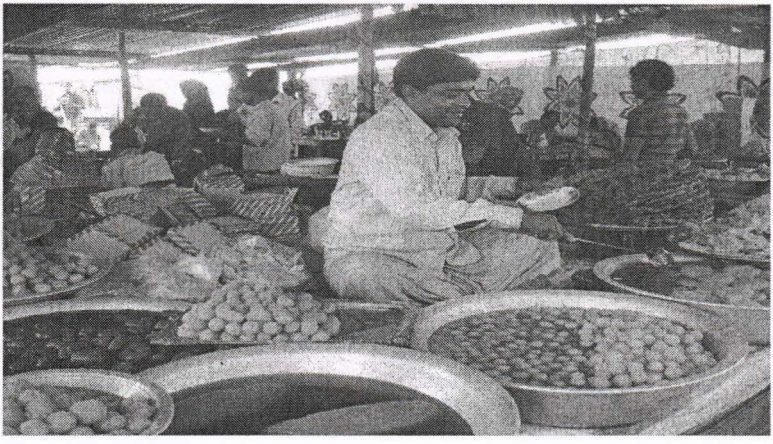

লোকখাদ্য (কাঁচাগোল্লা ও বিভিন্ন রকম মণ্ডা-মিঠাই)

নাটোরের কাঁচাগোল্লা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারিগররা বলেন—

প্রথমে দুধ থেকে ছানা তৈরি করতে হয়। ছানা পরিষ্কার কাপড়ে রেখে শক্ত করে চাপতে হবে যাতে পানি না থাকে। ৭ কেজি দুধ থেকে পাওয়া যাবে ১ কেজি ছানা এবং এক কেজি ছানার জন্যে ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট চিনির রস জ্বাল দেওয়ার পর ছানাগুলো রসে ঢেলে দিতে হবে। এরপর আবার ৩০ থেকে ৪০ মিনিট জ্বাল দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে। সুগন্ধের জন্যে এলাচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে। ব্যাস এভাবেই তৈরি হয়ে গেল কাঁচাগোল্লা।

www.pathagar.com

সময়ের ব্যবধানে এখন এই কাঁচাগোল্লার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি কেজি কাঁচাগোল্লার দাম এখন ২৪০ টাকা। বর্তমানে কাঁচাগোল্লার দোকানের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। জিনিসপত্রের অত্যধিক দাম এবং কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে এই পেশা ছেড়ে অনেকে অন্য ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন। নাটোর শহরে আদি নিমতলা স্টেশন বাজার ও লালবাজারে দুই তিনটি কাঁচাগোল্লার দোকান লক্ষ্য করা যায়। এখন কাঁচাগোল্লার দোকানের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন– বর্তমানে কম দামের ভেজাল কাঁচাগোল্লা বিক্রি করে হকাররা। এছাড়াও কিছু অসাধু মুনাফালোভী মিষ্টি ব্যবসায়ীর কারণে আজ ঐতিহ্যবাহী কাঁচাগোল্লার এই দূরবস্থা।

তবে এখনও কেউ কেউ তাদের ঐতিহ্যবাহী কাঁচাগোল্লার ব্যবসা ধরে রেখেছেন। ভবিষ্যতেও এ ধারাটি টিকিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন তারা। তাদের দোকানে ৫ থেকে ৬ জন করে কর্মচারী কাজ করছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসাথে এই পেশায় জড়িত রয়েছে এবং সব ধর্মাবলম্বী মানুষ তাদের দোকান থেকে কাঁচা গোল্লা ক্রয় করছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে দূর-দূরান্ত থেকে গ্রাহক এসে তাদের প্রয়োজনীয় অংশটুকু কিনে নিয়ে যান। এমন একজন ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু। তারা ৫ পুরুষ ধরে এই ব্যবসা ধরে রেখেছেন। তাদের জনপ্রিয়তা নাটোর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

কাঁচাগোল্লা ব্যবসায়ীরা চান তাদের বাপ-দাদার এই পেশাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে। এ জন্যে অসাধু ব্যবসায়ী ও কাঁচাগোল্লা বিক্রেতা হকারদের বিরুদ্ধে যেন সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সেই সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এটাই তাদের দাবি। শুধুমাত্র তাহলেই নাটোরের ঐতিহ্যবাহী কাঁচাগোল্লা টিকে থাকবে প্রতিটি মানুষের রস আস্বাদনের উপযোগী সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে।

তথ্যসহায়ক

১. রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, পিতা : ননী গোপাল কুণ্ডু, বয়স : ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি, পেশা : মিষ্টি ব্যবসায়ী (মালিক), গ্রাম : লালবাজার, পোস্ট : নাটোর, থানা : নাটোর সদর

২. তিমির কুমার কুণ্ডু, পিতা : তারকেশ্বর কুণ্ডু, বয়স : ৬২ বছর, কাজের অভিজ্ঞতা : ২০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : মিষ্টি ব্যবসায়ী (কর্মচারী), গ্রাম : লালবাজার, থানা : নাটোর সদর

৩. জরিনা বেগম, স্বামী : মো. আইজ উদ্দিন প্রাং, গ্রাম : চৌধুরীপাড়া, পোস্ট : বৈদ্যবেলঘড়িয়া, থানা : নাটোর, বয়স : ৫০ বছর, পেশা : গৃহিনী

৪. মোছা. হাজেরা বেগম, স্বামী : আ. সোবহান প্রাং, গ্রাম : বিল হালতি, পোস্ট : খোলাবাড়িয়া, থানা : নলডাংগা, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৬৭ বছর

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

পরিশীলিত ক্রীড়ার বাইরে লোকমানসের মাঝে গ্রামীণ সমাজে যে খেলাগুলো প্রচলিত আছে আমরা তাকে লোকক্রীড়া বলে অভিহিত করতে পারি। গ্রামের সাধারণ মানুষ চিত্ত বিনোদন করতে খেলাধুলাকেই আশ্রয় করে থাকেন। কাজের ফাঁকে সামান্য আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে তারা একে অপরের সঙ্গে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করেন।

সমগ্র দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাটোর জেলাতেও বেশ কিছু লোকক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ও হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির প্রবাহমানতাকে টিকিয়ে রাখতে লোকক্রীড়াগুলো আজও আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

নাটোর জেলার খেলাগুলোকে মূলত ২টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, স্থলের খেলা ও জলের খেলা।

এর বাইরে অন্তরীক্ষের খেলার কথা আলাদা ভাবে বলা যায়। তবে অন্তরীক্ষের খেলা বলতে এখানে ঘুড়ি খেলা বা ঘুড়ি ওড়ানো ছাড়া আর কোনো খেলা খুব একটা দেখা যায় না।

১. বদন খেলা

নাটোর জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী লোকক্রীড়া হলো বদন খেলা। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বা সাধারণ ভাবে আনন্দ উপভোগ ও চিত্তবিনোদনের জন্যে বদন খেলার আয়োজন করা হয়।

খেলোয়াড় সংখ্যা : বদন খেলায় ৫, ৭, ৯ বা ১১ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে পারে। স্থান সঙ্কুলানের ভিত্তিতে খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। খেলার স্থান যত বড়ো হবে খেলোয়াড়ের সংখ্যাও তত বেশি হবে। দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে খেলাটি খেলতে হয় এবং প্রতিটি দলে বেজোড় সংখ্যক খেলোয়াড় থাকা বাধ্যতামূলক।

খেলার স্থান : স্কুল মাঠে, বাড়ির বাইরের আঙিনা অথবা ধান কাটার পর ধানের জমিতে দাগ কেটে বদন খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলার নিয়মকানুন : বদন খেলায় একটি ঘর থাকে। প্রথমে একদল খেলোয়াড় ঘরের মধ্যে থাকে। তির ও লবনিকে ফাঁকি দিয়ে তারা ঘরের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে। তির ও লবনি তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করে। ঘরের খেলোয়াড় যদি বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে তবে তাদের মধ্যে দুজন খেলোয়াড় আগের ঘরে ফিরে আসে পাকি হিসেবে। প্রথমে তারা যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল পুনরায় পাকি দুজন সে ঘরে ফিরে আসার চেষ্টা করে। যদি তারা সফল হয়, তবে বদন বলে বিবেচিত হবে। অতএব যারা ছান্দবে বা আটকাবে তাদের ঘারে একটি বদন হবে। খেলাটি একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে এভাবেই চলতে থাকে।

www.pathagar.com

নাটোরের ঐতিহ্যবাহী এ খেলাটির মাধ্যমে সুসংহত হয়ে অন্যকে প্রতিহত করার বিষয়টি ফুটে উঠে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জোর যার মুলুক তার বিষয়টিকে মাথায় রেখে একে অন্যের ঘরে ঢুকতে চাওয়াই এ খেলার কৌশল। কিন্তু তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা থাকে অন্য দলের খেলোয়াড়দের মাঝে।

২. ফুৎলরি খেলা

জেলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে যে খেলাগুলো ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তার মধ্যে ফুৎলরি খেলা অন্যতম। গ্রামের ছোটো ছেলেরা স্কুলে আসে বা স্কুল ছুটির পর বাড়ির উঠানে, বাগানে বা ফাঁকা জমিতে ফুৎলরি খেলার আয়োজন করে।

ফুৎলরি খেলার উপকরণ : বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি এক বিঘত সমান লম্বা লরি/(লাঠি)।

খেলার নিয়ম: ফুৎলরি খেলায় প্রথমেই হাত রেখে চোর নির্ণয় করা হয়। এরপর যে রাজা হয় সে লড়ির সাহায্যে গর্তে রাখা ফুৎটি অনেক দুরে পাঠানোর চেষ্টা করে। সামনে দাঁড়ানো চোর যদি ফুৎটি ধরতে পারে তবে রাজা চোরে পরিণত হয় আর যদি কেউ ধরতে না পারে তবে আর কেউ গর্ত করে ফুৎটি ছুঁড়ে মারে আর রাজা লড়ি দিয়ে আবার ফুৎ ছুড়ে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে সে তার ডান্ডা বা লড়ি দিয়ে দুরত্ব পরিমাপ করে গুনতে থাকে এবং একসময় ৫০ ঘর পূর্ণ হলে এক গেম হয়। এভাবেই খেলাটি সামনের দিকে এগুতে থাকে।

৩. টিপুখেলা

টিপু খেলা শুরুর প্রাক্কালে হাত বেটে রাজা ও চোর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

উপকরণ : খোলা টেনিসবল বা বাতাবি লেবু।

খেলার নিয়মকানুন : সাতটি খোলা স্তুপ আকারে সাজানো থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরিমান দুরত্ব থেকে টেনিসবল অথবা বাতাবি লেবু দিয়ে সেই স্তুপটি ভাঙার চেষ্টা করতে হবে। যদি কোনো খেলোয়াড় এই খোলার স্তুপটি ভাঙতে পারে তবে সে তা পাহাড়া দেবে যেন বাকি খেলোয়াড়রা তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে না পারে। আর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে তাকে টেনিস বল বা বাতাবি লেবু দিয়ে আঘাত করা হয়।

অন্যদিকে বিপরীতপক্ষের খেলোয়াড়েরা চেষ্টা করে খোলার স্তুপটি পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যদি তারা খোলাগুলোকে পূর্বের অবস্থানে স্তুপাকারে সাজাতে পারে তবে সকলে টিপু বলে চিৎকার করে ওঠে এবং এর ফলে তারাই বিজয়ী ঘোষিত হয়।

৪. পাতা আনা খেলা

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে ছোটো বাচ্চাদের আনন্দ দানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পাতা আনা খেলা বেশ জনপ্রিয়। পাতা খেলার জন্যে খুব অল্প জায়গার

www.pathagar.com

প্রয়োজন হয়। তাই বাড়ির আঙিনায়, ক্ষেত-খামারে এই খেলা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। পাতা খেলার উপকরণ হিসেবে তেমন কিছুর প্রয়োজন হয় না। একটি বৃত্ত আঁকতে হয় পাতা লুকানোর জন্যে এবং খেলোয়াড়ের জায়গা নির্ণয় করার জন্যে।

খেলার নিয়মকানুন : যে চোর হয় সে থাকে বৃত্তের বাইরে। বাকি সকল খেলোয়াড় থাকে বৃত্তের মধ্যে। এদের মধ্য থেকে বৃত্তের ভেতরে থাকা একজন খেলোয়াড় বলবে–

আতা পাতা কিসের পাতা?

তখন যে চোর সে তার ইচ্ছে মতো, বা হাতের কাছে যে সকল গাছের পাতা দেখা যায় সেই পাতাগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটি গাছের পাতা নিয়ে আসতে বলবে।

আতা পাতা কলারপাতা
আতা পাতা জামিরের পাতা

বৃত্তের মধ্যে অবস্থানকারী খেলোয়াড়েরা দৌড়ে গিয়ে কলার পাতা বা অন্য কোনো গাছের পাতা নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, একদমে সেই পাতা নিয়ে আসতে হবে। কিত্ কিত্ কিত্ কিত্, বা চি ই ই ই ই ই... এই রকম দম দিয়ে পাতা সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহ করে নিয়ে আসার পর যখন বিভিন্ন ধরনের পাতার অংশ জড়ো হবে তখন প্রতিটি খেলোয়াড় ঘরের বৃত্তে সেগুলো লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। যে চোর থাকে সে প্রতিটি বৃত্তে গিয়ে সেই লুকনো পাতা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে। যদি সে বৃত্তের মধ্যে লুকনো পাতা খুঁজে বের করতে পারে তবে চোর বদনাম থেকে অব্যহতি লাভ করবে।

৫. রান্না রান্না খেলা

গ্রামের ছোটো শিশুরা আনন্দ উপভোগের জন্যে নিজেরা বিভিন্ন ধরণের খেলা উদ্ভাবন করে থাকে, তেমনি একটি খেলা হলো রান্না রান্না খেলা। কল্পিত হাঁড়ি-পাতিল, তরি-তরকারি রান্না করার অভিনয়– এ সবের মাধ্যমে এ খেলাটি চলতে থাকে। এই খেলার মৌলিক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয় মাটির তৈরি হাড়ি-পাতিল, বিভিন্ন ধরনের লতা-পাতা, মাটির গুঁড়া ইত্যাদি।

মাটিতে গর্ত করে প্রথমেই আকা (চুলা) তৈরি করা হয়। এরপর এতে মাটির হাড়ি-পাতিল তুলে দিতে হয়। পাতিল তুলে দেওয়ার পর আকায় জ্বাল দেওয়ার মতো করে ছোটো ছোটো খড়ি ঠেলে দেওয়া হয় এবং পাতিলের মধ্যে চাল হিসেবে মাটির গুঁড়া ও তরকারি হিসেবে লতা-পাতা ছোটো ছোটো বা কুচি কুচি করে কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। রান্না করা হয়ে গেলে সেগুলো একটি কলার পাতায় নামিয়ে রাখা হয়। এরপর আগত অতিথিদের মধ্যে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়। এভাবে রান্না রান্না খেলার সমাপ্তি ঘটে।

৬. দড়িখেলা

পরিশীলিত ক্রীড়ার পাশাপাশি লোকক্রীড়া হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই দড়ি খেলার প্রচলন রয়েছে। গ্রামের মেয়েরা তাদের ইচ্ছেমতো এই খেলাটি খেলে

www.pathagar.com

থাকে। বিশেষ করে কোনো আচার-অনুষ্ঠান বা বিশেষ দিনগুলোতে স্কুলের মাঠে, বাড়ির আঙিনায় দড়ি খেলার আয়োজন করা হয়।

দড়ি খেলার উপকরণ হিসেবে শুধুমাত্র একটি লম্বা দড়ির প্রয়োজন হয় যাতে 'তাহল' হিসেবে এক ধরনের গিট বাঁধা থাকে। বর্তমান সময়ে আমরা দেখি বাণিজ্যিকভাবে দড়িখেলার দড়িগুলো তৈরি করা হচ্ছে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নাটোর জেলার ৪০ নং বিপ্রবেলঘড়িয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবছর দড়ি খেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত খেলায় প্রায় ১৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা নিয়ে দড়ি খেলতে থাকে। এই খেলার নিয়ম হলো দড়ি মাথার ওপর দিয়ে এবং পায়ের নিচ দিয়ে অবিরত ঘুরাতে হবে। এভাবে ঘুরাতে ঘুরাতে যার দড়ি মাথা বা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে-যাবে সে মারা পড়বে। যে অবিরত এই দড়ি মাথা ও পায়ের ওপর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুরাতে পারবে সেই বিজয়ী বলে গণ্য হবে। দড়ি খেলায় কোনো সময়ের বাধ্যবাধকতা থাকে না।

৭. চারগুটি খেলা

অতি অল্প পরিসরে এবং সময় কাটানোর অন্যতম উপভোগ্য মাধ্যম হিসেবে নাটোর জেলার ছোটো বাচ্চা থেকে শুর করে বয়স্ক লোকেরাও চারগুটি বা চারঘুট খেলা খেলে থাকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে সবার হাতে যখন অখণ্ড অবসর থাকে, তখন ঘরের মেঝেতে বসে, বারান্দায় বসে এই খেলাটি খেলা হয়।

চারগুটি খেলার উপরকরণ হিসেবে চারটি গুটি বা চারটি কড়ির দরকার হয়। বিশেষ করে খেজুরের আঁটি সংগ্রহ করে তার মধ্যে দুটি ভাগ করে গুটি তৈরি করা হয়। এই খেলা খেলতে মোট চারটি গুটির প্রয়োজন পরে। খেলার নিয়মকানুনের মধ্যে দেখা যায় প্রথমেই চোর ডাকাত নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গুটি চালায় সবাই। এদের মধ্যে যার গুটি একসঙ্গে সমতল আকারে পড়বে সেই প্রথমে দান চালাবে। এভাবে দান চালানোর এক পর্যায়ে যদি দুটি গুটি সমতল ভাবে আর দুটি গুটি অসমতল ভাবে পড়ে তবে একটি গুটি দিয়ে অন্য একটি গুটিকে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। যদি লাগে তবে সে পয়েন্ট পাবে। এভাবে দুই জন বা চারজন একত্রে এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলার পয়েন্ট ধরা হয় ৫০ কিংবা ১০০। যে প্রথমে নির্ধারিত পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে সেই বিজয়ী বলে গণ্য হবে।

৮. বালিশ খেলা

গ্রাম বাংলার মেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা হলো বালিশ খেলা। বালিশ অন্যের চোখ এড়িয়ে কিভাবে নিরাপদে রাখা যায় তারই একটি পরীক্ষামূলক খেলা হলো বালিশ খেলা। নাটোর জেলার সদর থানায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বালিশ খেলার আয়োজন করা হয়।

বালিশ খেলার উপকরণ হিসেবে একটি বালিশ বা বালিশ সদৃশ্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয়। বালিশ খেলায় খেলোয়াড়দেরকে প্রথমেই গোল হয়ে বসতে হয়। এর

www.pathagar.com

পর যথা নিয়মে খেলা শুরু হয়। খেলার একজন বিচারক বা রেফারি থাকেন যিনি খেলাটি পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি খেলাটি দেখতে পারেন না। যখন বিচারক বা রেফারি বাঁশিতে ফুঁ দেবেন তখন খেলোয়াড়রা একে অন্যের দিকে বালিশটি ছুড়ে মারবেন। এভাবে সবাই একে অন্যের দিকে বালিশ নিক্ষেপ করতে থাকবেন। হঠাৎ করে এর মধ্যে বিচারকের বাঁশি বাজবে। বাঁশি বাজানো অবস্থায় বালিশটি যার কাছে থাকবে সে মারা যাবে বা বাতিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এরকম করেই খেলাটি সামনের দিকে এগুতে থাকবে এবং একসময় এসে প্রতিদ্বন্দী যখন মাত্র দুজন থাকবে তখন রেফারি বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাদের খেলার সুযোগ করে দেবেন এবং হঠাৎ করে বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামিয়ে দেবেন। সর্বশেষ যার হাতে বালিশ থাকবে সে মারা যাবে এবং যার হাতে বালিশ থাকবে না সে বিজয়ী বলে বিবেচিত হবে।

৯. তেলবাঁশ খেলা

ছোটো বেলায় আমরা সবাই মোটামুটি বানরের তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার অংকটি করেছি। ধারণা করা হয় তেলবাঁশ খেলার ধরণ নিয়েই অংকটি প্রণীত হয়েছিল। খেলাটি অত্যন্ত পুরনো এবং আনন্দদায়ক একটি খেলা হিসেবে বিবেচিত।

এই খেলার উপকরণ হিসেবে দরকার হয় একটি বাঁশ যেটি খুব তৈলাক্ত থাকে আর সাধারণত বাঁশের আগায় একটি কলা বা লোভনীয় কোনো বস্তু বেঁধে রাখা হয়। খেলার নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিটি খেলোয়াড়কে খালি গায়ে থাকতে হবে, অর্থাৎ গায়ে কোনো রকমের জামা, গেঞ্জি থাকবেনা। শুধু মাত্র লুঙ্গি বা হাফপ্যান্ট পরে খেলাটি খেলতে হয়। আবার খেলা শুরুর আগে প্রতিটি খেলোয়াড়ের হাত পরীক্ষা করে নেওয়া হয় যাতে করে তারা হাতে মাটি বা বালু ঘষে নিতে না পারে। খেলাটিতে একটি মাত্র টার্গেট থাকে যে, বাঁশের আগায় ঝুলানো কলা বা লোভনীয় বস্তুটিকে পেড়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রথম দিকে বাঁশটি তেল-মবিল দিয়ে প্রচণ্ড পিচ্ছিল করে দেওয়া হয় যার দরুন খেলোয়াড়েরা খুব সহজে সেখানে উঠতে পারে না কিন্তু বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর বাঁশটি বেশ ওঠার উপযোগী হয়ে ওঠে। তখন খুব সহজেই একজন খেলোয়াড় বাঁশের মাথায় উঠতে পারে এবং কলা বা লোভনীয় বস্তুটি পেড়ে আনতে পারে। যে ব্যক্তি বা খেলোয়াড় সেই বস্তু পেড়ে আনতে পারবে সেই বিজয়ী হবে।

১০. খোলাকাচ্চি গাজি গাজি খেলা

নাটোর জেলার লোকক্রীড়াগুলির মধ্যে যে সকল খেলায় বৃত্তের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় খোলকাচ্চি গাজি গাজি তার মধ্যে অন্যতম একটি। পরিশীলিত ক্রীড়ার বাইরে লোকক্রীড়ার নিয়ম ধরে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খোলাকাচ্চি গাজি গাজি খেলার উপকরণ হিসেবে খোলা বা হাড়ি-পাতিলের ভাঙা অংশ ব্যবহার করা হয়। এই খেলায় মাটিতে প্রথমেই দুটি বৃত্ত অংকন করতে হবে। এরপর একটি খোলা এক পা দিয়ে এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে নিয়ে যেতে হবে এবং এই খোলা এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে নিয়ে যাওয়ার সময় ছড়া কাটতে হবে–

www.pathagar.com

খোলাকাচ্চি গাজি গাজি
হাঁসের ডিম তেলে ভাজি
ঘুঘুর ডিম ঘিয়ে ভাজি
সইয়ের বাড়ি যাব চা বিস্কুট খাব
সইয়ের বাড়ি যাব না চা বিস্কুট খাব না
বাড়ির পাশে পাট বুনেছি পাটের পাশে কি দেখেছি বেজি দেখেছি, বেজি দেখেছি

খোলাটি নিয়ে যেতে যেতে যদি খেলোয়াড়ের দুই পা মাটিতে পড়ে যায় বা খোলাটি দাগ স্পর্শ করে তবে ঐ খেলোয়াড় মারা যাবে। অন্য খেলোয়াড় দান পাবে। এভাবেই খেলাটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

১১. চোর ডাকাত পুলিশ খেলা

চোর ডাকাত পুলিশ খেলা নাটোর জেলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা বলে বিবেচিত। এই খেলাটি বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও হয়ে থাকে কিন্তু তার ধারা নাটোর জেলার চেয়ে একটু ব্যতিক্রম বা আলাদা বলে বিবেচিত।

চোর ডাকাত পুলিশ খেলার উপকরণ হিসেবে চারটি কাগজের টুকরা, কাগজ ও কলমের প্রয়োজন হয়। খেলার নিয়ম-কানুন হিসেবে বলা যায়, প্রথমেই কাগজে চারটি দাগ করে চারজন খেলোয়াড়ের নাম বা নামের প্রথম অক্ষর লিখে রাখতে হয় যাতে করে তাদের স্কোর লিখে রাখতে সুবিধা হয়। এরপর খেলা শুর হয়। ৪টি কাগজের প্রতিটিতে সাহেব ১০০, পুলিশ ৮০, ডাকাত ৬০, চোর ৪০ লেখা থাকে। খেলা শুরুর প্রাক্কালে কাগজ চারটি শূন্যে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তরিঘড়ি করে প্রত্যেকে একটি করে কাগজ তুলে নেয়। যে ১০০ লেখা টুকরা পায় সে হয় সাহেব, যে ৮০ লেখা টুকরা পায় সে হয় পুলিশ, যে ৬০ লেখা টুকরা পায় সে হয় ডাকাত আর সর্বশেষ যে ৪০ লেখা টুকরা পায় সে চোর বলে বিবেচিত হয়। যে যত পয়েন্ট পাবে তার নামের পাশে সেই পয়েন্টগুলো লেখা থাকবে। এভাবে ২০ থেকে ৩০ বার খেলার পর সবার পয়েন্ট একত্রে যোগ করে যার পয়েন্ট বেশি হবে তাকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

১২. হাঁড়িভাঙা খেলা

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে হাঁড়িভাঙা খেলা ব্যাপক জনপ্রিয়। অতি সহজেই এই খেলাটি খেলা যায়।

খেলার উপকরণ হিসেবে একটি লাঠি ও হাড়ির প্রয়োজন হয়।

দেশের অন্যান্য জায়গার মতো নাটোর জেলাতেও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হাড়ি ভাঙা খেলার আয়োজন করা হয়। এই খেলায় একটি দাগ কাটা হয় এবং সেই দাগ থেকে নির্দিষ্ট দুরত্বে একটি হাঁড়ি রাখা হয়। দাগের ওখানে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়কে চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। শুধু চোখ বেঁধে নয়, চোখ বাঁধার পর তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং হাঁড়িটি ভাঙার জন্যে সামনের দিকে নির্দেশ করা হয়। লাঠি নিয়ে খেলোয়াড় যখন সামনের দিকে এগুতে থাকে তখন চারদিকের দর্শকেরা নানা

www.pathagar.com

রকম টিকা-টিপ্পনি কাটতে থাকে। এর মধ্যে দুই একজন খেলোয়াড় তাদের তাল হারিয়ে ফেলে। সে যে অবস্থান সঠিক মনে করে তাতে লাঠিটি দিয়ে সপাটে আঘাত করে। বেশির ভাগ সময় তার লক্ষ্য অভেদ্য হয় না। হঠাৎ করে কিংবা সঠিক গণনা করে কেউ এগুলে সে হাঁড়িটি ভাঙতে সক্ষম হয়। যে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাঁড়িটি ভাঙতে পারে সেই বিজয়ী বলে বিবেচিত হয়।

১৩. টুনটুনি পাখি খেলা

টুনটুনি পাখি খেলায় নারী-কেন্দ্রিক সমাজ-বাস্তবতার বিভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। অনেকে বলেন নারী-কেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাধা বিপত্তির মুখে টুনটুনি পাখি খেলাটি সমাজ বাস্তবতার বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

এই খেলার শুরতেই হাত কেটে (ভাগ করে) চোর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। চোর হাত সোজা করে (দু দিকে ছড়িয়ে) বসে থাকে। চোরের হাতের ওপর দিয়ে সবাইকে ছড়া কেটে এগিয়ে যেতে হবে-

টুনটুনি পাখি নাচতো দেখি
না বাবা নাচব না পড়ে গেলে
বাঁচবো না
বড়ো আপুর বিয়ে কসকো সাবান দিয়ে
কসকো সাবান ভালো না
আপুর বিয়ে হলো না।

যাওয়ার সময় যদি চোরের হাতের সঙ্গে কারও পা স্পর্শ করে বা ছড়া কাটার সময় ছন্দ পতন হয় বা দম চলে যায়, তবে সে মারা যাবে এবং চোরে পরিণত হবে। এভাবেই খেলাটি সামনের দিকে এগুতে থাকবে।

১৪. ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলা

বাঙালি সমাজে লোকক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে যে সকল খেলার কথা বলা হয় ওপেনটি বায়োস্কোপ তার মধ্যে অন্যতম। নাটোর জেলার গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলার প্রচলন রয়েছে। ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলায় দুজন বালক বা বালিকা হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং ছড়া কাটতে থাকে–

ওপেনটি বায়োস্কোপ
নাইন টেন টেইসস্কোপ
চুল টানা বিবিআনা
সাহেব বাবুর বৈঠক খানা
পান আনতে গিয়েছিলাম
পানের উপর মরিচবাটা
ইসপিরিংয়ের চাবি আটা।

www.pathagar.com

যার কাছে এসে ছড়া কাটা শেষ হবে সেই জন আটকা পড়বে যারা হাত উঁচু করে ছিল তাদের কব্জির মধ্যে। ফলে সে দাঁড়িয়ে থাকবে অন্য কাউকে ধরার জন্যে।

১৫. লাট্টু বা লাটিম খেলা

প্রতিটি জনপদের মতো নাটোরেও লাটিম খেলা বেশ জনপ্রিয়। খুব কম লোকই আছে যারা ছোটো বেলায় খেলাটি খেলেননি বা দোকান থেকে কিনে অথবা বাড়ির বড়োদের সাহায্য নিয়ে লাটিম তৈরি করে খেলেন নি। তিনি কখনও লাট্টু দোকান থেকে কিনে খেলতেন আবার কখনও বা তার বাবা বা বড়ো ভাইয়ের কাছে বানিয়ে নিয়ে লাট্টু খেলতেন।

লাট্টু বানানোর জন্যে সবরির কাঠ (পেয়ারা কাঠ) সবচেয়ে ভাল বলে মনে করা হয়। প্রথমে একটি লাট্টু গর্ত করে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। তারপর সেই লাট্টুকে নিশ (লক্ষ্য) করে অন্যান্যরা মারতে থাকে। যে সবার চেয়ে বেশি সেই লাট্টুটিকে ফুটো করতে পারবে সেই বিজয়ী বলে গণ্য হবে। লাট্টু খেলতে গিয়ে অনেক সময় এটি ভেঙে যেতে পারে। আবার অনেক সময় পাশের ছেলে মেয়েরা আহত হয় এই খেলাটি খেলতে গিয়ে।

১৬. কানামাছি খেলা

কাউকে অন্ধ কল্পনা করে এই খেলাটি খেলা হয়ে থাকে। কানামাছি খেলার শুরুতেই তাই বেটে অর্থাৎ ভাগ করে কে চোর তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এরপর যে চোর হবে গামছা বা অন্য একটুকরো কাপড় নিয়ে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হবে। চোর একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করবে। অন্য খেলোয়াড়রা তার চার পাশে ঘুরবে এবং চোরকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করার চেষ্টা করবে। উত্যক্ত করার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ধরনের ছড়া কাটবে–

মামা মামা মাছ ধরছি
কি মাছ?
বোয়াল মাছের নাম কি?
এর পর যাকে ধরবে তার নাম বলবে।
কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
যারে পাবি তারে ছোঁ।

ছড়াটি কাটার সময় চোর যদি কোনো খেলোয়াড় কে ধরে ফেলে তবে সে চোর বলে গণ্য হবে। কানামাছি খেলার চোর সব সময় অত্যন্ত হুমকির মধ্যে থাকে। যতক্ষণ সে অন্য কাউকে চোর বানাতে না পারে ততক্ষণ সে স্বস্তি পায় না। একজনের পর আরেকজন চোর হয় তারপর আরেকজন, এভাবেই খেলাটি সামনের দিকে এগুতে থাকে।

www.pathagar.com

১৭. বদি খেলা

বদি খেলা মূলত নদী বা পুকুরের মধ্যে খেলতে হয়। অর্থাৎ এ খেলা খেলতে হলে সাঁতার জানতে হবে খুব ভালোমত। প্রথমে হাত বেঁধে চোর নির্ণয় করার পর বদি খেলা শুর হয়। চোর থেকে অন্যান্য খেলোয়াড়েরা একটু দূরে অবস্থান করে। চোরের কাজ হলো পানির মধ্যে অন্য খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দেওয়া।

বদি খেলায় অংশগ্রহণকারীরা চোরের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে বদি বলে জলের মধ্যে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকে। চোরের কাজ হলো সাঁতরে গিয়ে সেই খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দেওয়া। যদি চোর অন্য কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁতে পারে তবে যাকে ছুঁবে সে চোর বলে বিবেচিত হবে। খেলাটি এভাবেই সামনের দিকে এগুতে থাকবে।

১৮. পাইত খেলা

নাটোর জেলার সদর থানার মানুষের কাছে যে কটি অতি প্রিয় খেলা রয়েছে তার মধ্যে পাইত খেলা অন্যতম। এই খেলা অতি অল্প জায়গায় ক্ষুদ্র পরিসরে হয়। এমন কি যে বেঞ্চে মানুষ বসে থাকে সেই বেঞ্চে দাগ কেটে এই খেলাটি খুব সহজেই খেলা যায়। এই খেলাটি খেলতে দুই ধরনের গুটি বা দুই ধরনের কাঠির প্রয়োজন হয়। সারিবদ্ধ ভাবে তিনটি করে গুটি সাজাতে হয়। সাজানোর পর দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন খেলোয়াড়কে গল (চাল) দিতে হয়। প্রথম খেলোয়াড় তার ইচ্ছামত চাল দেওয়ার পর অন্য খেলোয়াড় চাল দেয়। এভাবে চাল দিতে দিতে যার গুটি প্রথমে সারিবদ্ধভাবে মিলে যাবে সে তার প্রতিপক্ষের ঘরে একটি পাইত দেবে। তার প্রতিপক্ষ যদি একই রকম ভাবে আবার সারিবদ্ধ ভাবে গুটিগুলো মেলাতে পারে তবে সে পাইত পরিশোধ করবে।

১৯. স্টার খেলা

অনেকটা পাইত খেলার মতোই হলো স্টার খেলা। পাইত খেলায় গুটিগুলো সোজাসুজি চালনা করতে হয় আর স্টারে গুটিগুলো আড়াআড়িভাবে বা কোনাকুনিভাবে চালনা করতে হয়। স্টার খেলার সময় বিভিন্ন ধরনের ছড়া কাটা হয়-

আকাশে তিন তারা
আমার নাম জাহানারা
আমি কি জানি
ঠাণ্ডা লেবুর পানি
চপচপ আলুর চপ
ট্যাংরা মাছের ল্যাংরা হপ।

স্টার খেলাতেও দুই ধরনের গুটির প্রয়োজন হয়। গুটিগুলো প্রথমে অগোছালো থাকে। এরপর সেগুলোকে দান চালানোর মাধ্যমে কোনাকুনিভাবে সঠিক মাপে বা কোনো আকৃতিতে ফেলার চেষ্টা করা হয়ে থকে। যদি তিনটি করে গুটি কোনাকুনি ভাবে বা আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন করা যায় তবে গেম (বিজয়ী) হয়।

www.pathagar.com

২০. গুলি খেলা

দেশের মানুষ যেটি মার্বেল খেলা হিসেবে জানে নাটোর জেলার মানুষ সেটিকে গুলি খেলা হিসেবে অভিহিত করে। ছোট্ট বাচ্চাদের পকেট খুজলে প্রায় সবসময়ই তাদের পকেটে বেশকিছু গুলি পাওয়া যায়। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে সামান্য এক গাল ভাত খেয়েই গুলি খেলতে দৌড় দেয় বাচ্চারা।

গুলি খেলার ক্ষেত্রে প্রথমেই ছটি দাগ টেনে তিনে হয়। প্রথম দাগ টানার প্রায় আড়াই হাত দূরে আরেকটি দাগ টানা হয় যার সামনে থাকে একটি ছোট্ট গর্ত। এটিকে পিল বলে। প্রথমে পিলে গুলি চালিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়। যার গুলি পিলের সবচেয়ে কাছে থাকবে সে হবে দ্বিতীয়। এরপর আসে দাইন চালানোর পালা। এক সঙ্গে ৬, ৮ বা ১০টি গুলি চালানো হয়ে থাকে। তখন খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ একজন ১টি গুলি বাদ দেয়। বাদ দেওয়ার মানে হলো ঐ গুলিটি বাদে অন্য যে কোনো গুলিকে মারা যাবে। যে দাইন চালাবে সে যদি বাদ দেওয়া গুলি ব্যতীত অন্য কোনো গুলিকে লাগাতে পারে তবে দানটি তার অর্থাৎ ঐ দানে যতগুলি গুলি থাকে সব তার হয়ে যায়।

২১. বস্তা দৌড়

গ্রামগঞ্জের যে খেলাগুলি দেখে মানুষ সর্বাধিক মজা পায় বস্তা দৌড় সেই খেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। বস্তা দৌড় খেলায় একসঙ্গে অনেক বালক এমনকি বালিকারাও অংশগ্রহণ করতে পারে। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ পয়লা বৈশাখে বস্তা দৌড়ের আয়োজন করা হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট দাগ বা সীমানা থেকে বস্তা দৌড় আরম্ভ হয়। প্রতিটি খেলোয়াড় তার দুই পা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। এরপর বস্তার মুখ সেই খেলোয়াড়ের কোমর অবধি এসে ঠেকলে কোমরের কাছে হাত দিয়ে বস্তার মুখ চেপে ধরে স্বাভাবিকভাবে সে দৌড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। দৌড়াতে গিয়ে অনেকেই বস্তায় পা বেঁধে বা এক পায়ের সঙ্গে অন্য পা বেঁধে পড়ে যায়। একাধিক বার পরে গিয়ে আবার কেউ না পরেও নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটে যায়। যে সবার আগে গন্তব্য বা সর্বশেষ সীমানা অতিক্রম করতে পারে সেই বিজয়ী ঘোষিত হয়।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

মানুষ সামাজিক জীব। মিলে মিশে একসাথে বসবাস করার মধ্য দিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। পারস্পরিক নির্ভরতার কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। আদিম সমাজেও তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করত। জীবন ধারণের জন্যে মানুষ বিভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করত। বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের মাধ্যমে তারা সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করত। পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা আমাদের জীবিকার উৎস। সমাজের চাহিদা মেটানোর জন্যে পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থা থেকে আমরা এক এক জন এক এক পেশা অবলম্বন করে থাকি। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন পেশার উদ্ভব হয়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিচিত্র পেশার সম্মিলন ঘটেছে। এদেশের অনেক পেশা দীর্ঘ দিনের লালিত। সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সে সমস্ত পেশা বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে।

বাংলাদেশের মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্যে বা বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন পেশার শরণাপন্ন হয়েছে। আবার অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বেশ কিছু পেশাকে আজও টিকিয়ে রেখেছে। সমাজ সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় প্রতিটি পেশা আজ স্ব মহিমায় উল্লেখযোগ্য। পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ারদের কেন্দ্র করেও বিভিন্ন পেশা গড়ে উঠেছে। যেমন, বিভিন্ন ধরনের সাপের খেলা, বানর খেলা, টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য গণণা করা, গো-মহিষ বা ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে পণ্য ও মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া। আবার বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সার্কাস দলের মূল আকর্ষণ হিসেবে কাজ করে অতিকায় পশু হাতি। সার্কাস দেখতে আসা দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার কাজে হাতির বিভিন্ন কসরত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবসরকালীন সময়ে এভাবে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা চাওয়া হয় এবং এ থেকে অর্থ উপার্জন করা হয়। পশু-পাখি ও বিভিন্ন প্রাণী কেন্দ্র করে আমাদের গ্রাম বা নগর সমাজে যে ধরনের পেশা গড়ে উঠেছে বা টিকে আছে সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো :

১. বেদে

বাংলাদেশের মানুষের বিনোদনের এবং আনন্দ উপভোগের একটি অন্যতম উপায় হলো সাপের খেলা দেখা। যারা সাপের খেলা দেখিয়ে বিভিন্ন ধরণের তাবিজ বিক্রি করে, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে বেদে বা সাপুড়ে বলা হয়। নিখাঁদ ও বিশুদ্ধ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে সাপের খেলা বিবেচিত। সাপুড়েরা বছরের বিভিন্ন সময় খেলা দেখান। গ্রামের বটতলা বা কোলাহলপূর্ণ কোনো মোড়ে এবং শহরের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বিপণি বিতানের সামনের স্থানে, বাসস্ট্যান্ডে, চায়ের দোকানের সামনে, যেখানে সব সময় লোক সমাগম হয় এরকম স্থান সাপ খেলা দেখানো এবং সাপের তাবিজ বিক্রি করার জন্যে বেছে নেওয়া হয়।

www.pathagar.com

বেদেরা সব সময় একসাথে বসবাস করতে পছন্দ করেন। নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় একদল বেদে বাস করেন।উপজেলা শহর ও বেদেদের গ্রামের মাঝখানে শুধুমাত্র একটি নদীর ব্যবধান। আর নদীটি হলো আত্রাই নদী। শহরের অদুরে যে গ্রামটিতে বেদেরা বাস করেন সেই গ্রামটিকে স্থানীয় লোকেরা মাংতা পাড়া নামে চেনে। আত্রাই নদীর ধার বেয়ে গড়ে ওঠা গ্রামটিতে মোট ৩৮ টি পরিবার বাস করে যাদের সবাই বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত। জৈষ্ঠ্য মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বেদেরা গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সাপের খেলা দেখান, তাবিজ বিক্রি করেন, বয়স্ক মানুষের বাতের ব্যথার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন যা লোক চিকিৎসার একটি অংশ। বেদেরা দাঁতের পোকা খসানোসহ বেশ কিছু লোক চিকিৎসা করে থাকেন। তারা যখন নিজ আবাসস্থল ছেড়ে দুরে কোথাও যান তখন নিজেদের ভাষায় একে গাঁওয়াল করা বলেন। গাঁওয়াল করার স্থান নির্বাচনের জন্যে বেদেরা অবস্থাসম্পন্নদের এলাকা বেছে নেন। তারা নদীর ধার বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে যে স্থানটিকে তাদের ব্যবসার উপযোগী মনে করেন সেই স্থানে আবাস তৈরির চেষ্টা করেন। একটা সময় গাঁওয়াল করার জন্যে নৌকা ছিল একমাত্র মাধ্যম বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বেদেরা নৌকার পাশাপাশি গণপরিবহণ যেমন-বাস, ট্রাক, নসিমন-করিমন বা ভ্যানগাড়িতে অতি সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারেন। যেহেতু বর্ষার সময় বেদেরা গাঁওয়াল করে থাকেন তাই থাকার ঘর নির্মাণের জন্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি নির্বাচন করা হয়। জমির মালিক অনেক সময় কিছু টাকার বিনিময়ে পতিত জমিতে বেদেদের থাকতে দেন। বেদেরা সেখান থেকেই সারা দিন গাঁওয়াল করে সন্ধ্যার দিকে যে যার ঘরে ফেরেন। গরমের সময় এবং বর্ষাকালে গ্রাম-গঞ্জের দিকে সাপের উপদ্রব বেড়ে যায় বলে ব্যবসার জন্যে এই সময়টাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। প্রত্যেকটি বেদে-দলের নেতৃত্বে একজন করে সর্দার থাকেন। যাকে আবার সময়ভেদে গুরু নামেও ডাকা হয়। বয়স ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সর্দার নির্বাচন করা হয়। দলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্দার মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। নাটোরের সিংড়া উপজেলায় বসবাসকারী বেদেদের বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তারা সবাই মুসলমান। তারা নিয়মিত নামাজ, রোজা এবং মুসলিম ধর্মের যাবতীয় আচার-রীতি পালন করে থাকেন।

খেলা দেখানোর কৌশল

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাপের খেলা দেখানোর ব্যবসায় বেশ কিছু নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হচ্ছে। একটা সময় ছিল শুধুমাত্র সাপের খেলা দেখিয়ে আর বীণ বাজিয়েই বেশ টাকা-পয়সা, ধান-চাল পাওয়া যেত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই বেদেরা এখন মানুষকে ভিন্ন উপায়ে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আগের দিনে দেখা যেত বেদে বীণ বাজাচ্ছেন আর তার তালে তালে সাপ নাচছে এখন সাপের পাশাপাশি প্রতিটি দলে একটি ছোটো মেয়ে থাকে যে মেয়েটি নাচে আর গান গায়। বীণের জায়গাটি বর্তমানে দখল করেছে ঢোল। আগে

www.pathagar.com

সাপুড়ের হাতে একটি ডুগডুগি দেখা যেত। সাপুড়ে যখন তার ঝাঁপি থেকে একটি করে সাপ বের করতেন তখন ডুগডুগি বাজিয়ে সেই সাপের বর্ণনা দিতেন।

সাবধান.....সাবধান.....
মায়াবিনী কালসাপিনি বিষের জ্বালায় পুড়েছে
ক্ষিধার (ক্ষুধা) জ্বালায় কালসাপিনি আমায় ছুবল (ছোবল) মারিছে
কালনাগিনের বিষের জ্বালায় প্রাণটা যায় রে যায়
এখন দেখি বিষের জ্বালায় প্রাণে বাচাই দায়।।

এই গান গাইতে গাইতে সাপুড়ে তার ঝুড়ি থেকে একটি সাপ বের করেন যা তার মতে কালনাগিনী। তিনি এই সাপের বৈশিষ্ট্য, সাপটি কোথা থেকে ধরেছেন, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে থাকেন। সাপখেলা দেখানোর শুরুতেই সাপুড়ে একটি গোল দাগ দিয়ে দেন নিরাপত্তার স্বার্থে। তিনি বলেন এই দাগের ভেতরে কারও আসা নিষেধ। দাগের ভেতরে কেউ এলে তার যেকোনো রকমের ক্ষতি হতে পারে। সাপুড়ে ঝাঁপি থেকে সাপ বের করার সময় বিভিন্ন ধরণের ছড়া কাটেন। যেমন–

সাপের খেলা দেখবি যদি আয় রে সোনা বউ
এমন সুন্দর সাপের খেলা আর দেখেনি কেউ
সাপ যখন ফণা ধরে মর্জিনার মায় কাইন্দা মরে
মোচড়াইতে মোচড়াইতে সাপ গর্তে চলে যায়।

ওপরের ছড়াটিতে নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা একটি কৌশল অবলম্বন করেন। যেখানে তারা খেলা দেখাতে যান সেখানেই কোনো ছোটো বাচ্চাকে তার মায়ের নাম জিজ্ঞেস করেন এবং সেই বাচ্চার মায়ের নাম নিয়েই ছন্দ তৈরি করেন। এতে স্থানীয় লোকজনও অনেক মজা পেয়ে থাকেন। সাপের খেলা ও ছোটো বাচ্চার নাচের পর সাপুড়ে উপস্থিত সবার কাছে সাহায্য চান। উপস্থিত দর্শকেরা যে যার মতো টাকা পয়সা বা চাল-ডাল দিয়ে তাদের সাহায্য করেন। সাপুড়ে খেলা দেখানোর শুরুতে এবং খেলা দেখানো শেষে সকলকে বিভিন্ন কথা বলে ভয় দেখান। তিনি বলেন কেউ যদি খেলা দেখে টাকা না দিয়ে চলে যায় তবে তার বড়ো ধরনের ক্ষতি হবে। তাই অনেকে সেচ্ছায়, আবার অনেকে ভয় পেয়ে হলেও সামর্থ অনুসারে দান করে।

২. জেলে

নাটোর জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই জেলেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নাটোর জেলার ওপর দিয়ে বেশ কয়েকটি নদী বয়ে যাওয়ার কারণে জেলার বিভিন্ন স্থানে জেলে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। জেলেদের বসবাসের আধিক্যের ওপর নির্ভর করে কোনো কোনো গ্রামের নাম হয়ে গেছে জাইল্যা পাড়া বা জেলে পাড়া। নাটোর সদর উপজেলার ছাতনী ইউনিয়নে তেমনি একটি গ্রাম আছে জাইল্যা পাড়া। গ্রামটিতে মোট ৩২ ঘর জেলে বাস করেন। যাদের প্রধান পেশা মাছ ধরা এবং সেগুলো বাজারে বিক্রি করে উপার্জন করা। জাইল্যা পাড়া গ্রামটি নদীর ধার বেয়ে অবস্থিত।

www.pathagar.com

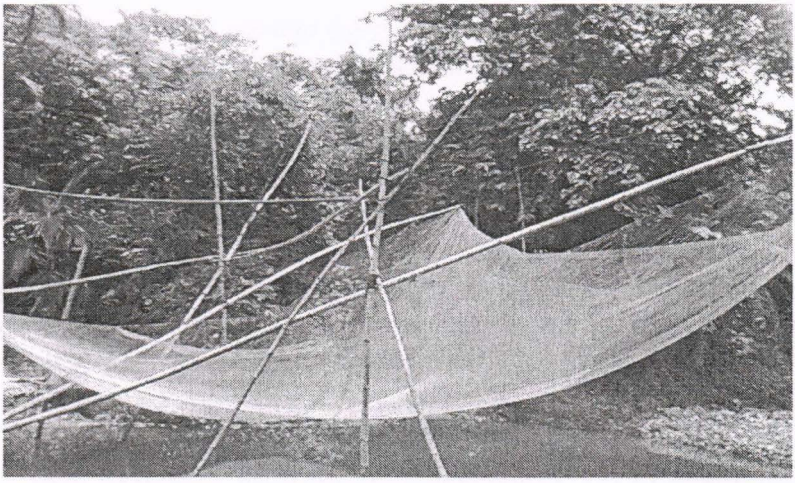

মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত খরা জাল

জেলেরা সারাদিন নদীতে মাছ ধরেন আর সন্ধ্যার আগে আগে সেই মাছ বাজারে বিক্রি করেন। যে টাকা আয় হয় তা দিয়ে তারা চাল, ডাল, তরি-তরকারি কিনে বাড়ি ফিরে আসেন। যেদিন বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় সেদিন বাড়ির জন্যে কিছু মাছ রেখে বাদবাকি মাছ বিক্রি করে দেন। আর যেদিন মাছ পাওয়া যায় না সেদিন সপরিবারে উপোস থাকতে হয় বা একবেলা খেয়ে আরেক বেলা না খেয়ে থাকতে হয়। বর্ষার মৌসুমে ব্যবসা, মানে মাছের বিক্রি-বাট্টা ভালো হয়। এ সময় পানি এলে নদীতে জাল ফেলে বা খরা ফেলে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা যায়। তখন চারিদিকে মাছের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। জেলেরা মাছ মারেন আর সেই মাছের শুটকি দেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন জেলেনিরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে মাছ ধরা। অনেক জেলে আবার মাছ ধরার কাজে নৌকা ব্যবহার করেন। যে সব জেলের টাকা-পয়সা আছে বা পারিবারিকভাবে একটু সচ্ছল তারাই মাছ ধরার কাজে নৌকা ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় মহাজনের কাছ থেকে দাদন হিসেবেও অনেকে নৌকা নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রতিদিন বা মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মহাজনকে দিতে হয়। বর্ষা মৌসুম ব্যতীত অন্য মৌসুমে জেলেরা পুকুরে পুকুরে মাছ ধরে আয়-রোজগার করে থাকেন। সেসব ক্ষেত্রে তারা চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন আবার অনেক সময় এমন হয় টাকার বিনিময়ে তারা এ ধরনের কাজ করেন। কখনও যদি মাছের বিনিময়ে তারা এ ধরনের কাজ করেন, তবে সেই মাছ বাজারে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করেন। নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলাতে বর্তমানে পুকুরে মাছ চাষের ব্যবসা বেশ জমজমাট। ধনী গৃহস্থরা পুকুর খনন করে মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে লিজ দেন ১ বছর, ২ বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্যে। একারণেই নাটোরের জেলেদের বসে থাকতে হয় না। বর্ষার মৌসুম বাদেও বছরের অন্যান্য সময় টুকটাক কাজ লেগেই থাকে জেলেদের। খরা জাল জেলেদের মাছ ধরার একটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নদী বা বিলের যে জায়গায় স্রোত বেশি সেই জায়গায় জেলেরা খরা জাল পেতে বসে থাকেন মাছ ধরার জন্যে। স্রোতের

www.pathagar.com

প্রতিকূলে এই জাল ফেলতে হয় যাতে করে স্রোতে ভেসে আসা মাছ জালে আটকা পড়ে। খরা জাল তৈরির জন্যে একাধিক বাঁশ আর জালের প্রয়োজন হয়। একটি বাঁশের সাথে আরেকটি বাঁশ জোড়া দিয়ে জাল প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। জাল ফেলার জন্যে একজন মাঝির বসার ব্যবস্থা থাকে। তিনি কিছুক্ষণ পর পর জাল তুলে দেখেন যে মাছ আটকা পড়েছে কিনা।

নাটোর জেলার গর্ব চলন বিল। চলন বিলের বড়ো একটি অংশ পড়েছে নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায়। আর স্বভাবতই বিল বাওর এলাকার লোকজন মাছ ধরা পেশার সাথে জড়িত থাকেন। চলন বিলের মাঝখানে দ্বীপের মতো অনেকগুলো গ্রাম দাড়িয়ে আছে। তেমনি একটা গ্রামের নাম হলো ডাহিয়া। সিংড়া উপজেলা শহর থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত এটি একটি দ্বীপ গ্রাম। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মূল পেশা হলো মাছ ধরা এবং তা স্থানীয় হাট-বাজারে বা উপজেলা শহরে নিয়ে বিক্রি করা। এর বাইরে যারা একটু বড়ো জেলে, বা যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ জনবল আছে, তারা অনেকে জেলা শহরে গিয়ে মাছ বিক্রি করে আসেন।

তইর‍্যা জাল ফেলার জন্যে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এজন্যে যে কেউ তইর‍্যা জাল দিয়ে মাছ ধরতে পারেন না। বিশেষ করে নদী ও পুকুরে মাছ ধরার কাজে তইর‍্যা জাল বেশি ব্যবহৃত হয়। নদী ও পুকুরের পাড় থেকে চাঙা দিয়ে এ জাল জলের মধ্যে ফেলতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে পাড়ের দিকে টেনে নিয়ে আসতে হয়। জালের অগ্রভাগে একটি বড়ো সুতা টাঙানো থাকে যেটি ধরে সমস্ত জালটিকে পাড়ে নিয়ে আসা হয়। মাছ ধরার জন্যে চাঙা দেওয়ার সময় অনেকটা জায়গা নিয়ে গোলাকার হয়ে জালটি পড়ে কিন্তু তোলার সময় জালের অগ্রভাগ একত্রিত হয়ে মাছ আটকা পড়ে। আটকে পড়া মাছগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে জেলেরা বাজারে বিক্রি করেন।

মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত তইর‍্যা জাল

www.pathagar.com

৩. ছুতার

পিতৃপ্রদত্ত পেশা হিসেবে প্রাপ্ত এই পেশা নিয়ে বিস্তারিত বলেন মোঃ ইসমাঈল হোসেন। তাঁর জন্ম একটি নিম্নবিত্ত পরিবারে। তাই পড়াশুনার পাশাপাশি ছোটো বেলা থেকেই বাবাকে বিভিন্ন সময় সাহায্য করতেন তিনি। হাতুড়ি-বাটাল এগিয়ে দিতেন। বিভিন্ন ফুট-ফরমাস খাটতেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর তিনি বাবার সাথে পুরোদমে কাজে লেগে পড়েন। তাই কাঠ মিস্ত্রির কাজের জন্যে তিনি তাঁর বাবা আফসার আলীকেই গুরু মানেন। ইসমাঈল হোসেনের কাজের জায়গা বাড়ির সাথেই। সেখানেই তিনি ফরমায়েশি বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করেন। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়েও তিনি কাজ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে দুটি ছেলে কাজ করে। তিনি তাঁর গদিতে চেয়ার-টেবিল থেকে শুরু করে আলমারি, খাট, ড্রেসিং টেবিল, শোকেসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু তৈরি করেন। তার কাছে একটি বই আছে যেটিকে তিনি ক্যালটগ (ক্যাটালগ) বই বলে উল্লেখ করেন। এই বইতে বিভিন্ন আসবাবপত্রের নকশা দেওয়া আছে। যে ক্রেতা যে ভাবে চাইবে তাকে সেই ডিজাইনের আসবাবপত্র তৈরি করে দেওয়া হয়।

এমনি করেই ছুতারেরা কাঠের সাথে কাঠ জোড়া লাগিয়ে কারুকার্যখচিত বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করেন। আসবাবপত্র তৈরি করার জন্যে অনেকে নিজেরাই কাঠ সরবরাহ করেন আবার অনেকে মিস্ত্রির ওপর এই দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। তখন মিস্ত্রি নিজে কাঠ সংগ্রহ করে খরিদ্দারের ইচ্ছামত আসবাবপত্র তৈরি করে দেন। আসবাবপত্র তৈরির মজুরি নির্ভর করে কে কি বানিয়ে নিচ্ছেন আর কোন ডিজাইনে তৈরি করে নিচ্ছেন তার ওপর। ডিজাইন যত জটিল হবে মজুরি তত বেশি আর ডিজাইন যত সরল মজুরি তত কম নেওয়া হয়।

তথ্যসহায়ক

১. মো. সমসের মণ্ডল, পিতা : মৃত আফসার মণ্ডল, গ্রাম : মাংতা পাড়া, পোঃ সিংড়া বাজার, থানা : সিংড়া, বয়স : ৩৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর

২. জিল্লু রাইদ্যা, পিতা : এছার আলী, গ্রাম : মাংতা পাড়া, পো : সিংড়া বাজার, থানা : সিংড়া, বয়স : ২৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি পাস

৩. গণেশ, পিতা : জয়ানন্দ দাস, গ্রাম : কাঠুয়াগাড়ি, পো : ছাতনী, থানা : নাটোর সদর, বয়স : ৩২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞানহীন

৪. শিবুনাথ কুমার, পিতার নাম : প্রশান্ত কুমার, গ্রাম : ডাহিয়া, পো : সিংড়া বাজার, থানা : সিংড়া, বয়স : ২৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন

৫. মো. ইসমাঈল হোসেন, পিতার নাম : মৃত আফসার আলী, গ্রাম : বেলঘড়িয়া শিবপুর, পো : বৈদ্যবেলঘড়িয়া, থানা : নাটোর সদর, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

লোকচিকিৎসা বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ নানাবিধ সমস্যায় নিপতিত। তার মধ্যে স্বাস্থ্য সমস্যা অন্যতম। অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই মানুষ নানা প্রকার রোগ ও সমস্যায় জর্জরিত। আদিকালেও রোগ থেকে নিরাময়ের জন্যে মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ওপর সার্বিকভাবে নির্ভর করত। রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তারা গাছ-গাছড়া, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ, দোয়া-কালাম, উৎসর্গ, বলিদান, তন্ত্র-মন্ত্র, সিন্নি, মানত, তুক-তাক, যাদু-টোনা, টোটকা-তদবির ইত্যাদির ওপর নির্ভর করত।

বর্তমানে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এখনো রোগের কারণ সম্পর্কে অনেকের আদিম ধারণা রয়ে গেছে এবং রোগ নিরাময়ের জন্যে গাছ-গাছড়া, তন্ত্রমন্ত্র, তাবিজ-কবচ, মালিশ-মলম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নাটোর জেলার মানুষও যুগ যুগ ধরে এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে আসছে।

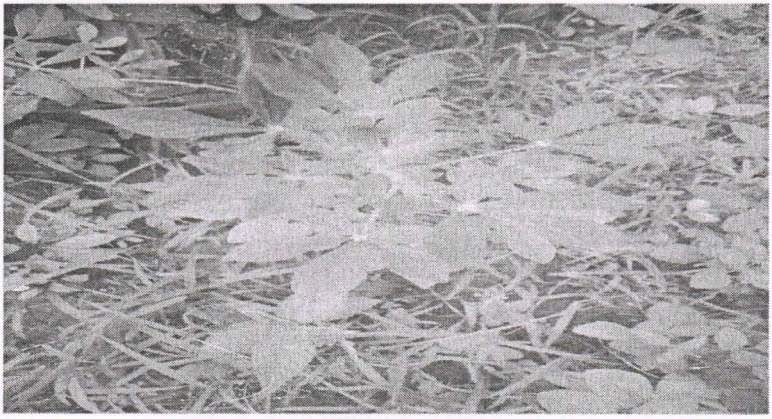

ওষধি গাছ, আধকপালি

বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, শ্রেণি, সম্প্রদায় ও পেশার মানুষ এ লোকচিকিৎসার সাথে জড়িত। সমাজে এদের পরিচয় পির-ফকির, মোল্লা-মুন্সি, সাধু-সন্ন্যাসী, যোগ-বোষ্টমি, ঠাকুর, পুরোহিত, বেদে-বেদেনি প্রভৃতি। আবার কোনো কোনো লোকচিকিৎসকদের বিভিন্ন উপাধি ও পদবিতে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। যেমন, ওঝা, কবিরাজ, ধন্বতরি, বৈদ্য, হাজাম, দাই, হেকিম, গুনিন প্রভৃতি।

www.pathagar.com

আবদুল কাদের কবিরাজ, খোলাবাড়িয়া, নাটোর সদর

নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলাতে এমন অনেক লোকচিকিৎসক রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় নানা পদ্ধতিতে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে আসছেন। তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত এমন কিছু রোগের চিকিৎসার বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো–

১. পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসা

- নিমের ছাল এবং বটের ছাল পিষে সরিষার তেল দিয়ে মালিশ করলে পক্ষাঘাত ভালো হয়।
- গোলমরিচ আর চরচরির গাছ পিষে প্রলেপ দিতে হবে।
- হাতিশুঁড়ের শিকড় সরিষার তেলে গোল মরিচের সাথে মিশিয়ে মালিশ করে দিতে হবে।
- মাষকলাই ডাল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ভালো।
- সজনে গাছের ফুল রেধে খাওয়া ভালো।
- কুস্মমালিসী পক্ষাঘাতের জন্যে উপকারী।
- মাষকলাই, বেড়েলা, আলকুশী-বীজের শাঁষ, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধার শিকড়, ভেন্নার শিকড় সবগুলো একসাথে নিয়ে মাটির হাঁড়িতে আধসের পানিতে

www.pathagar.com

সিদ্ধ করে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে হিং আর বিট বা সেন্ধব লবণ দিয়ে প্রতি সকালে একবার খেতে হবে।

- কালো ধুতুরার ফল সরিষার তেল দিয়ে মালিশ করলে বাসলি (প্যারালিসিস) ভাল হয়।

২. টিউমারের চিকিৎসা

- নিশিন্দা পাতা বেটে গরম করে লাগালে টিউমার সেরে যায়।
- কচি কদম ছাল চন্দনের মতো করে বেটে গরম করে কয়েকদিন লাগালে টিউমার সারে।
- কাঞ্চন পাতা টিউমার সারানোর কাজে লাগে।
- পাথর চুনের গাছ টিউমারের জন্যে বেশ উপকারী।
- সিকি তোলা ভুঁইকদম্ব দু'টি গোল মরিচের সাথে সামান্য পানি দিয়ে একসাথে বেটে বহুদিন ব্যবহার করলে টিউমার প্রশমিত হয়। এটির প্রলেপও দেওয়া যায়।

৩. কোমরের ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা

- শিউলি পাতা দু'কাপ পানিতে সিদ্ধ করে আধ কাপ থাকতে আঁচ থেকে নামিয়ে নিতে হবে। সেই রস সকালে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত খেতে হবে।
- আপারে শিকড়, কালো তুলসীর পাতা, আদা, গন্ধ-ভাদালের পাতা এবং রসুন সিকি পরিমাণ বেটে সকালে খালিপেটে কুলের আটির সমান একটা বড়ি করে খেতে হবে। এটি প্রলেপ হিসেবেও দেওয়া যায়।
- নিশিন্দা পাতা, সজিনা পাতা আর পানি একসাথে জ্বাল দিয়ে সেই রস ঠান্ডা করে দিনে একবার/দুইবার করে খেতে হবে।
- গন্ধ-ভাদালের পাতা চারটা এবং এক কোয়া রসুন বেটে সকালে বিকালে বড়ি করে খেতে হবে।
- নিশিন্দা পাতা দিয়ে সেক দিলেও সুফল পাওয়া যায়।
- ধুতুরা পাতার রসের সাথে অল্প আফিং মিশিয়ে গরম করে ব্যাথার জায়গায় মালিশ করলে ব্যাথা কমে।

৪. কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা

- চিতার মূল এক থেকে দেড় গ্রাম পরিমাণ নিয়ে গোমূত্রের সাথে খুব মিহি করে বেটে রোগীকে দিনে একবার করে খাওয়াতে হবে। এতে কুষ্ঠ রোগের নিরাময় তাড়াতাড়ি হয় বলে মনে করা হয়।
- চিতার শিকড়ের ছাল, লবণ এবং গোরুর দুধ পরিমাণ মতো নিয়ে ভালোভাবে বেটে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত জায়গায় ফোসকা থাকলে ফোসকার চামড়া ছুরি অথবা ব্লেডের সাহায্যে তুলে তার ওপর প্রলেপ লাগাতে হবে।

www.pathagar.com

- পুর্ণবার মূল পাঁচ গ্রাম পরিমাণ সামান্য পানির সাথে বেটে সেটা চার চামচ গরুর দুধের টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে দুইবার–সকালে ও সন্ধ্যায় প্রলেপ হিসেবে দিতে হবে। নিয়মিত ও দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে।
- কুষ্ঠ রোগে চিরতা আর মিছরির পানি খেলেও সুফল পাওয়া যায়।
- প্রথম দিকে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত জায়গায় দুর্বাঘাসের আঠা সকাল-সন্ধ্যায় একবার করে লাগালে উপকার হয়।

ওষধি গাছ, বানরলাঠি

৫. ব্রণের চিকিৎসা

- পুঁই পাতার রস মাখিয়ে ব্রণ দিলে কমে যায়।
- হাতিশুঁড়ের পাতা ও তার কচি ডাল থেতোঁ করে দুপুরে গোসল করতে যাবার এক ঘন্টা আগে ব্রণের ওপর প্রলেপ দিতে হয়। এতে ব্রণ সারে এবং নতুন করে হয় না।
- নিমপাতা ব্রণে দিলে ভালো হয়।
- লেবু দিয়ে মুখটা ভাল করে ঘসে অল্প গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর নারকেলের দুধে মশুরের ডাল বেটে মুখে লাগাতে হবে। কিছুদিন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

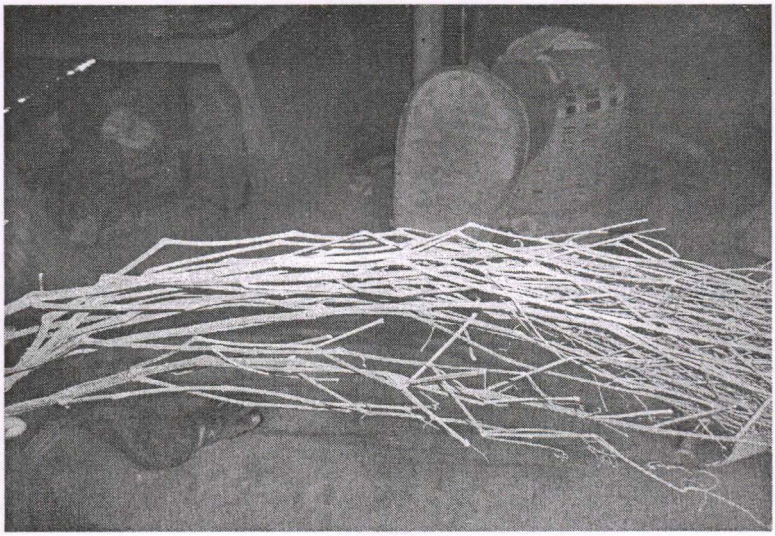

ওষধি গাছ, কালোমেঘ

৬. ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা

- জামের আঁটি খেলে ডায়বেটিস রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
- বরবটি ভাজি ডায়বেটিস রোগীদের জন্যে খুব উপকারী।
- শ্বেত শিমুল মূলের রস দশ মিলি-লিটার পরিমাণ রোজ সকালে খেলে উপকার হয়। বহুমূত্র রোগ কোনোদিন সারে না। পরিমাণ মতো খাবার গ্রহণ করলে এটি নিয়ন্ত্রণে থাকে মাত্র।
- যজ্ঞ-ডুমুরের শিকড়ের রস রোজ সকালে আধ কাপ করে পর পর একুশ দিন খেতে হয়।
- শতমূলীর রস কিছুদিন খেলে রোগ ভালো হবে।
- আমলকীর রস বা আমলকী ভেজানো জল মধু দিয়ে খেলে ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৭. আমাশয়ের চিকিৎসা

- প্রতিদিন সকালে থানকুনি পাতার রস খেলে ১৫ দিনের মধ্যে আমাশয় ভালো হয়।
- আদা শুকনা করে তা যদি গরম পানিতে মিশিয়ে খাওয়া যায় তবে উপকার হয়।
- আম পাতা, জাম পাতা, তেঁতুল পাতা সব মিশিয়ে আখের শরবতসহ খেলে আমাশয় ভাল হয়।

www.pathagar.com

- কালোমেঘের পাতা রস করে খেলে আমাশয় ভালো হয়।
- কুরচীর ছাল পিষে রস করে খেলে আমাশয়ের জন্যে অনেক উপকার পাওয়া যায়।
- কাঁচা বেল একটু শুকিয়ে নিয়ে তার সাথে মধু আর দারুচিনি দিয়ে পিশে রস করে পানি দিয়ে খেলে আমাশয় ভালো হয়।
- লাল জবাফুলের পাতা পানিতে ধুয়ে চিনি দিয়ে দৈনিক তিনবার খেলে রক্ত আমাশয় ভালো হয়।

৮. জন্ডিস রোগের চিকিৎসা

নিমগুলম্ব, বড়ো নিমগাছের শিকড় সমপরিমাণে একত্রে বেটে চার আনা পরিমাণের বড়ি করে দু'বেলা দুটো করে সেব্য। কাঁচা হলুদ কুলে-খাড়ার শিকড় জন্ডিস রোগের জন্যে উপকারী। প্রথম অবস্থায় অড়লের পাতার রস গরম করে তিন বা চার চামচ খেতে হবে। দুর্বাঘাসের নির্জলা রস গরম করে চার-পাঁচ দিন এক তোলা করে সেব্য। তিন বা চার ঘন্টা অন্তর লঘু পথ্য, ঝলসানো পাউরুটি, পোড়া বা সিদ্ধ আপেল শীতল জল, ছানার জল ইত্যাদি খেতে হবে। জ্বর থাকলে সাগু, বার্লি ইত্যাদি, না থাকলে পুরাতন চালের ভাত, পেঁপে, কুলেখাড়া পটল, থানকুনি, ছানার ঝোল আখের রস ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।

৯. খোস-পাঁচড়ার চিকিৎসা

কাঁটানটের শিকড় তেঁতুল বিচি ও হুকোর জল একত্রে মিশিয়ে পিষে যথাস্থানে লাগালে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। তিন চার দিন পর ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার প্রয়োজন হলে প্রয়োগ করতে হবে।

১০. গ্রন্থি-স্ফীতির চিকিৎসা

কোনো জায়গায় গ্ল্যান্ড ফুলেছে, সেখানে শিমুল পাতা বেটে অল্প গরম করে লাগালে সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয়। যজ্ঞ-ডুমুরের ক্ষীর (আঠা) যে কোনো স্থানের গ্রন্থি-স্ফীতিতে লাগালে প্রদাহ ও ব্যাথা কমে যায়।

১১. ঘামাচি ও শীতকাঁটার চিকিৎসা

হিঞ্চে শাক বেটে গায়ে মাখলে দুটো রোগই সেরে যাবে। শ্বেত-চন্দন ঘষে মাখলে শিশুদের ঘামাচি আরোগ্য হয়। গুলঞ্চের রস গায়ে মাখলে ঘামাচি কমে যায়। তেজপাতা চন্দনের মতো বেটে গায়ে মেখে ঘন্টা খানেক পর স্নান করতে হবে। এতে ময়লাও কাটে, ঘামাচিও সারে।

১২. পেট ভালো রাখার চিকিৎসা

তিল বাটার মধ্যে যথেষ্ট প্রোটিন পাওয়া যায়। বেলের শাঁস রাত্রে জলে ভিজিয়ে পর দিন সকালে সেই জল খেলে পেটের পক্ষে খুব উপকারী। ডাল (মটর ও মুগ) অর্ধেক এবং তিল বাটা অর্ধেক একটা কাপড়ে বেঁধে ভাত রান্নার সময় ভাতের হাঁড়িতে দিয়ে সিদ্ধ করে একটু ঘি বা তেল, নুন ও কাঁচা মরিচ দিয়ে খাওয়া ভাল ও বেশ পুষ্টিকর।

www.pathagar.com

পেট ভালো না থাকলে এটা খাওয়া উচিত নয়। সুস্থ অবস্থায় এটা পেট পরিষ্কারে সাহায্য করে।

১৩. রতি-শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা

অকালে রতি-শক্তি কমে গেলে কুলে-খাড়ার মূল চূর্ণ করে আধ পোয়া দুধসহ কিছুদিন খেতে হবে।

১৪. গাঁটের ব্যাথা

ছাতিম গাছের ছাল থেতোঁ করে পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানির সাথে দুধ মিশিয়ে খেতে হবে।

১৫. বার্ধক্য প্রতিরোধে চিকিৎসা

নিয়মিত ইসবগুল খেলে সহজে বার্ধক্য আসতে পারে না। থানকুনিও শরীরকে বেশ শক্ত করে তোলে। এক ছটাক থানকুনির রস, দুধ ও আখের গুড় রোজ সকালে খেতে হবে।

১৬. দাঁদ রোগের চিকিৎসা

আকন্দ গাছের ডাল থেকে আঠা বের করে সেই আঠা শরীরের আক্রান্ত স্থানে লাগালে দাঁদ রোগ ভাল হয় ।

১৭. পেটের সমস্যায় চিকিৎসা

জিগা গাছের বাকল বেঁটে খেলে পেটের সমস্যা দূর হয়।

১৮. জ্বর-এর চিকিৎসা

তুলসী পাতার রস মধুর সাথে শিশুকে খাওয়ালে জ্বর ভাল হয়। ভেটির পাতা বেটে খেলেও জ্বর সারে।

১৯. কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করার চিকিৎসা

- রাতে কয়েকটা আমলকী ভিজিয়ে পর দিন ঐ পানি একটু গরম করে তার মধ্যে চিনি মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- ইসবগুলের ভুষি রোজ সকালে বাসি পেটে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।
- তুলসী পাতা, উচ্ছে পাতা, শেফালি পাতার রস একটু গরম করে পিপুল এবং মধু দিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- হরতুকি ফল গুড়ো করে গরম পানি দিয়ে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়।
- বেলের শরবত বেশি খেলে পায়খানা সাফ হয়।
- চালকুমড়ার রস কয়েক চা চামচ গরম দুধের সাথে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়।

www.pathagar.com

- ভেন্নার বিচি বেটে রান্নার সঙ্গে খেলে পায়খানা সাফ হবে।
- শ্যাঁওড়া গাছের পাতা এবং মূলের ছাল রস করে ঘি দিয়ে প্রতিদিন সকালে খেতে হবে। তাহলে কোষ্ঠ-বদ্ধতা আর হবে না।
- হরতুকি, গুলঞ্চ এবং পেঁপে একসাথে পিষে রস করে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।
- খেজুর গুড়, গরম দুধ, কিসমিস একসাথে করে যে কোনো খাবার খেলে পায়খানা নরম হয়।

২০. স্ত্রী রোগের চিকিৎসা

- মেয়েদের সুতিকা রোগের জন্যে নিশিন্দা পাতা সিদ্ধ করে ঐ জলে কয়েকদিন স্নান করলে রোগ ভালো হয়।
- কার্পাস ও আখের শিকড় বেটে খেলে বা কিছুদিন পুনির মূল (পুদিনা) খেলে সুতিকা রোগে খুব উপকার হয়।
- মাসিকের সময় খুব বেশি বা অল্প স্রাব যদি হয় তবে ২/৪ চামচ বকুল ফুলের রস দুই বেলা কয়েকদিন খেলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।
- যাদের সময় মতো মাসিক হয় না, তলপেটে মাঝে মাঝে ছুঁচ বেঁধার মতো যন্ত্রণা হয় তাদের পালতে-মাদার পাতার রস ২/৩ চামচ একটু গরম করে প্রতিমাসে দুই বেলা খেলে খুব উপকার হয়।
- কোমরে বা তলপেটে যদি অসম্ভব যন্ত্রণা হয় তবে দেড় গ্রাম মতো মুলার বীজের গুড়ো জল দিয়ে দু বেলা খেলে উপকার হয়।
- মাসিকে যদি দুর্গন্ধ থাকে তবে অনন্তমূল বেটে পানি বা দুধ দিয়ে দুই বেলা খেতে হবে।
- যাদের মাসিক বা ঋতুস্রাব অনিয়মিত তাদের জন্যে করণীয় হলো মাসিক হবার দুই তিন দিন আগে থেকে মাসিক হবার পরের ২-৩ দিন পর্যন্ত ১২ গ্রাম মাত্রার শোধিত গুলগুল ১ কাপ গরম দুধের সাথে খেতে হবে। যদি এ সময় কারও স্তনে ব্যাথা হয় তাহলে ধুতুরা পাতা ও কাঁচা হলুদ সমান পরিমাণে বেটে প্রলেপ দিতে হবে।
- অল্প পরিমাণ ঋতুস্রাবের জন্যে নিম গাছের মূলের ছাল ছোটো আকারে কেটে সেটা দু'কাপ পানিতে সিদ্ধ করতে হবে। পানি ফুটে এক কাপ হলে তা খেলে ঋতুর পরিমাণ স্বাভাবিক এবং নিয়মিত হবে।
- বেশি পরিমাণ ঋতুস্রাব হলে বড়ো শিমুল গাছের মূলের ছাল দেড় থেকে দুই গ্রাম ভালোভাবে বেটে সকাল ও বিকালে ঠান্ডা পানির সাথে খেলে তা স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে।
- ঘৃতকুমারীর শাঁসকে ভালভাবে চটকে এবং শুকিয়ে তা সামান্য গরম পানিতে ভিজিয়ে দিনে ২ বার করে খেলে মাসিক স্বাভাবিক হবে।

www.pathagar.com

২১. সাদাস্রাবের চিকিৎসা

- ওলটকম্বলের ডাল কুচি কুচি করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে খালি পেটে খেলে সাদাস্রাব ভালো হয়।
- ইসবগুলের ভূষি প্রতিদিন চিনি আর দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে সাদা স্রাব ভাল হয়।
- পানি ভাঙার সময় পানের সাথে যষ্ঠি মধু দিয়ে খেলে ভাল হয়।
- পিপল পাতা জ্বাল দিলে রস বের হয়ে আসে। সেটি রোজ সকালে বাসি পেটে খেলে সাদাস্রাব ভালো হয়।
- ধাউতের রোগে সাদা লজ্জাবতীর শিকড় এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে যে কোনো কলার ভেতর রেখে সকালে বাসি পেটে খেতে হবে।
- ধাউতের জন্যে দইলচা গাছ পিষে রস করে খাওয়া যায়।
- মিছরি দানার গাছ সাদাস্রাব ভালো করে। এটি পিষে চিনি দিয়ে খেতে হবে।
- অমরশঙ্খ রস করে খেলে সাদা স্রাবের জন্যে ভালো কাজ করে।
- তাল গাছের সাদা শেকড়, লাল চড়চড়ির শেকড়, সুমাস গুড়গুড়ির শেকড় আর মহিলতার শেকড় একত্রে পিষে রস করে এক গ্লাস করে প্রতিদিন বাসি পেটে খেতে হবে। সাত দিনেই সাদা স্রাব ভাল হবে।
- রামতুলসীর শুকনো ফুল ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে পরদিন সকালে চিনি দিয়ে খেলে স্রাব ভাল হয়।
- অর্জুনের ছাল আর কাঁচা হলুদ একসাথে পিষে রস করে খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।
- যষ্ঠিমধু গাছের শিকড় চিবিয়ে রস খেলে অনেক সময় সাদা স্রাব ভালো হয়।
- দুর্বা ঘাসের শিকড় আংটি বানিয়ে আঙুলে পরলে পানি ভাঙা কমে।

২২. গর্ভপাতের চিকিৎসা

- নোনা গাছের বীজের গুড়া ব্যবহারে গর্ভপাত ঘটে।
- কলকির ফল খেলে গর্ভপাত ঘটে।
- কুঁচের বীজ আর শিকড় দুটোই গর্ভপাতে কাজে লাগে।
- আকন্দের পাতা এবং গাছের কষ গর্ভপাত করে।
- কাঁচা পেঁপের কষ যদি গর্ভের প্রথম অবস্থায় খাওয়ানো যায় তবে সেটি গর্ভপাত করে।
- স্বর্ণলতার পুরো গাছটি পিষে রস করে খেলে গর্ভপাত ঘটে।
- রক্তকরবী গাছের সকল অংশ পিষে খেলে খুব শীঘ্রই গর্ভপাত ঘটবে।
- রক্তচিতার শিকড়ের ছাল ভালোভাবে বেটে ব্যবহার করলে গর্ভপাত হয়।

www.pathagar.com

ক. নারীর স্তনে ব্যথা এবং দুধ গড়িয়ে পড়া

চিকিৎসা-১

গুনিন নিজে চার কুল পড়ে স্বীয় স্তনে ফু দেন। তবে রোগীর যে স্তনে থনকো হয়েছে গুনীন তার বিপরীত স্তনে ফু দেন।

নিচের মন্ত্রটি পড়ে গুনিন রোগীর আরোগ্য চান।

নদীর ধারে চন্দন গাছটি, খুদ খায় কোন জল।
অমুকের থনকো ঝাড়ি বা পায়ের মোড়ল

চিকিৎসা-২ :

গুনিন নিচের মন্ত্র পড়ে রোগীর যে স্তন আক্রান্ত হয়েছে সেটির বিপরীতে হাত দিয়ে স্বীয় স্তন নাড়তে থাকেন। মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করা পর্যন্ত গুনিন কাজটি করতে থাকেন।

"ওপারে কদমের গাছে মাছি
উদ খায় মাছ কাটা বাজি
শাক খায় পোকা বাজি
ফান্নার থনকো বাম হাতে, ডান হাতে মুছি।"

খ. হাড় ভাঙা

কবিরাজ রোগীর সামনে মাটিতে বসে কাস্তের গোড়া হাতে নিয়ে মন্ত্র পাঠ করেন এবং চিহ্ন দেন। অন্য একজন প্রতিবার মন্ত্র শেষে আক্রান্ত স্থানে একটি করে 'ফুঁ' দেয়। মাটিতে চিহ্ন দেয় অনেকটা পরিসংখ্যানের হিসেবে ছক আকারে।

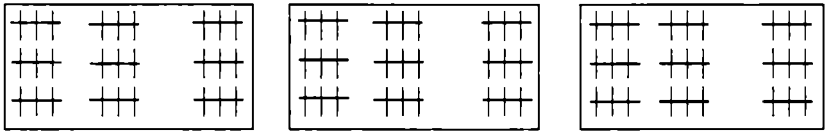

মন্ত্রটি হলো- ইন্না তাইনা কাল কাওছার, বলে কবিরাজ একটি ||| চিহ্ন দেন। শুধুমাত্র ছার শব্দ সোনার সাথে সাথে অপর ব্যক্তি রোগীর আক্রান্ত স্থানে ফুঁ দেয়।

এর সাথে গোয়ালিকা, ডাকনিমার শেকড়, কালো ধুতরার শেকড়, তেলাকুচের লতা এবং বিষ জাউনের পাতা ৮/১০ টা, আদা তিন চাকা একত্রে পিষে সহনীয় মাত্রায় গরম করে ভাঙা স্থানে মোটা প্রলেপ দিতে হয়। তার পূর্বে হাড় টেনে সমানভাবে বসিয়ে নিতে হয়।

ঔষধ লাগানোর পর ভেন্নার পাতা রেখে তার ওপর বাঁশের বানা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এটি তিন দিন পর খুলে নিমের পাতা এবং গরম পানি দিয়ে

www.pathagar.com

পরিষ্কার করা হয়। ভালো না হলে তিনবার একই নিয়মে বাঁধা হয়। যা অনেকটা আধুনিক চিকিৎসায় প্লাস্টার করার মতো।

গ. যৌন চিকিৎসা

- ভাং এর পাতা যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে।
- মর্দানি শক্তির জন্যে দশটি কালোজিরা এককোয়া বিশিষ্ট একটি পিঁয়াজ রাতে শোবার আগে চিবাইয়া খাবে।
- অশ্বগন্ধার শুকনা মূল ৮০ গ্রাম গুড়া করে সেটি গাওয়া ঘি দিয়ে ভেজে তার ২০ গ্রাম এক কাপ দুধে মিশিয়ে খেলে সহবাসে তৃপ্তি লাভ হয়।
- লজ্জাবতীর বীজ দিয়ে তেল তৈরি করে সেটা সামান্য পরিমাণে পুংজনন অঙ্গে ধীরে ধীরে কিছুদিন কয়েক মালিশ করলে সঙ্গমে কোনো অসুবিধা হবে না।
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনের সময় বীর্য তাড়াতাড়ি স্খলন হলে সেটা অশান্তি বয়ে আনে। সেক্ষেত্রে কেয়া ফুলের পরাগ গোরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে একবার খেতে হবে।

ঘ. পাথরি রোগের চিকিৎসা

মাইলক, বাইশলি, বাউড়, কলকাটক একত্রে বেটে রস করে খালি পেটে সকালে তিন দিন খেতে হবে।

ঙ. স্বপ্ন দোষের চিকিৎসা-১

"বিসমিল্লা বিসমে আল্লা
কুল হুআল্লা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু
মুহম্মাদুর রাসূল আল্লাহ।"

এই আয়াত পাঠ করে ঘুমানোর সময় বালিশের ওপর ডান হাতের তিনটি থাবা দিয়ে ঘুমাতে হবে।

চিকিৎসা-২

কালো ধুতরা গাছের উত্তর দিকের শেকড় সুতা দিয়ে নাড়ি বরাবর বেধে রাখলে স্বপ্নদোষ হয় না।

চ. সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা

সাপ অতি হিংস্র ও প্রতিহিংসা পরায়ণ জীব। বাংলাদেশের বহু মানুষ এখনও সাপের কামড়ে মারা যায়। নগরায়নের আগে বহু সাপ এদেশে ছিল। তাই সাপুড়িয়াদের সাপ ধরতে কোনো অসুবিধা হতো না। কিন্তু বর্তমানে নগরায়নের ফলে এবং বন-জঙ্গল কেটে বাড়ি ঘর তৈরি করা হচ্ছে বলে সাপ বিলুপ্তির পথে। বাংলাদেশে বিষধর সাপের পাশাপাশি বিষহীন বা নির্বিষ সাপও রয়েছে।

www.pathagar.com

সাপে কামড়ালে ক্ষত-স্থান প্রথমে কাপড় দিয়ে বেধে দিতে হবে। তারপর আস্তিল, সনরাজ, চন্ডমূল, ঈশ্বরমূল, হ্যামতাল প্রভৃতি খাওয়াতে হবে রোগীকে। একেক সাপের জন্যে একেক চিকিৎসা।

আবার অন্য এক সর্পচিকিৎসক বলেন- সাপে কাটলে তিনি ঐ জায়গা ব্লেড দিয়ে কেটে নেন। রক্ত দিয়ে পরীক্ষা করেন বিষধর সাপ কিনা। কুলীন সাপে কামড়ালে কুচকুচে কালো রক্ত বের হয়। পরে লবণ দিয়ে সে জায়গা ঠেসে ধরলে আস্তে আস্তে লাল রক্ত আসতে থাকে। সাপ বিষধর কিনা তা আবার পিপলের গাছ দিয়েও পরীক্ষা করা হয়। পিপলের ফল হয় মরিচের মতো। সাধারণ অবস্থায় খেলে ফলটি ঝাল লাগে আর যে শরীরে বিষ আছে সে শরীরে ফলটি মিষ্টি কিংবা তেতো লাগবে।

কোনো ব্যক্তিকে সাপে কাটলে তার মাথার চুল উঠে যাবে, ভুরুর নিচে টিপে দিলে সে কথা বলবে, বাম পেটের নিচে টিপে ধরলে বোঝা যাবে রোগীর অবস্থা কেমন।

সাপে কাটা রোগীর জন্যে ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয় একযুগ আগের সজনে গাছের মূল, শ্বেত-আকন্দ, পিপল গাছ, লজ্জাবতী গাছ, আনাজে কলা। এছাড়াও বাগানের কেঁচো পিষে বড়ি করে খেতে হবে। রোগী হয় ভালো হবে নয়তো মারা যাবে।

আবার কিছু সাপে কাঁটা রোগীকে গোল মরিচ খাওয়ালে বিষের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না। বিষ নামানোর সময় আল্লাহর কালাম পড়তে হয়। শ্বেত-আকন্দের শিকড় থাকলে সাপ ছোবল দিবে না।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

গ্রাম বাংলায় সাপের বিষ নামানোর সময় বিভিন্ন রকমের মন্ত্র পড়া হয়। যদিও এগুলোর তেমন কোনো উপকারিতা নেই তবুও পাঠ করতে হয় বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। এ রকম একটি মন্ত্র হলো—

১ (ক)

গুরুপা অগনী গগনী বিহারকা
শঙ্কা শনয়ের সাপিনি গোকূলের কথা
দোয়া দাও সবতারে খ্রিষ্টের জন্ম হলো
গোকূল নগরে তারা বলছে হরি হরি
পুষ্প বনে ঝাঁপ দিল মন্ত্রমুরালী
বজ্রপাত হলো কায়িকি করিতে পারে ব্যাটা
বিষের বাপ মাও, ধ্যান করিয়া মন্ত্র পড়িয়া
ঠিক তৎক্ষণাৎ জড়াইল গুরুমান গুরু মহাপির
গুরু মহাপিরের সঙ্গেতিয় বর তুলে নিল
বাসুদেবের মন্ডপুরা একদল তুলসী পাতার
নাম বিষধর, নাম বিষধর সুতার মতো
কড়ি মোরা মুরিয়া নড়ে নামরে

www.pathagar.com

কালপুরা সেই গুরুস্থলের, ঈশ্বর মহাদেবজানে
কামরুপ কামাখ্যার থাও
যদি বিদ্যা মিথ্যা হও, কার্তিক গণেশ
দুই পুত্রের মাথা খাও
দোহাই আল্লা রসূলের।

১ (খ)

সমুদ্রের কূলে কূলে টি টি পাখি চড়ে
কুন কুন করে বিষধারী নগরেতে নড়ে
পদ্ম পদ্ম রক্ত বিষের নামটা নিলে
যে বিষ খাওয়াতে ভুলে শিয়ালের ভাঙাতে
পুত বলে মা তুমি ঋণ গিয়াছ ভুলে
মরাডাঙা শিয়ালডাঙা তুলে নিব কোলে
পুত বলে মা তুমি নিজে পরাজয়
কালকোটা সাপের বিষ তুই নিবি বিষে
কালে মোরে কাল পিয়ারা কালে দিয়া তর
গতরে সতরে বিষটির গোড়া ভাকোন্ন ধর
মরিয়ম ধরে নামায়ে কালকোটা সাপের
বিষ, ঈশ্বর মহাদেব পানে
সেই গুরুসুলের কামরূপ কামাখ্যায়
যদি বিদ্যা মিথ্যা হও।
কার্তিক গণেশ দুই পুত্রের মাথা খাও
দোহাই আল্লা রসূলের।

২. জিনে ধরা রোগীর চিকিৎসা

জিনে ধরলে সুতা পড়ে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে রোগী জিনের প্রভাব মুক্ত হয়। এক্ষেত্রে লাল রঙের সুতা ৩ তার, তার নীল রঙের ৪ তার, মোট সাত তার সুতা একত্রে নিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্র ৭ বার পড়ে সুতায় ৭টি ফুঁ দেওয়া হয় এবং তা রোগীর গলায় বেঁধে দেওয়া হয়। মন্ত্রটি--

২ (ক)

হাড় বন্ধ লাড় বন্ধ দেহের আঠারো কুঠি বন্ধ
সাপ বিচ্ছু বন্ধ, ওপরা, ফাকারা, ভূত, পেতনি
ডাইনি, বুগনি, চুরা, চুন্নি বন্ধ
ফুক গেদানি ফুক মন্তর
কান্নাকাটি বন্ধ রক্তে যদি
করিস ঘা ইসমো সাহাদিয়া
মা কার্ত্তিক গণেশের মুণ্ডু খাঁ॥

www.pathagar.com

৩. জিন তাড়ানো মন্ত্র

চিকিৎসা-১

নিম্নোক্ত মন্ত্রটি তিনবার পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁ দেওয়া হয়। তাহলে রোগীর শরীর থেকে জিন চলে যায়। মন্ত্রটি হলো–

শান শান মহাশান
যাতে কাটি আসতে কাটি
বান কাটি বেদ কাটি
কুক গ্যাং কোন মন্ত্র কাটি
দুপুর ত্যাপর কাটি
নিশী প্রভাত কাটি
ডালের ডাল কুরকাটি
ফুলের ফুল কুরকাটি
আই দুল্য শিঙ্গের বানে
(ফান্নার) রঙ্গের ওপর
ফাপরা বাও বাতাস
ফুলের দোষ ফুলের কাম
এ বানে ফাইটা ফুলে করি খান খান।

চিকিৎসা-২

সুরা জিনের প্রথম ৫ আয়াত, ৪ কালেমা, ৪ কুল, সুরা ফাতেহা, সুরা ইয়াসিনের প্রথম ৫ আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি রোগীর শরীরে ছিটাতে হবে। তবে রোগী যদি পুরুষ হয় তাকে পরিতে ধরলে উপরোক্ত আয়াতগুলোর সাথে দু'আ হাসরের প্রথম তিন আয়াত পড়ে পানি পড়া দিতে হবে।

এছাড়াও উপরোক্ত আয়াতগুলোর সাথে হক লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলে রোগীর শরীরে ফুঁ দিলে জিন রোগীকে ছেড়ে চলে যায়।

চিকিৎসা-৩

নিম্নোক্ত মন্ত্রটি চার বার পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁ দিলে জিন শরীর থেকে চলে যায়। মন্ত্রটি হলো-

সাকি মা বানুমাতা তুমি বড়ো বীর
দাঁনবদূত পদতলে থুইয়া আমি হইলাম স্থির
বাপ নর সিং সিদ্ধি গুরু ওমা দেবী ওমা
ছয় বাড়ি ছয় দানবদূত লইয়া শিঘ্রই চইলে যা
আগে পিছে চলে দানব করে মোড়ামুড়ি
নীল দূত স্বর্গে লইয়া স্বর্গে লাগাই ডালি
ডাক-ডাকিনি নাচ, পেঁচা পেঁচি ফিরিয়া চাও
মনের কথা কহিয়া যাও
যদি ফান্নার অঙ্গে ফিরিয়া চাও
দোহাই ধর্মগুরুর মাথা খাও।

www.pathagar.com

৪. বাতের ব্যাথা নিরাময়ের মন্ত্র

ব্যাথা ব্যাথা মোর ব্যাথা
মাথা ব্যাথা গাও ব্যাথা
পিঠি ব্যাথা কোমরত ব্যাথা
মাজার ব্যাথা ঠ্যাংনা ব্যাথা
গাইটা ব্যাথা বিষকে থামায়?
শ্রী হরির তিউয়ান থামায়,
কামরূপ কামিক্ষ্যার দোহাই।

৫. বশীকরণ মন্ত্র

চিকিৎসা-১

মন মোর মোহিনী
চিত্ত মোর সোনার কামিনী
ভূরু মোর রতনের মায়া
আমার সাথে যোগ কর
এসে মহা মায়া
অং, সং, স্বাঁ, হা

হাতে সরিষার তেল এবং তুলসী পাতা নিয়ে ডলতে ডলতে এ মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। এরপর পুরুষটি যে রমণীর প্রতি আসক্ত তার নাম উচ্চারণ করে নিজ কপাল এবং ভ্রুতে তা মালিশ করতে হবে। এতে রমনী পুরুষটির প্রতি আসক্ত হবে।

চিকিৎসা-২

প্রদীপে রহিয়া তেল
জ্বল জ্বল করে
জ্বলিতেছে জ্যোতি স্বরূপ
তাহার ভিতরে
জ্বলুক অগ্নি
জ্যোতির অত্তায়
আমার স্ত্রীর নাম
পড়ুক তথায়
চঞ্চলা সে যেন
সদায় থাকে অস্থির
আমার জন্যে এখন
হয় সে অধীর।
কারা আত্তে?
হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আত্তে
কামাক্ষ্যা মায়ের আত্তে।

www.pathagar.com

এই মন্ত্রটি ৭০ বার পাঠ করে খাঁটি সরিষার তেলকে মন্ত্রপূত করতে হবে এবং ঐ তেল স্ত্রীর শরীরে মাখিয়ে দিতে হবে।

৬. বোল্লার বিষ নামানোর মন্ত্র

বোল্লারে বোল্লা
মুখ কান কাল্লা
ঘরে আছে লাঙল জোয়াল
বাইরে আছে শীষ
ঝাড়িয়া নামাই বোল্লা
তোর কামড়ের বিষ।

এই মন্ত্র এক নিশ্বাসে তিনবার পাঠ করার পর রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে বোল্লার বিষ নেমে যাবে।

৭. স্মরণশক্তি বৃদ্ধির মন্ত্র

আয় মা স্বরস্বতী
আমার কণ্ঠে বসুমতী
যা শুনি কানে
তা রাখিব মনে
প্রণাম করে মা তোমার চরণে
আমার কণ্ঠ ছেড়ে যদি
অন্যের কণ্ঠে যাস
মা ভগবতীর মুণ্ডু খাস।

৮. কুকুর-তাড়ানো মন্ত্র

কুকুর মাথার পাক
তুই কুকুর মুই বাক
তুই কুকুর কণ্ঠে থাক।

এই মন্ত্র এক নিশ্বাসে তিনবার পড়ে কুকুরের উদ্দেশ্যে তিনবার ফুঁ দিতে হবে।

৯. শরীরের শিরা/রগের আঘাত থেকে মুক্তির মন্ত্র

অমুকের রগ মিল
শিব সংকর নীল
যেখানকার বেদনা
সেখানে গিয়ে মিল।

এই মন্ত্র ২ বার পাঠ করে সরিষার তেল দিয়ে আক্রান্ত স্থানে মালিশ করতে হয়।

১০. স্ত্রীলোকের মাসিকের সমস্যা

মাসিকের সময় অসহ্য যন্ত্রণা বা ব্যাথা হলে নিম্নোক্ত মন্ত্র সাত বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ পানি দিনে তিনবার তিন দিন রোগীকে খেতে হয়। মন্ত্রটি হলো–

www.pathagar.com

শান শান খুর শান
যাতে কাটি আসতে কাটি
বান কাটি বেদ কাটি
কুক গ্যাং কোন মন্ত্র কাটি
দুপুর ত্যাপর কাটি
নিশি প্রভাব কাটি
জলের জল কুর কাটি
ফুলের ফুল কুর কাটি
আই দুল্য শিঙ্গের বানে রঙের ওপর
ফাপড়া বাও বাতাস ফুলের দোষ
ফুলের কাম এ বানে ফাইটা ফুলে
করি খান খান।।

১১. বাড়ি-ঘর বন্ধ করার মন্ত্র

বিসমিল্লাহ্ নাম করি বাড়ি-ঘর বন্ধন
দূর দূর শয়তান জিন পরিদের দৈত্যজন
উত্তরে দাঁড়ায় আলী, দক্ষিণে ওমর
পশ্চিমে ওসমান, পূর্বে আবুবকর
আসমানে হোসেন বীর, জমিনে হাসান
কোণে কোণে আমি আর ফাতেমা পরাণ
ঘরেতে খাদিজা বিবি, বাহিরে রাসূল
ফেরেশতা দিনরাত পড়ে, কোরানের আয়াত
তামাম ঘর-বাড়ি জোড়া খোদার রহমত

এই মন্ত্রটি পাঠ করে বাড়ির চারপাশে ফুঁ দিলে বাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। জনশ্রুতি আছে যে এতে অলৌকিক দেব-দেবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তথ্যসহায়ক

১. মো. আব্দুল ওয়াহেদ প্রামাণিক, পিতা : মৃত. রহমতউল্লাহ প্রামাণিক, বয়স : ৬৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা :অক্ষরজ্ঞানহীন, গ্রাম : বেড়গঙ্গা রামপুর, পোস্ট : নাজিরপুর, থানা : গুরুদাসপুর
২. মো. আজিজুল ইসলাম, পিতা : আব্দুর রাজ্জাক, বয়স : ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি পাস, গ্রাম : উত্তর নারিবাড়ী, পোস্ট : নাজিরপুর, থানা : গুরুদাসপুর
৩. মোসা. জাহানারা বেগম, স্বামী : শামীম মণ্ডল, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : গৃহিনী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি পাস, গ্রাম : উত্তর নারিবাড়ী, পোস্ট : নাজিরপুর, থানা : গুরুদাসপুর।

www.pathagar.com

৪. মো. আব্দুল লতিফ, পিতা : মৃত. নহির উদ্দীন, বয়স : ২৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ.এস.সি, পেশা : চাকরিজীবী, গ্রাম : চন্ডীগাছা, পোস্ট : আব্দুলপুর, উপজেলা : লালপুর

৫. মো. শমসের মৃধা, পিতা : হারান উদ্দীন, বয়স : ৭৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞানহীন, পেশা : কৃষি, গ্রাম : বিরোপাড়া, পোস্ট : গোপালপুর, উপজেলা : লালপুর

৬. মোসা. নাসিমা বেগম, স্বামী : আব্দুল্লাহ, বয়স : ৩৫ বছর, পেশা : গৃহিনী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি, গ্রাম : বিরোপাড়া, পোস্ট : গোপালপুর, উপজেলা : লালপুর

৭. সাগরী রাণী, স্বামী : নির্মল সরকার, বয়স : ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা :অক্ষরজ্ঞানহীন, পেশা : কৃষিজীবী, গ্রাম : শিবপুর, পোস্ট : গোপালপুর, উপজেলা : লালপুর

৮. হাজেরা বেগম, স্বামী : সাইদুর রহমান, বয়স : ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি, পেশা : চাকরি, গ্রাম : জোনাই, পোস্ট : জোনাই, উপজেলা : বড়াইগ্রাম

৯. কবিরাজ মো. আবু হানিফ ডলার, পিতা : মৃত. হেলাল উদ্দীন, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি, পেশা : কৃষিজীবী, গ্রাম : বড়াইগ্রাম, পোস্ট : বড়াইগ্রাম

১০. মো. আব্দুর রহমান, পিতা : জলিল উদ্দীন, বয়স : ৬৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি পাস, পেশা : কবিরাজি, গ্রাম : ঠাকুর লক্ষ্মীকোল, পোস্ট : ঠাকুর লক্ষ্মীকোল, উপজেলা : নাটোর সদর

১১. গফুর কবিরাজ, পিতা : জহির প্রামাণিক, বয়স : ৫৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞানহীন, পেশা : কবিরাজি, গ্রাম : ভাটোদাড়া, পোস্ট : নাটোর, থানা : নাটোর সদর

১২. আলী আকবর, পিতা : বন্দে আলী, বয়স :৫১ বছর, পেশা : কবিরাজি, শিক্ষাগত যোগ্যতা :অক্ষরজ্ঞানহীন, গ্রাম : থানাপাড়া, পোস্ট : বড়াইগ্রাম, উপজেলা : বড়াইগ্রাম

১৩. আনোয়ার কবিরাজ, পিতা : আকবর, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি পাস, পেশা : কৃষিজীবী, গ্রাম : তালসুর বাগড়ম, উপজেলা : বড়াইগ্রাম,

১৪. মো. ইয়াকুব আলী, পিতা : সাইদুর আলী, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : কবিরাজি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি, গ্রাম : নন্দীগ্রাম, পোস্ট : ডাংগা জানালা, উপজেলা : সিংড়া

১৫. মোছা. নাজমা বেগম, স্বামী : তমিজ উদ্দিন, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : কবিরাজি, শিক্ষাগত যোগ্যতা :অক্ষরজ্ঞানহীন, গ্রাম : মিছরিপাড়া, পোস্ট : দয়ারামপুর, উপজেলা : বাগাতিপাড়া

১৬. আব্দুল জলিল, পিতা : মমতাজ আলী জহুরুল, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : কৃষি কাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞানহীন, গ্রাম : তেমুকনগর, পোস্ট : ভাগনাগরকান্দি, উপজেলা : সিংড়া

১৭. মো. ইদ্রিস, পিতা : মৃত. তছিকুল, বয়স : ৪৭ বছর, পেশা : কৃষি কাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম শ্রেণি পাস, গ্রাম : নন্দীগ্রাম, পোস্ট : ভাংগা জানালা, উপজেলা : সিংড়া

১৮. মো. দেওয়ান আলী, পিতা : মৃত. জুলফিকার আলী, বয়স : ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি পাস, গ্রাম : টলটলিয়া পাড়া, পোস্ট : হাটলক্ষিপুর, থানা :নাটোর সদর ।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। যুগ যুগ ধরে রহস্যময়তার আড়ালে জীবনবোধের এক সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাই এসব ধাঁধার প্রাণশক্তি। বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের এক অনন্য ও সহজতর মাধ্যমে এই ধাঁধা। বিভিন্ন পরবে আনন্দ-অনুষ্ঠানে, বিনোদনে এবং কল্পিত শত্রুকে ঘায়েল করতে লোকসাহিত্যের এই মাধ্যমটির জুড়ি নেই। নাটোর জেলার আপামর মানুষের এমন কিছু ধাঁধা এখানে তুলে ধরা হলো:

১.

হাতু পাগুলি পেটের ভিতর
ভুলকি পারে মাথা

—কচ্ছপ

কচ্ছপের হাত পাগুলি পেটের ভেতর থাকে, মাথাটি থাকে বাইরে। কচ্ছপের গায়ে একটা শক্ত আবরণ থাকে যার মধ্যে এটি হাত পাগুলো গুটিয়ে রাখে এবং মাথা প্রয়োজনের সময় বের করে।

২.

ইকরি বিকরি তিংড়ি ভাই
দুচোখ তার মাথা নাই

–কাকড়া

ইকরি বিকরি তিংড়ি ভাই বলতে এখানে কাকড়াকে বোঝানো হয়েছে। 'দুচোখ তার মাথা নাই' মানে কাকড়ার দুই চোখ আছে কিন্তু মাথা নেই। কাকড়ার দেহের সাথে মাথাটি মিশে থাকে।

৩.

লাল বুড়ি হাটে যায়
টুকা দিলে পয়সা হয়

–কেন্না/ কেন্নি

কেন্না/ কেন্নির মুখে মুখে প্রচলিত চলা ফেরা বোঝানো হয়েছে, আর টুকা দিলে পয়সা হয় মানে কেন্নিকে টুকা দিলে যে আকার হয়ে যায়, তাকে পয়সা বুঝানো হয়েছে।

৪.

ইল ঘুঘুর বিলে বাসা
সেই ঘুঘুটার চামরা খোসা

– জোঁক।

www.pathagar.com

ইল ঘুঘুর বিলে বাসা বলতে জোঁককে বুঝানো হয়েছে। সেই ঘুঘুটার চামড়া খোসা দিয়ে বোঝানো হয়েছে তার গায়ের মধ্যে কোনো হাড় মাংস নেই, আছে শুধু খোসা।

৫.

মাটি খুরে বাইর হয়
আগুনেতে পোড়ে
শহরে হাজারে পাওয়া যায়
মেয়েরা গায়ে পরে

–গহনা

'মাটি খুরে বাইর হয়' কথাটি দিয়ে এখানে সোনা, রূপা, চাঁদি ইত্যাদি ধাতুকে বোঝানো হয়েছে। ধাতু আগুনে পোড়ানোর মাধ্যমে বিভিন্ন গহনা তৈরি করা হয় যা আজকাল শহরে সমাদৃত এবং অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং মেয়েরা সহজে গায়ে পরে।

৬.

হাইসতে হাইসতে যায় নারী
পর পুরুষের কাছে।
দিবার লাগলে কাচুর কুচুর
ভিতরে গেলে হাসে।

–চুড়ি

'হাইসতে হাইসতে যায় নারী পর পুরুষের কাছে' বলতে এখানে চুড়ি পড়ার জন্যে অন্যের কাছে (চুড়িওয়ালা) যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। 'দিবার লাগলে কাচুর কুচুর' মানে, চুড়ি যখন মেয়েদের হাতে দেওয়া হয় তখন ব্যাথা লাগে আর কাচুর কুচুর শব্দ হয়। 'ভেতরে গেলে হাসে' বলতে চুড়ি পড়ানোর পরে মেয়েরা হেসে ওঠে এবং মেয়েদের মনে তখন আনন্দের দোলা দিয়ে যায় এখানে সেই বিষয়টিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৭.

দুই হাত দি টানা টানি
টোপে টোপে পড়ে পানি।

–কলম

কলম দুই নখের মাঝে রেখে লেখাকে টানাটানি বোঝানো হয়েছে। 'টোপে টোপে পরে পানি' বলতে কলম দিয়ে যখন কাগজে লেখা হয় তখন কালি বের হয়, এখানে তাকেই পানি পড়া বলা হয়েছে।

৮.

ইটটুকুন এক ছ্যাড়া
হলো তার খাড়া

– বদনা

www.pathagar.com

ইটটুকুন এক ছ্যাড়া বলতে এখানে বদনার কথা বলা হয়েছে। 'হলো তার খাড়া' বলতে বদনার নালকে বোঝানো হয়েছে যার মধ্য দিয়ে পানি বের হয়।

৯.

চার জন ধরে, আটপায়ে চলে
আস্ত এক মানুষ গিলে।

–পালকি

পালকি ধরার সময় সামনে দুই জন আর পেছনে দুইজন থাকে, এই মোট চার জনে আবার আট পায়ে চলে। 'আস্ত এক মানুষ গিলে'–কথাটি দিয়ে পালকিতে একটি মানুষকে বিয়ের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

১০.

একটু খানি পক্কি, জলি ধান খাই
টিপ দিলি বহু দূর যায়।

–টর্চ লাইট

একটু খানি পক্কি বলে এখানে টর্চ লাইটকে বোঝানো হয়েছে। 'জলি ধান খাওয়া' বলতে লাইটের ব্যাটারির কথা বলা হয়েছে যেটির আলো বহু দূরে যায়।

১১.

পুকুরেতে জল নাই
পাতা কেন ভাসে
যার সাথে দেখা নাই
সে কেন হাসে

–আয়না

'পুকুরেতে জল নাই, পাতা কেন ভাসে' বলতে এখানে আয়নাকে বোঝানো হয়েছে। পরের কথাগুলো দিয়ে বলা হয়েছে আয়না নিজের চেহারা নিজে দেখতে পায় না। সে কেন হাসে মানে অনেক সময় আয়নাতে নিজ নিজ চেহারা দেখে অনেকেই হাসে এটি বোঝানো হয়েছে।

১২.

তিন জোনের এক যুক্তি
ছয় চোখ তার তিন পুটকি

–লাঙ্গল

ধাঁধাটিতে রূপকের আড়ালে যা বলা হয়েছে তা হলো, লাঙ্গল যে ধরে এবং যেগুলো টানে অর্থাৎ দুইটি গরু, এই তিন জনের একই চিন্তা থাকে যে জমি চাষ করতে হবে। 'ছয় চোখ তার তিন পুটকি' বলতে মানুষের দুইটি চোখ আর দুই গরুর চারটি চোখ এই মোট ছয়টি চোখ বোঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

১৩.

এক বার চাইলি দুই বার দেয়
হু করলে বের কইরি দেয়

–খড়/ চালের বান্ধন

ধাঁধাটিতে ঘরের যে কাজ করে তাকে ঘরামি বলা হয়েছে। ঘরামি দিয়ে ঘরের চাল ছাওয়া হয়। ঘরের চাল আঁটার জন্যে সুতলির ব্যবহার হয়। চাল ছাওয়ার সময় সুতলি দিয়ে বান্ধন তোলার জন্যে এক জন নিচে থাকে আর ঘরামি ওপরে থাকে। ঘরামি যখন একবার বান্ধন দেয় নিচের ব্যক্তি দুই খুচা দিয়ে সুতলি ভোরে দেয়। খুচার মধ্যে থেকে সুতলি টান দিয়ে বের করে তারপরে ঘরামি বান্ধন আর্টে।

১৪.

শুকানে জন্ম তার
পানিতে বাস
পানি খাইলে সর্বনাশ – নৌকা

ধাঁধাটিতে বলা হয়েছে নৌকার জন্ম হয় বা তৈরি করা হয় শুকনো জায়গায় কিন্তু পানিতে তার বাস বা পানিতে চলাফেরা। আবার পানিতে খেলে সর্বনাশ বলে পানিতে নৌকা ডুবে গেলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় সেটি বোঝানো হয়েছে।

১৫.

আইসলো কালু বসলো ডালে
কার এমন খেমতা আছে,
তাকে তাড়াতে পারে।

–অন্ধকার

ধাঁধাটিতে রূপকের অন্তরালে বলা হয়েছে যে, দিন ও রাত আসে প্রকৃতির নিয়মে, এতে মানুষের কোনো হাত থাকে না। 'আইসলো কালু বসলো ডালে' বলে রাতকে বোঝানো হয়েছে। তাই অন্ধকার রাত নেমে আসলে কারও সাধ্য নেই রাতকে তাড়িয়ে দিনে পরিণত করতে পারে। উক্ত ধাঁধাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

১৬.

লোগে যায় লোগে আসে
হাটে গেলে পেট হয়।

–বাজারের ব্যাগ

ধাঁধাটির উত্তর বাজারের ব্যাগ। বাজারের ব্যাগ মানুষের সাথে হাটে যায়, বাজার শেষে সাথেই ফিরে আসে। আবার বাজার করে ব্যাগে রাখলে ব্যাগ মোটা হয় তাই হাটে গেলে পেট হয় এই কথাটি বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৭.

মা যায় আইলে আইল
বাছুর চলে খ্যাতে
মা যখন হাম্বা করে
বাছুর তখন প্যাটে

–ট্রেন

ধাঁধাটি দিয়ে ট্রেন চলাকে বোঝানো হয়েছে। বাছুর চলে খ্যাতে বলতে মানুষের স্টেশনে থাকাকে বোঝানো হয়েছে। 'মা যখন হাম্বা করে বাছুর তখন প্যাটে' এর মানে ট্রেন যখন স্টেশনে এসে থামে এবং মানুষ যখন ট্রেনের মধ্যে ওঠে তখন ট্রেন হর্ন বাজিয়ে স্টেশন ছেড়ে যায়।

১৮.

একটু খানিক পুকুরে
মাছ খুলবুল করে
কারুর বাবার সাধ্য নাই
জাল ফ্যালাতি পারে।

–পাতিলের ফুটন্ত ভাত

উপরোক্ত ধাঁধাটিতে 'একটু খানিক পুকুরে' বলতে পাতিলকে বোঝানো হয়েছে। 'কারুর বাবার সাধ্য নাই জাল ফ্যালাতি পারে' মানে ঐ সময় পানি অত্যন্ত কম থাকে এবং কারও ক্ষমতা থাকে না পাতিলের মধ্যে হাত দেওয়ার।

১৯.

লাড়ি লাড়ি লাড়ি
দুই হাত দি ধরি।
খাড়া হয় যখন
ঢুকাই দি তখন

–সুই সুতা

'লাড়ি লাড়ি লাড়ি দুই হাত দিয়া ধরি' বলতে এখানে সুতার কথা বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটির মানে সুতার মাথা হাত দিয়ে একটু সরু ও খাড়া করে নেওয়া হয় এবং সুচে যে ফাঁকা জায়গাটি আছে তার মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

২০.

টাকায় আছে, কথায় আছে
আছে সারা বিশ্বে
কলকাতাতে আছে দুইটা
নাই বাংলাদেশে

– 'ক'

www.pathagar.com

ধাঁধাটিতে 'ক' বর্ণের উপস্থিতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে 'ক' বর্ণটি টাকায় ও কথায় একটি করে রয়েছে, কিন্তু কলকাতায় রয়েছে দুটি। আবার বাংলাদেশ শব্দটিতে এ বর্ণ একটিও নেই।

২১.

গোয়া দিয়ি খাই
ঠাসি দিলে পেট দিয়ি বাড়াই
বেশি খাইলে মাথা দিয়ি বাড়াই

–কল

উপরোক্ত ধাঁধার উত্তর হলো কল। 'গোয়া দিয়ি খাই' বলতে কলের নিচ থেকে পানি উঠানোকে বোঝানো হয়েছে। যখন চাপ দেওয়া হয় তখন কলের মাঝ খান দিয়ে পানি বের হওয়ার জায়গাকে পেট বলা হয়েছে। 'বেশি খাইলে মাথা দিয়ে বাড়াই' বলে বোঝানো হয়েছে যে বেশি জোরে চাপ দিলে পানি ওপর দিকে বা মাথা দিয়ে বের হয়।

২২.

উত্তর থেকে আইসলো পাখি
সন সন কইরে
নারা পাখি ধান খাই
গব গব কইরে।

– ঢেঁকি

এখানে 'আইসলো পাখি সন সন' করে বলতে ঢেঁকিকে বোঝানো হয়েছে আর পরের কথাগুলো দিয়ে ঢেঁকির সরু মাথার ধান রাখার গর্তের মধ্যে যাওয়া ও আসাকে বোঝানো হয়েছে।

২৩.

না দিলি রাগ করে
দিলি ফাক করে।

–ফকির

ফকির কে ভিক্ষা না দিলে ফকির রাগ করে। দিলে ফাক করে বলতে ফকিরকে যখন ভিক্ষা দেওয়া হয় তখন সে ব্যাগ খুলে ভিক্ষা নেয় এ কথাটিই বোঝানো হয়েছে।

২৪.

থ্যাকগা তোর ফাটুর ফুটুর
গোয়াল ঘরের পিছে
তিনশত ষাটটা পুটকি
কোন মদদার আছে।

– ঝাঁজর

www.pathagar.com

২৫.

পাঁচ জোয়ানে বোঝা দিল
বত্রিশ জোয়ানের ঘরে
দুয়ারে দিল এক বুড়ি
টান দি নেয় ঘরে।

–ভাত খাওয়া

ধাঁধার উত্তর ভাত খাওয়া। 'পাঁচ জোয়ানে বোঝা দিল বলতে' পাঁচটি আঙুল দিয়ে মুখের মধ্যে খাবার দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। পরের বাক্যটিতে মুখের মধ্যে যে বত্রিশটা দাঁত থাকে তা বোঝানো হয়েছে। 'দুয়ারে ছিল এক বুড়ি' বলতে এখানে জিহ্বার কথা বলা হয়েছে। 'টান দি নেয় ঘরের' মানে জিহ্বার খাবার টান দিয়ে পেটের মধ্যে নেওয়াকে বোঝাচ্ছে।

লোকজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যেও পীঠস্থান নাটরে এমন আরোও অসংখ্য ধাঁধা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা মানুষের নিত্য উচ্চারণে, কর্মে, আনন্দে, দুঃখ-বেদনায় সরব। এমন কিছু ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা হলো—

১.

আড়াই কাঠা ভুয়ে
সাইলি সোনার ধান
এই ধান পাকে না
রাত হলি থাকে না।

– হাট

২.

রাতে গরু বান্ধা থাকে
দিনে গরু নাই,
কোন শহরে গেছে গরু
লাদের চিহ্ন নাই

– তারা

৩.

চার ঠ্যাং ষোল হাটু
মাছ ধইরতে গেল ঠ্যাটু
শুকনা বিলে ফেলায় জাল
বইসে থাকে চিরকাল

– মাকড়সা

৪.

ওহে সখী বিল ভরে পড়েছে পাখি
এক-এক পাখি ছয়-ছয় রং
পাখি হিন্দু কি মুসলমান।

www.pathagar.com

–মাছি

৫.
মায়ের দুধ খায়না,
মায়ের পিছু ছাড়ে না।

–মুরগীর বাচ্ছা

৬.
বাপরে মাগির হিয়া
গাছের উপর ছাওয়াল থুইয়া
মাটিতে থাকে শুইয়া

–আলু

৭.
ঢুক ঢুক ঢোকেনা
ঢুইকলে আর বাড়াই না

– কবর

৮.
পাকিস্তানিরা কি খেয়ে
বাংলাদেশকে বলে কি লাগাইসে

– মরিচ

৯.
আমার একটা ছাগল আছে
লতাপাতা খায়
টিপ দিলে বহদূর যায়

– মোইট

১০.
হাত নাই পা নাই
কল-কলাইয়া চলে

– সাপ

১১.
রাজার মেয়ের বিয়ে হয়
গোসল করে গা ভিজে না

– কচুর পাতা

১২.
পানির তলে জিয়ল মাছ
পারা দিলে সর্বনাশ

– কোরান

www.pathagar.com

১৩.
তিন অক্ষরের নাম যার
সর্বলোকে খায়
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে
মূল্যের দাম হয়

–বাদাম

১৪.
এক থালা সুপারি
গুনতে লাগে বেপারি

–তারা

১৫.
এক গাছা দড়ি
গোছাতে গোছাতে মরি

– রাস্তা

১৬.
ঢাল চাল পাতা
নাই তার বোটা -

– রুটি

১৭.
আকাশ থেইন পইরল লড়ি,
সেই লড়ি তুলব কি করি—

– ছায়া

১৮.
রাস্তার কোলে গাছটা
একশত এক কোজে দিলি উঠেনা তার বাকলা—

– ছায়া

১৯.
ইল বিল শুকাই গেল
চ্যালের আগায় পানি—

– তরমুজ

২০.
এক আছে দুই নাই
পাঁচ আছে ছয় নাই
ত্রিশ আছে বত্রিশ নাই—

– বছর, নামাজ ও রোযা

২১.
একবার চাইলি দুইবার দেয়

www.pathagar.com

হু করলি বাইর কইরি দেয়—

– চালের বান্ধন

২২.
ও বড়লোকের মি
দিতে গি গিলি না
তার মানে কি—

– ঘোমটা

২৩.
আঁধার থেকে বাড়াইলো গাড়া
গাড়াকে দিলাম পাকনাড়া—

– নাকের সর্দি

২৪.
রাজা বেটি পাই দোয়াই
গোয়ার তল দিয়ে সাপ যায়—

– গরুর চুনা

২৫.
হাওয়ার গুলি চামড়ার বন্দুক
মারনু ফাঁকে নাগনু নাকে—

– পাদ/বাই

২৬.
হারাইলে খুজি যারে
পাইলে লেইনা ঘরে—

– রাস্তা

২৭.
একটু খানি গাছে
আইড়ির হোল নাচে—

– বেগুন

২৮.
কাঁচা থাকলে আঁটি খায়
পাকলে তার চোঁচা খায়—

– খেজুর

২৯.
হুক্কুর গুজা খুঁড়ে মাটি
ছয় চোখ তার তিন পুটকি—

– লাঙ্গল

www.pathagar.com

৩০.
হাত আছে তার পা নেই
গলা আছে তার জামা নেই—

– শার্ট

৩১.
কোন হাঁস পানিতে নামে না—

– ইতিহাস

৩২.
খোপা চ্যাং খোপা চ্যাং
চার মামা কর ট্যাং—

– গোয়ালা আরা

৩৩.
আকাশ থেইকে পাইল হাতি
হাতি খোয়াই তিন লাততি—

– ঢেঁকি

৩৪.
উত্তর থেকে আইসলো পাখি
মন মন কইরে
নারা পাখি ধান খাই
গবগন কইরে—

– ঢেঁকি

৩৫.
আল্লার কি কুদরত
লাঠির ভিতর শরবত—

– আঁখ

৩৬.
পানির তলে মরিচ গাছ
পা তুলি দিলি সর্বনাশ—

– শিং বা কানচ মাছ

৩৭.
দুই মায়ের পেটে
একটি ছাওয়াল—

– খিল

৩৮.
একটি রাজার বাড়িতে
সাতটি গেট
রাজার বাড়ির মধ্যে

www.pathagar.com

লেবুর গাছ আছে
যতগুলো লেবু তুলবে
প্রতি গেটে অর্ধেক দিতে হবে
পরে নিজের কাছে একটি থাকবে
কতটি লেবু তুলতে হবে—

– ১২৮ টি

৩৯.
বাপরে মাগির হিয়া
গাছের উপর ছাওয়াল নুইয়া
মাটিতে থাকে শুইয়া—

– আলু

৪০.
লাল, মিয়া হাটে যায়
দুই গালে দুই থাপ্পর খায়—

– পাতিল

৪১.
কাঁচা তুলতুল
পাকা বুলবুল
হাটে গিয়া চড় খায়—

– মাটির পাতিল

৪২.
খেদাইলে যায় না
না খেদাইলে যায়—

– কেল্লি বা কেন্না

৪৩.
লাল বুড়ি হাটে যায়
টুকা দিলি পয়সা হয়—

– কেন্না

৪৪.
মাটি খুঁড়ে বের হয়
আগুনেতে পোড়ে
শহর বাজারে পাওয়া যায়
মেয়েরা গায়ে পরে—

– গহণা

৪৫.
দুই ঠ্যাঙ্গের মাঝে
কইসি ধইরি বসে
যখন দেয় টান

www.pathagar.com

নাটে পানির বান—

– দুধ বালতি

৪৬.
কাজে আছে পদার্থে নাই
গাছ নাই পাতা নাই
নাই কুল তবে ধরে ফল—

– পরীক্ষার ফল

৪৭.
আকাশ থেইকে পাইল ঝাঁটা
ঝাঁটার গায়ে কাঁটা কাঁটা—

– কাঁঠাল

৪৮.
একটু খানি এক খুঁটি
ধান আটে পুটি পুটি—

– জামির

৪৯.
কোন নারীর জীবন নাই—

– ডিকশনারি

৫০.
কোন বিলে পাখি নাই—

– টেবিল

৫১.
তিন অক্ষরে নাম তার
মাটির তলে থাকে
প্রথম অক্ষর কাইটে দিলে
মানুষ আহার করে—

– পাতাল/তাল

৫২.
শুতি হইলে দিতি হয়
না দিলি ক্ষতি হয়—

– ঘরের খিল

৫৩.
একটু খানি মামা
গা ভর্তি জামা—

– পেঁয়াজ

www.pathagar.com

৫৪.
ইট ঘুঘুর পিট টান
কোন ঘুঘুর চার কান?—

– ঘর

৫৫.
কোন প্রাণির দাঁত যতবার পড়ে
ততবার ওঠে

–কুমির।

৫৬.
ডানটি লড়ে খেজুর পরে

–ছাগলের লাদ

৫৭.
তিন তের দিয়া বার
নয় দিয়া পুরুন কর

–ষাইটল

৫৮.
পাঁচ অক্ষরে দেশের নাম
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলি
দুইটা ফলের নাম

– বেলজিয়াম -আম-বেল

৫৯.
তিন অক্ষরে নাম যার
দেশের নাম হয়
মধ্যের অক্ষর কাইটে দিলে
খাদ্য দ্রবের নাম হয়

– ভারত-ভাত

৬০.
দুই অক্ষরে নাম যার
গাছে বাস করে।
শেষের আকার বাদ দিলি
মাটিতে পোতা থাকে

–কলা ও কল

www.pathagar.com

৬১.

তিন অক্ষরে নাম যার
জলে বাস করে
মুড়ার অক্ষর বাদ দিলে
খাইতে মিষ্টি লাগে

– মাগুর গুড়।

৬২.

তুমি অহরহ তাকে
বাপ বলে ডাকতে পারো
কিন্তু সে তোমাকে বাপ
বলে ডাকতে পারবে না।

– ভাগনে

৬৩.

এমন কি জিনিস
স্বামীকে এক দিন দেয়
অন্যদের দেইখলেই দেয়।

–ঘোমটা

৬৪.

খাইলে কান্দে
না খাইলে কান্দে না

–আছাড়

৬৫.

দুই ভাইয়ের এক পুটকি
গাছে বাস, করে যুক্তি

–বাবলার কাঁটা

৬৬.

দড়া পড়ে কুয়ে ভরে

–পায়খানা করা

৬৭.

আয় বন্ধু প্রেম করি
ঢুকায় আর বের করি।

–তালা চাবি

www.pathagar.com

৬৮.

আকাশ থেকে পড়লো দড়া
দড়া বলে এখানে ঘোরা

–লাটিম

৬৯.

ডিম ডিম ডিম
কবুতরের ডিম
আছার দিলি ভাঙ্গেনা
লোহা ছাড়া কাটে না

–সুপারি

৭০.

আছারের বাড়ির কাছে
তা দুরের ঘাটা
এক খান তিতল গাছে
৩২ খান পাতা।

– দাঁত

৭১.

ঘরের মধ্যে বাড়ালো হুমি
হুমির গায়ে ভুমি ভুমি

– করলা

৭২.

মা ঝাপড়ি ঝুপড়ি
মিয়ে সুন্দরী

– মরিচ

৭৩.

এক বার টান দিলি
বেত ঝার লড়ে
গাভিতে ডিম পাড়ে
পানিতে ভাসে।

তথ্যসহায়ক

১. আবুল হোসেন, পিতা : মৃতঃ উপচান হোসেন, গ্রাম : কাদির গাছা, ডাকঘর : ভাগনাগর কান্দি, থানা : সিংড়া, বয়স : ৬০ বছর, পেশা : কৃষিজীবী

২. শাপলা বেগম, স্বামী : মো. শাহাদাৎ আলী, গ্রাম : বোজরাহাট, ডাকঘর : ভাগনাগর কান্দি, থানা : সিংড়া, বয়স : ৩০ বছর, পেশা : গৃহিণী,

www.pathagar.com

৩. মোছা. শাহনাজ পারভীন, পিতা : মো. আকুব্বার আলী, গ্রাম : মানপাড়া, ডাকঘর : বড়াইগ্রাম, থানা : বড়াইগ্রাম, বয়স : ৩০ বছর, পেশা : গৃহিণী

৪. মোছা. মাছুরা বেগম, স্বামী : মো. আনসার আলী, গ্রাম : হিজলী, ডাকঘর : ভাগনাগর কান্দি, থানা : সিংড়া, বয়স : ৩৮ বছর, পেশা : গৃহিণী

৫. মো. খবির উদ্দিন, গ্রাম : যুগেন্দ্রনগর, ডাকঘর : খুবজীপুর, থানা ও জেলা : গুরুদাসপুর, নাটোর, বয়স : ৭৫ বছর, পেশা : কৃষিজীবী

৬. মো. হাসান আলী, পিতা : মৃত : তাসেন আলী, গ্রাম : পশ্চিম হাগুড়িয়া, ডাকঘর : দিঘাপতিয়া, থানা : নাটোর সদর, বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : কৃষিজীবী

৭. ফাতেমাতুজ জোহরা রাখি, পিতা : সুলতান, মাতা : ফেন্সি বেগম, গ্রাম : সংগ্রামপুর, ডাকঘর : জোনাইল, থানা : বড়াইগ্রাম, বয়স : ৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৩য় শ্রেণি।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন প্রতিটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। নাটোর জেলার মানুষ নিত্যদিনে, ঝগড়ায়, বাগ্‌বিতণ্ডতায় কিংবা যে কোনো পরবে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে থাকেন। মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এমন কি অন্যকে নাজেহাল করার জন্যেও তারা প্রবাদ ব্যবহার করে থাকেন। নাটোরে প্রচলিত প্রবাদসমূহ :

১.

এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগে না
লাগলেও খস খস করে।

এ কথায় সমাজ জীবনের যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তা হলো আত্মীয়তার বন্ধনের পরিচয়। পর সব সময় পরই থাকে। পর কখনো আপন হয় না। কোনো বিপদে আপনজনের মতো পাশে দাঁড়ায় না।

২.

আমি বানি পরের বারা
আমার বারা যায় দখিন পাড়া।

এ প্রবাদটিতে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো নিজের সন্তানকে নিজে মানুষ করতে পারা যায় না। শিক্ষক বা গুরুজন পরের ছেলেকে মানুষ করেন বা শিক্ষা দিয়ে থাকেন কিন্তু নিজের ছেলেকে মানুষ করতে পারেন না। নিজের ছেলে-মেয়ে নিজের কাছে শিক্ষা নেয় না। অন্যের কাছে দৌড়ায় বা অপরের কাছে যায়। তাই বলা হয়েছে ওস্তাদের ছেলে শিক্ষা নেয় অন্য ওস্তাদ ধরে।

৩.

ছিনই দিয়ে সমুদ্র ছেচা।

উপরোক্ত প্রবাদের অর্থ হলো সাধ্যের বাইরে কষ্ট করে কোনো কাজ করা যা মানুষের দ্বারা সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব। মানুষ যখন অসম্ভব কোনো কাজ করতে যায় তখন তার ফল হয়ে পড়ে শূন্য। মানুষ সাধ্যের বাইরে কোনো কিছুই করতে পারে না।

৪.

পথে পাইছে কামার
দা ধারায় দেও ধারায়।

উক্ত প্রবাদে সুবিধাভোগী মানুষের কথা বলা হয়েছে।

৫.

বাপে ব্যাটায় ভাই কি ভাই
কোন মতে দিন কাটায়।

www.pathagar.com

৬.

সিয়ান ঘুঘুর ছাও
ফাদে না দেও পাও।

উপরোক্ত প্রবাদ দুটির সাহায্যে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণির চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যারা অত্যন্ত চতুর তারা সব সময় হিসেব করে পথ চলে। যে দিকে বিপদ সে দিকে পা দেয় না, সব সময় সর্তক থাকে।

৭.

আমিও নাড় হাতি
রঙিন শাড়ির দাম কুমতি।

উপরোক্ত প্রবাদের মাধ্যমে বিধবা নারীকে বোঝানো হয়েছে। দুনিয়ার সবাই সুখী ও আনন্দময় জীবন চায়। সবাই চায় নিজেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে চলতে। মেয়েরা স্বামী থাকা অবস্থায় বিভিন্নভাবে নিজেদের সাজাতে চায়। তারা বিভিন্ন রঙের শাড়িতে নিজেকে উপস্থাপন করে তুলতে চায়। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে বিধবার সাদা শাড়ি পড়তে হয় তাকে। অনেক সময় স্বামী জীবিত থাকাবস্থায় ভালো শাড়ি পরা হয় না অভাবের তাড়নায়। কিন্তু তারই অবর্তমানে রঙিন শাড়ি হাতের কাছে পেলেও তা হয়ে ওঠে নিয়ম রক্ষার্থে পরিত্যাজ্য।

৮.

অর্ধ কলে মর্দ বুঝে
ভাঙি কলে মাগি বুঝে।

এ প্রবাদটিতে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধির স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোনো বিষয় পুরুষ সহজে বুঝতে পারে, এমন কি আভাসে বলা কথাও। কিন্তু মেয়েরা অস্থির থাকে বলে, তাদেরকে বিস্তারিত না বললে তা বোঝা তাদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে।

৯.

দাদার কবর কোনে
দাদি কাঁদে কেনে।

সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা না জেনে কাজ করে এবং বার বার ভুল করে থাকে। যেখানে যে জিনিস পাওয়া যাবে সেখানে না খুঁজে অন্য কোথাও বা যেখানে পাওয়া যাবে না সেখানে গিয়ে খোঁজে। অর্থাৎ কোনো জিনিস ভুল ঠিকানায় গিয়ে খোঁজা যা কখনও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। উল্লিখিত প্রবাদটিতে এ বিষয়টিই বলা হয়েছে।

১০.

এক মুখ সোনা দিয়ে ভরা যায়
সাত মুখ ছাই দিয়ে ভরা যায় না।

মানুষের চাওয়া পাওয়া অফুরন্ত, তাই চাহিদা মেটানোও কঠিন। ছোটো পরিবারে জনসংখ্যা কম। তাতে, খাওয়া পড়ায় মন পাওয়া যায়। বেশি করে প্রয়োজনী জিনিস

www.pathagar.com

সরবরাহ করা যায়। কিন্তু বড়ো পরিবারে জনসংখ্যা বেশি থাকায় অল্পতে মন পাওয়া যায় না। অনেক সময় বেশি বেশি জিনিস দেওয়াও সম্ভব হয় না।

১১.

আমার ধান পায়রায় খায়
আমার রাম বাণিজ্যে যায়।

এ প্রবাদটিতে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো পিতার অনেক অর্থ থাকা সত্ত্বেও সন্তান কখনও কখনও পরের জিনিস আশা করে। পিতা হয়তো নিজের অনেক অর্থ সম্পদ পরের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে অপরের আশা পূরণ করে থাকেন। অথচ নিজের সন্তানের আশা পূরণ করতে পারেন না। নিজের সম্পদ পরকে দিয়ে খাওয়ানো এবং পরের সম্পদ রক্ষা করতে চাওয়ার দ্বন্দ্বই প্রবাদটির মূল কথা।

১২.

আমি খাই ভাতারের ভাত
তোর কেন গালে হাত।

উপরোক্ত প্রবাদে সমাজের প্রতিহিংসার ছবি পাওয়া যায়। অনেক মেয়ে আছে যারা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় প্রবাদ মতে মেয়েদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বেশি। তারা অন্যের সুখ সহ্য করতে পারে না। এক জনের সুখ দেখলে আরেকজনের মধ্যে হিংসা কাজ করে এবং এর ফলে সে সমালোচনা করে বেড়ায়।

১৩.

আমি মরি আপন জালাই
সবাই ত্রমে আগুন উসকাই।

অনেকের মনে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা থাকে বা কষ্ট থাকে। আর মনের কষ্ট সবচেয়ে বড়ো কষ্ট। কষ্টের মধ্যে কেউ যদি কটু কথা বলে তাহলে তার মাত্রা আরও বেশি হয়। তারা পরের কষ্টে সহানুভূতি না জানিয়ে নিজেদের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নেয় যা অত্যন্ত ঘৃণ্য।

১৪.

যে কয় আমাদের তুই
তার বাড়ি যামুনা বছর দুই।

অনেক সময় নিকট আত্মীয় বা পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া বেধে যায়, আর ঝগড়ার মধ্যে অনেকে গালিগালাজও করে থাকে। প্রতিপক্ষের খারাপ ব্যবহারের কারণে, তার সাথে কথা বার্তা এমন কি তাদের বাড়িতে চলাফেরা বন্ধ করে দেয় অন্য পক্ষ। উপরোক্ত প্রবাদে এই বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

১৫.

পুটকিতে গু থাকলে
জিলাপি বানাইয়া হাগা যায়।

সমাজে অনেক বিত্তবান লোক আছে, যাদের প্রচুর অর্থ সম্পদ আছে। প্রচুর অর্থ থাকলে তারা ইচ্ছামতো খরচ করতে পারে এমনকি অনেক সময় বিলাসীতার কারণে প্রয়োজন ছাড়াও অতিরিক্ত খরচ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাদেরকে বলা হয়

www.pathagar.com

অপব্যয়কারী। এখানে বিত্তবানের ইচ্ছেমাফিক অর্থ ওড়ানোর বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৬.

বাপে ব্যাটায় ডাইকি ভাই
কন মতে দিন কাটাই।

আমাদের সমাজে অনেক গরিব ও সাধারণ মানুষ বাস করে। তারা অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করে। অভাবের সংসারে ঠিক মতো পেট ভরে খেতেও পায় না, কোনো মতে পরিবার নিয়ে টিকে থাকাই তাদের জন্যে কষ্টকর। উপরোক্ত প্রবাদে গরিব ও নিরীহ মানুষের অসহায়ত্বের কথা বলা হয়েছে।

১৭.

সেইতো শুয়া শুইলি মাগি
এক বাতির তেল ফুরাইয়া।

এই প্রবাদটিতে সমাজের অলস ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে। অনেক মানুষ আছে কাজের ভয়ে নানা বাহানা করে সময় কাটাতে চায়। শেষমেষ সেই কাজই করতে হয় কিন্তু অনেক সময় ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়।

১৮.

আপন বাড়ি আপন ঘর
ঘুইড়া ঘুইড়া সালাম কর।

বিয়ের পর মেয়েদের নতুন সংসার হয়। এ সময় তাদের সবচেয়ে আপন বাড়ি হলো স্বামীর বাড়ি। স্বামীর বাড়িতে এসে প্রতিটি মানুষের সাথে আস্তে আস্তে মেয়েটি পরিচিত হয়। আপন মানুষের মতো এবং নিজ বাড়ির মতো সবার সাথে মানিয়ে চলতে হয়। এটিই হয়ে ওঠে তাদের কাছের আবাস।

১৯.

কুত্তি ঠাপাইনি
জজের উকিল।

অনেকে আছে ক্ষমতার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেও তারা নিজের এলাকায় সম্মান পায় না। কিন্তু তারা এমন আচরণ করে যেন তাদের দ্বারা সবই সম্ভব। ক্ষমতা না থাকলেও তারা ক্ষমতার দাপট দেখায়।

২০.

বাপে না পুতে
চুঙা চুড়া মুতে।

কেউ কেউ আছে যাদের দেখলে বোঝা যায় না তারা গরিব ঘরের সন্তান। পরিবারে তেমন কিছু নাই, ঠিক মতো খেতে পায় না, কিন্তু চলাফেরা করে অবস্থাপন্ন লোকের মতো, সংসারে কিছু থাক না থাক প্রকাশ করে উল্টোটা। উপরোক্ত প্রবাদ বিশ্লেষণে মূলত এই চিত্রটিই ফুটে ওঠে।

www.pathagar.com

২১.

নারী চিনি মুচকি হাসি
মানিক চিনি জলে ভাসে
ঘোরা চিনলাম কানে
তুমি যে কতুয়ালের ছেলে
চিনলাম তোমার দানে।

আমাদের সমাজে অনেক বৈচিত্রময় মানুষ আছে যাদের আচার আচরণ, চলা ফেরার মাধ্যমে তাদের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। যেমন নারীদের মুখের আকার বা হাসি দেখলে ভালো খারাপ নির্ণয় করা যায়। আবার লেনদেনের মাধ্যমে মানুষের মন মানসিকতা বোঝা যায়। প্রবাদে এ দিকটাই তুলে ধরা হয়েছে।

২২.

সম শনি পূবে বাধা
উত্তরে যাসনি গাধা।

উপরোক্ত প্রবাদের মাধ্যমে মানুষকে সাবধান হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মানুষ আগে দিনক্ষণ মেনে চলত। সোম ও শনিবার পূব ও উত্তর দিকে গেলে ক্ষতি হতে পারে সেই সংস্কারটি এই প্রবাদে তুলে ধরা হয়েছে।

২৩.

পেটে রইলে গুন করে
বার কইরলে খুন করে।

উপরোক্ত প্রবাদের মাধ্যমে কিছু বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষা করলে সমাজে শান্তি আসে। আবার তা প্রকাশ করলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। কিছু কথা গোপন করা উচিত সমাজে সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্যে।

২৪.

পাইনা পাইনা সব
টাইনি তুইলি গায় দেয়।

এই প্রবাদে মানব জীবনের অভাব-অনটনের সাথে বিলাসীতার কথাও প্রকাশ করা হয়েছে। যখন মানুষ অভাবের তাড়নায় সামান্য উপার্জন দিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে চায় তখন এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

২৫.

পিরিত পিরিত পিরিত
গোল মরিচের কাল
পিরিত থাকবে কত কাল।

কোনো ব্যক্তির সাথে যখন কেউ খুব ঘনিষ্ঠ হয় তখন জীবনে চলার পথে সব কিছুতেই ঐ ব্যক্তি সাহায্য করে থাকে, এমনকি নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতেও রাজি হয়ে যায় সে।

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রে প্রীতি বজায় থাকে না। তখন সেই সব চেয়ে বড়ো শত্রুতে পরিণত হয়। এবং বিপদে ফেলার চেষ্টা করে একে অপরকে। এ কারণেই প্রবাদে বলা হয়েছে বন্ধুত্ব হতে দেরি লাগে কিন্তু ভাঙতে সময় লাগে অল্প।

২৬.

চেয়ে রাজা হলে
আর পটল চেনে না।

এই প্রবাদের মাধ্যমে মানুষের অহংকারী মনোভাবের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ গরিব থেকে যখন বড়ো হয় তখন তার মধ্যে অহংকার এসে যায়। তখন তার কাছে অনেক চেনা বিষয় অচেনা হয়ে যায়।

২৭.

পেটে নাই দানা পানি
নাম চোঁদাইচ্ছেন কোম্পানি

সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা মুখে বড়ো বড়ো কথা বলে। পেটে ভাত পায় না কিন্তু কথার বেলায় আছে। এরা খাওয়া পড়া ঠিক মতো পায় না। অনেক সময় না খেয়ে দিন কাটাতে হয় কিন্তু আচরণে প্রকাশ পায় এর উল্টো। প্রবাদে এটিই বলা হয়েছে।

২৮.

টুপলার কাছে টুপলি ঘরে
নাই টুপলা ঘুরে বসে।

কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যদি খাদ্যবস্তুর পোটলা নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সে খুব আদর করে বা খুশি হয়। আর কিছু না নিয়ে গেলে তাকে তেমন মূল্যায়ন করা হয় না, বাড়ির লোক মন খারাপ করে ঘুরে বসে। উক্ত প্রবাদের এটিই মূল কথা।

২৯.

গরিবের ছাওয়াল কম্বেলে বসে
গুয়া হুল হুল করে মিট মিটে হাসে।

উপরোক্ত প্রবাদের মাধ্যমে গরিবের হঠাৎ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। অনেক গরিব মানুষ আছে যারা কখনও নরম তুলতুলে বিছানায় শোয়নি বা তাদের ঐ ধরনের বিছানা তৈরি করার সামর্থ নাই, তারা হঠাৎ করে নরম বিছানা পেলে মনের আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে।

৩০.

হাত কিন লড়লে
পাতকেন লড়ে।

কেউ কোনো জিনিস সহজে কাউকে দিতে চায় না। কিন্তু মন জয় করলে সবই পাওয়া সহজ হয়। মায়েদের হাতের কাজে যদি কোনো মেয়ে সাহায্য করে তবে সেই মেয়ের পাতে মা ভালো এবং বেশি খাবার তুলে দেন। প্রবাদের মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

৩১.
খুদ গুড়ি যে বাছে
তার ভাত নিকটে আছে।

প্রবাদটির মাধ্যমে হিসেবি গৃহিণীর সম্ভাব্য ভবিষ্যত-সুখের কথা ব্যক্ত হয়েছে। চালের মধ্যকার গুড়ো বাছলে তা থেকে অনেক খুদ পাওয়া যায়। এর ফলে অভাবের সময়েও এক বেলা ভাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ হিসেবি লোকের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

এমন আরও অনেক প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে যা প্রচলিত জীবনে বহুল ব্যবহৃত। জীবনের ভালো, মন্দ, হুত, ভবিষ্যত, আনন্দ, শোকে এগুলো গুরুত্ব বহন করে। অল্প কথায় মর্মার্থ বহনকারী এসব প্রবাদ প্রবচনে সামাজিক আচার, রীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে। নাটোর জেলায় প্রচলিত এমন আরও কিছু প্রবাদ-প্রবচন এখানে উল্লেখ করা হলো।

১.
আজ বঝবুনা বুঝবু কাল
ছাই তুলবু আর পারবু গাইল।

২.
শাপ-শালা জমিদার
তিন নয় আপনার।

৩.
পায়নে পাইরে শয়
তুইল্যা তুইল্যা গায়ে দেয়।

৪.
যা দিবে হাতে
তাই যাবে সাথে।

৫.
লোহায় লোহায় আপন হলো
কামার শালা পর।

৬.
আপনের চেয়ে পর ভালো
পরের চেয়ে জঙ্গল ভালো।

৭.
দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা।

৮.
ছাউনির ঘরে চাল থাকে না।

www.pathagar.com

৯.
চাঁই রাজা হলে পটলের ভিঁ (জমি) চেনে না।

১০.
আমি করি বউ বউ
বউ করে নাং নাং।

১১.
এমনিতে নাচোনি বুড়ি
তার উপর ঢোলে বাড়ী।

১২.
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

১৩.
পায় না পঁচা পুটি
খেতে চায় গোশত রুটি।

১৪.
পরের বাড়ির পিঠা
খাইতে লাগে মিঠা।

১৫.
নিজে পায়না শুতে জায়গা
শঙ্করের মাকে মইধ্যে ঢোকা।

১৬.
হাড় খাব মাংস খাবো
চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজাবো।

১৭.
আমার পাটা আমার লুরা
আমার ভাঙে দাঁতের গুরা।

www.pathagar.com

১৮.
চোরের মায়ের বড় গলা।

১৯.
প্রথমে দর্শনধারী তারপরে গুণ বিচারী।

তথ্যসহায়ক

১. মো. আবুল হোসেন, পিতা : মৃত : উপচান হোসেন, গ্রাম : কাদির গাছা, পোস্ট : ভাগনাগর কান্দি, থানা : সিংড়া, বয়স : ৬০ বছর, পেশা : কৃষিজীবি
২. শাপলা বেগম, স্বামী : মো. শাহাদাৎ আলী, গ্রাম : বোজরা হাট, পোস্ট : ভাগনাগর কান্দি, থানা : সিংড়া, নাটোর, বয়স : ৩০ বছর, পেশা : গৃহিণী
৩. মোছা. শাহনাজ পারভীন, পিতা : মো. আকুব্বার আলী, গ্রাম : মানপাড়া, পোস্ট : বড়াইগ্রাম, থানা : বড়াইগ্রাম, নাটোর, বয়স : ৩০ বছর, পেশা : গৃহিণী
৪. মোছা. মাছুরা বেগম, স্বামী : মো. আনসার আলী, গ্রাম : হিজলী, পোস্ট : ভাগনাগর কান্দি, থানা : সিংড়া, বয়স : ৩৮ বছর, পেশা : গৃহিণী

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

নাটোর জেলার অধিবাসীরা সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে নানারকম লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার করে আসছেন। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় যদিও এসব প্রযুক্তি আধুনিক রূপ পাচ্ছে, তবুও যুগ যুগ ধরে চলে আসা এসব প্রযুক্তির ব্যবহার এখনও টিকে আছে সমান জনপ্রিয় হয়ে। চাষাবাদ, কাঠের কাজ, মৎস্য শিকার এবং লোকযানে এ সব প্রযুক্তির আবেদন এতটুকু ম্লান হয়নি। এখানে আলাদা করে লোকপ্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হলো :

১. কাঠের কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

কুঠার : নাটোর জেলায় এই হাতিয়ারটি কুড়ুল বা বাইশলি নামে পরিচিত। সাধারণত কোনো বিশাল আকৃতির গাছের মূল ছেদনের জন্যে কুঠারের আবশ্যকতা রয়েছে। এছাড়া গাছ কাটার পর সেই গাছের শাখা-প্রশাখা কর্তনের ক্ষেত্রেও প্রথমেই কুঠার ব্যবহার করতে হয়। কুঠার তৈরি হয় একখণ্ড লোহার সাহায্যে। এর সামনের ভাগ পাতলা ও ধারালো, পেছনের দিক ক্রমান্বয়ে পুরু। শেষের দিকে থাকে গোলাকৃতি ফাঁকা একটি অংশ। এর মধ্যে দেড় বা দুফুট লম্বা ও গোলাকার একটি খণ্ড প্রবিষ্ট করানো হয়। এটি ব্যবহৃত হয় হাতল হিসেবে।

করাত : বিশাল আকৃতির গাছ কাটার ক্ষেত্রে কুঠারের বিকল্প হিসেবে করাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া আসবাবপত্র তৈরি করার সময় কাঠ গঠনোপযোগী করার ক্ষেত্রেও করাতের ব্যবহার দেখা যায়। করাত দুই প্রকার। বড়ো করাত ও ছোটো করাত। বড়ো আকৃতির একটি করাত টানার জন্যে ৩ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এরা করাতি নামে পরিচিত। করাতিরা সূত্রধর শ্রেণির অর্ন্তগত নয়। বরং এরা ধর্মের দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত। করাতিরা বড়ো করাতের সাহায্যে বিশাল আকৃতির কাঠের গুড়ি চেরাই করার ভূমিকা পালন করে থাকেন।

বাটালি : কাঠের খণ্ডকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে করাতের পরিবর্তে বাটালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া কাঠের অংশবিশেষে গর্ত বা ছিদ্র করা বা বিশেষ কোনো আকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রেও বাটালির ব্যবহার রয়েছে। বাটালি দুই প্রকারের, চেপ্টা ও গোলাকৃতি। গোলাকৃতির বাটালি আবার দু প্রকারের। গোল বাটালি ও বিম বাটালি। চেপ্টা বাটালি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কাঠ ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করা বা আংশিক খণ্ডিত অংশকে মসৃণ অথবা সমান করার জন্যে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কাঠের ব্যবহার উপযোগী রূপ দেওয়ার জন্যে।

অন্যদিকে গোলাকৃতির বাটালি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কাঠ ছিদ্র করার জন্যে। বাটালি প্রস্তুত হয় লোহার প্লেটের সাহায্যে। এটি দৈর্ঘ্যে আধাফুট অথবা তারও কম, প্রস্থে এক ইঞ্চি পর্যন্ত। নিচের দিক প্রচণ্ড ধারালো। ওপরের দিকে থাকে কাঠের বাটা, গোলাকৃতি বাটালির নিচের দিকের লোহা কিছুটা চারকোণ বিশিষ্ট, নাটোর জেলার দিঘাপতিয়া গ্রামের বাসিন্দারা এটিকে বাটালি বা বাটলি এবং নাততুল বলে থাকেন।

www.pathagar.com

হাতুড়ি : বাটালির কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে হাতুড়ির ওপর। হাতুড়িকে এদিক থেকে বলা যায় ছুতারের প্রধান হাতিয়ার। বাটালির ওপর হাতুড়ির আঘাত না পড়া পর্যন্ত কাঠ খণ্ড করা সম্ভব হয় না। এদিক থেকে হাতুড়ি ও বাটালির সম্পর্ক পারম্পরিক। হাতুড়ি প্রস্তুত করা হয় লোহার সাহায্যে। হাতুড়ির সম্মুখ ভাগ গোলাকৃতির। পেছনের দিকটা সরু। মাঝখানে থাকে গোলাকৃতির ফাঁকা অংশ। এর মধ্যে একটি গোল কাঠের খণ্ড ঢুকিয়ে হাতল তৈরি করা হয়। এলাকা বিশেষে হাতুড়ির আকৃতি হেরফের দেখা যায়।

আগর ও ভোমর : এ দুটি হাতিয়ার কাঠ ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রথম হাতিয়ারটি দুই হাতের সাহায্যে শক্ত করে চেপে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাঠ ছিদ্র করা হয়। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ছিল মেসিন বা ভোমরের ব্যবহারবিধি যথেষ্ট বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের। কারণ ভোমরের সঙ্গে থাকে কাঠের দুটি অংশ। নিচের অংশের সঙ্গে ভোমরটি স্থিরভাবে আটকানো থাকে। ওপরের অংশে থাকে কাঠের আরও একটি খণ্ড। এটি ঘূর্ণন উপযোগী। ঐ অংশটির সঙ্গে রশি পেচিয়ে তা আরেকটি কাঠের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়। ভোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একজন শিল্পী কাঠের নানা অংশে প্রয়োজন অনুসারে ছিদ্র করে থাকেন।

রেন্দা : কাঠ মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত এই রেন্দা নানা আকৃতি ও নানা নামে পরিচিত। লোহার খুব ধারালো একটি প্লেট এক বা দেড় ফুট লম্বা এবং চার কোণাকৃতি একটি ফ্রেমের এক প্রান্তে প্রবিষ্ট করিয়ে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। রেন্দার একটি অংশ থাকে শক্ত করে ধরার জন্যে। কাঠের যে অংশে রেন্দার প্লেট স্থাপন করা হয় তার কিছুটা ওপরের অংশে আরেকটি কাঠের খণ্ড স্থাপন করা হয়। সাধারণত এটি ধরেই সূত্রধর কাঠের ওপর রেন্দা স্থাপন করে ঘর্ষণ দিতে থাকেন। ফলে কাঠ ধীরে ধীরে অমসৃণ অবস্থা থেকে মসৃণতা লাভ করে। এলাকা বিশেষে রেন্দার আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে এর নামের কোনো পরিবর্তন সাধারণত দেখা যায় না।

স্কেল বা মাটাইল : একজন সূত্রধর যখন কাঠের বিশেষ বিশেষ একটি শিল্প সম্ভার তৈরির সিদ্ধান্ত নেন তখন প্রথমেই প্রয়োজন হয় একটি স্কেল বা মাটাইলের। আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের গুণে এর অন্য নাম মাটাম বর্তমানে সব ছুতারই বাজার থেকে কেনা স্কেল ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আগের দিনে এমনকি গ্রাম পর্যায়ে এখনো ছুতারের হাতে তৈরি পরিমাপক যন্ত্রই এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো।

কুসুত বা চিহ্ন প্রদেয় হাতিয়ার : এই হাতিয়ারটি স্কেলের অনুরূপ কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কাঠের ওপর লম্বালম্বি কোনো দাগ টানার জন্যে এই হাতিয়ারটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত দুই প্রকারের। সিঙ্গল কুসুত ও ডাবল কুসুত। কুসুত তৈঁতুল কাঠের তৈরি। অনেক সময় জাম কাঠ দিয়েও এটি তৈরি হয়।

জাম্বুরা : পেরেক বা ছোট লোহা কাঠের যথাস্থানে স্থাপন করার সময় বেঁকে গেলে অথবা একস্থান থেকে তুলে করে অন্য স্থানে স্থাপনের জন্যে দুইবাহু বিশিষ্ট লৌহ নির্মিত একটি হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়, সেটি নাটোর অঞ্চলে জাম্বুরা নামে পরিচিত।

প্যাচকষ বা স্ক্রু-ড্রাইডার : ছোটো লোহার কাঁটা বিশেষ স্থানে স্থাপন করার পর সেটিকে যথোপযুক্তভাবে প্রবিষ্ট করানোর জন্যে ব্যবহৃত হাতিয়ারটির নাম প্যাচকষ বা স্ক্রু-ড্রাইডার।

র‍্যাদ : লোহার ধারালো হাতিয়ারগুলো বারংবার ব্যবহারের ফলে ভোঁতা হয়ে পড়ে, তখন এগুলো পুনরায় ধারালো করতে হয়। এজন্যে র‍্যাদ একটি উপযোগী প্রযুক্তি।

www.pathagar.com

২. লোকযান প্রযুক্তি

পরিবহন সুবিধায় লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার বহুযুগ আগে থেকে হয়ে আসছে। দেশের অন্যান্য স্থানের মতো নাটোরেও প্রাত্যহিক জীবনে গরুর গাড়ি, নছিমন, নৌকা এসবের ব্যবহার রয়েছে।

নছিমন : নছিমন বিভিন্ন স্থানে কালামন, বউ দুলালী, ভুটভুটি নামে সুপরিচিত। ভুটভুটি বা নছিমন সর্বপ্রথম কাঠের ভ্যান ছিল। এটির চাকা ছিল তিনটি। একজন ড্রাইভার পায়ের সাহায্যে এটি চালনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে এটি মেশিনের সাহায্যে চালানো হচ্ছে। লোক প্রযুক্তির মধ্যে অন্যতম স্থলযান হচ্ছে নছিমন আর জলযান হচ্ছে নৌকা।

নৌকা : নৌকা মাছ ধরার জন্যে এবং মানুষ ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নদী পথে বহুল ব্যবহৃত একটি জলযান। মাছ ধরার নৌকা ১১ থেকে ১২ হাত পর্যন্ত হয়। পরিবহন নৌকা ছেলো বা ইঞ্জিন চালিত হয়ে থাকে। নৌকা সাধারণত শিমূল এবং আম কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এটি তৈরিতে কড়াই এবং শিলা বা শিশু ও প্যালেনসিট লাগে, পরে আলকাতরা ও ধুপ দেওয়া হয় যাতে পানি উঠতে না পারে, ১২ হাত নৌকা হলে তিন হাত প্রস্থে হবে। নৌকা যদি ১১ হাত হয় তাহলে প্রস্থে পৌনে তিন হাত হবে। নৌকায় মাঝি, বাজু, দাউনি, টাইট, বৈঠা, গোছা, চাওপাট ও তলি থাকে।

৩. মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

কুমোরের চাক : চাকের ব্যবহার সিংড়ার পাল পাড়ায়, এছাড়া নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চাকের ব্যবহার বেশি। লালপুর থানার ওয়ালিয়া পালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা কাত্তিক চন্দ্র পালের তথ্যমতে চাক হচ্ছে আড়াই থেকে তিন ফুট ব্যাসার্ধের একটি গোলাকার চাকা। এর নির্মাণ কৌশল ভিন্নরকম। প্রথমেই বাঁশ কেটে তিনটি রিং তৈরি করা হয়। রিংগুলো আকারে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে একটির ওপর আর একটি সাজানো যায়। বাঁশের তৈরি এই তিনটি রিং ভালোভাবে আংটার সাহায্যে আটকানো হয়। নারিকেলের ছোবড়া, চুন, আঁশ ও চুল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বাঁশের তৈরি গোলাকার চাকার চারপাশে পুরু প্রলেপ দিয়ে পনের থেকে ত্রিশ দিন অল্প রৌদ্রে শুকানো হয়। এরপর চাকতির ভেতর দিক থেকে চারটি কাঠের পাটি তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এই চাকপাটিগুলোতে গজারি ব্যবহার করা হয়, তারপর এই চাকপাটির ৩ চাকার মাঝখানে অপর একটি মাঝারি আকারের কাঠের টুকরো লাগিয়ে দেওয়া হয়, লালপুরে একে চাকের মতি বলে-এটি তেঁতুল কাঠের তৈরি। আর একটি কাঠের টুকরার মধ্যাংশ ছিদ্র করে একটি পাথর বসানো হয় এবং খড় কাঠ বা মেহগনি মতির চারপাশে জোড়া দেওয়া হয়। এরপর একটি ডালা ও একটি ফুতি থাকে। কাঠটির চারভাগের তিন ভাগ মাটি খুঁড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যাতে এটি শক্ত ভাবে মাটিতে আটকে থাকতে পারে এবং এই মাটিতে বসানো কাঠের খণ্ডটির মধ্যাংশের পাথরের ওপর বাঁশের চাকাটি বসিয়ে দেওয়া হয়। এতে চাকটি সহজেই পাথরের ওপর ঘুরতে পারে।

www.pathagar.com

ছাঁচ বা আতাইল : আতাইল এক বা দেড় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট গোলাকৃতির মসৃণ পাত্র বিশেষ। এটি সাধারণত কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। কোনো এলাকায় মাটির আতাইলও দেখা যায়।

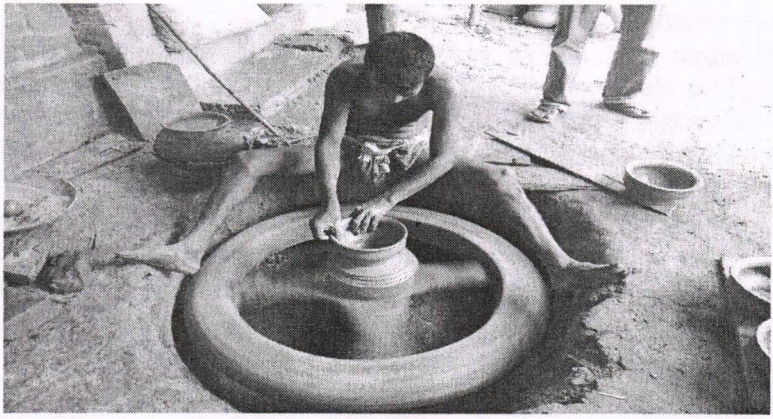

চাকে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করা হচ্ছে

পারা : এটি মাটির তৈরি ছাঁচ। এর আকৃতি অনেকটা কলসির মতো তবে চেপ্টা, গোল, গভীর ইত্যাদি আকারেরও হতে পারে।

পিটনা : এটি একটি কাঠের হাতল বিশেষ। এর ওপরে নকশার প্রতিলিপি অঙ্কিত থাকে।

বোল্যা : স্থানভেদে এই প্রযুক্তিটি বৌক্কা নামে পরিচিত। এটি মাটির পাত্র মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তান্না : এটি ক্ষুদ্রাকৃতি হাতুড়ির অনুরূপ একটি হাতিয়ার, কাঠ অথবা মাটির সাহায্যে তৈরি করা হয়। এর ওপরেও বিভিন্ন প্রকারের নকশা অঙ্কিত থাকে। মৃৎপাত্রে নকশা করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

খেয়াজাল বা ঝাঁকিজাল : এই জালের নিম্নভাগে যুক্ত থাকে লোহার ছোটো ছোটো অনেকগুলো গুটি বা বল। মৎস্য শিকারি যখন জালটি জলাশয়ে নিক্ষেপ করেন তখন সেটি গোলাকৃতি হয়ে পানির ওপরে পড়ে তলিয়ে যেতে থাকে এবং অতি দ্রুত প্রায় মাটি স্পর্শ করে। এর ফলে মাছের জাল থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। মাছগুলো জালের মধ্যে আটকে পড়ে। সাধারণত খেয়া জালে ক্ষুদ্রাকৃতির মাছ ধরা পড়ে।

কটিখড়া বা ধর্মজাল : এটি খেয়াজাল অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নাকৃতির। এর গঠন অনেকটা ছাতার মতো। চারটি বাঁশের অগ্রভাগে জালটি বেঁধে দেওয়া হয়। এর গোড়ার দিকে একটি জায়গায় বাঁশ ৪টি যুক্ত থাকে। যেমনটি যুক্ত থাকে ছাতার শলাকা। এর সঙ্গে আরেকটি লম্বা বাঁশের টুকরো বাঁধা হয় যেটি জেলের হাতে থাকে। তিনি তার হাতে ধরা বাঁশের সাহায্যে জালটিকে পানিতে ডুবিয়ে রাখেন এবং কিছু সময় পর পর

www.pathagar.com

পানির ওপরে সেটি তুলে মাছ সংগ্রহ করেন। এতে অনেক সময় চলমান মাছের ঝাঁকও আটকা পড়ে।

মইজাল : মইজালে মাছ ধরতে দুজন লোক দরকার হয়। এটির আকার অনেকটা মইয়ের মতোই।

বেড় জাল : বেড় জাল নৌকায় বসে মাছ শিকার করতে ব্যবহৃত হয়। বেড় জালে সুতা, লোহার কাঠি এবং শোলা থাকে।

ছাকনাজাল : সাধারণত টাকি ও শোল মাছের পোনা শিকারের জন্যে এই জালের ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোটো। এটি একজনের ব্যবহার উপযোগী। এর গঠন প্রকৃতি অনেকটাই খড়া জালের অনুরূপ। এই জালের বুনন অত্যন্ত ঘন, মোটা বস্ত্রের মতো।

চারো : এটি তৈরি হয় বাঁশের শলাকা দিয়ে। শলাকাগুলোকে অপেক্ষাকৃত চিকন রশি দিয়ে গাঁথা হয়। চারোর গঠন প্রকৃতি অনেকটাই হরতন তাসের মতো। যার উচ্চতা হয় ১ ফুটের মতো। এতে সামনের অংশে পায়রা থাকে যার ভেতরে মাছ প্রবেশ করে।

ভাঁইড় : এটিও তৈরি হয় বাঁশ ও রশির সাহায্যে। ক্ষেত্রভেদে রশির পরিবর্তে বেত ব্যবহার করতে দেখা যায়। এটি লম্বায় ৩ ফুট, প্রস্থে দেড় ফুট। ঢাকনি ও তলার অংশ এক ফুট বিশিষ্ট। এর সামনের দিকে পকেটের মতো দুইটি পায়রা থাকে। এ পায়রাগুলো নির্মাণে কিছু বৈজ্ঞানিক উপায় লক্ষ্য করা যায়। এগুলো তৈরি হয় বাঁশের শলাকা দিয়ে তারপর রশি দিয়ে বাঁধা হয়। পায়রাগুলো এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যাতে পেছনের অংশটি সব সময়ই পরস্পরের দিকে লেগে থাকে। যে কারণে মাছ একবার ভাঁইড়ের মধ্যে প্রবেশ করলে আর বের হতে পারে না। ভাঁইড় স্থাপন করা হয় স্রোত আছে এমন জলাশয়ে। ভাঁইড়ের মুখটি থাকে স্রোতের অনুকূলে। কারণ মাছের গতি স্রোতের প্রতিকূলে।

খৈলসুন বা দিয়াইর : মাছ শিকার করার অন্যতম একটি হাতিয়ার এটি। তৈরি হয় বাঁশ ও রশির সাহায্যে এবং এর গঠন প্রকৃতি অনেকটাই ভাঁইড়ের মতো। এরও সামনের দিকে একটি পারা থাকে। সাধারণত খৈলসুন ব্যবহৃত হয় অপক্ষোকৃত অগভীর পানিতে।

পলই : এটিও বাঁশের তৈরি। এতে সাধারণত কাঁদায় লুকিয়ে থাকা মাছ ধরা হয়। নাটোর জেলায় মাছ ধরার ক্ষেত্রে এর ব্যপক ব্যবহার হয়ে থাকে।

কুচা : একে অনেক স্থানে কোচ বলেও ডাকা হয়। তল্লা বাঁশের বিশেষ একটি অংশ কেটে কোচের কাঠামো তৈরি করা হয়। এক ফুট লম্বা দণ্ডের অগ্রভাগে গোলাকৃতি লোহার স্বার এবং টোপের কালি পরিয়ে দেওয়া হয়। বর্ষাকালে ধানের খেতে স্বচ্ছ পানিতে মাছ শিকারি দূর থেকে মাছের দিকে কুচা নিক্ষেপ করে। আবার এটি অনেক আপদ বিপদ থেকেও রক্ষার জন্যে বাড়িতেও ব্যবহার করা হয়।

ছিপ/বড়শি : ছোটো আকৃতির একটি বড়শি প্রথমে সুতার অগ্রভাগে বাঁধা হয়। সুতা ৩ থেকে ৪ ফুট পরিমাণ লম্বাকৃতির হয়ে থাকে। কঞ্চির অগ্রভাগে সুতার মাঝ

www.pathagar.com

বরাবর একটি লম্বাকৃতির শুকনো শোলা কেটে দেওয়া হয়। একে টিপে বলে, ফাতা, ফাজারি, ফাতনা ইত্যাদি নামেও এটি পরিচিত। ছিপের সঙ্গে মাছের খাদ্য হিসেবে টোপ গেঁথে দেওয়া হয়। যেমন, কেচোঁ, ময়দা, শক্ত ভাত ইত্যাদি।

সরা বা মালই : এটি পুঁটি মাছ ধরার জন্যে ব্যবহার করা হয়। সরা সব অঞ্চলে পাওয়া যায় না।

লাঙল : জমি উত্তমরূপে চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে কৃষক কৃষি প্রযুক্তির যে উপকরণটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন সেটি হলো লাঙল। সুদূর অতীতকাল থেকে সারা বাংলায় লাঙলের ব্যবহার চলে আসছে। লাঙল তৈরির জন্যে বাবলা গাছ অধিকতর উপযোগী। কারণ বাবলা গাছ নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এর ফলে লাঙলের গঠনশৈলীতে বাবলা গাছ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। লাঙলের পাঁচটি অংশ থাকে। যেমন, হাতল, বাঁট, খিল, ফাল ও ঈষ। অধিকাংশ এলাকার হাতল ও ঈষ কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে অঞ্চল বিশেষে এ দুটো অংশে বাঁশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

জোয়াল : লাঙলের অত্যাবশ্যক সহায়ক অঙ্গ জোয়াল। জোয়াল তৈরি হয় কাঠ অথবা বাঁশ দিয়ে। বিশেষ মাপের হয়ে থাকে। সাধারণত এর দৈর্ঘ্য ৪ ফুটের মতো, গাদার আকৃতি ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি পরিমাপের। এটি সাধারণত বাঁশের তৈরি হয়। জমি কর্ষণের জন্যে লাঙল জোয়ালের সঙ্গে একজোড়া গরু বা মহিষের প্রয়োজন হয়। গরুর কাধেঁ জোয়াল চাপিয়ে একটি রশির সাহায্যে লাঙলটিকে জোয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জোয়ালের দুপাশে থাকে লম্বাকৃতির কানফুলা সিমলা। সিমলা এবং কানফুলার সঙ্গে গরুর গলার রশি এবং জোয়ালের জোত সংযোজিত করা হয়। কানফুলা গরু দুটোকে বিচ্ছিন্ন রাখে। জোয়ালের সঙ্গে লাঙলটিকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর কৃষক লাঙল মাটির ওপর চেপে ধরে গরুকে সামনে চলার তাগিদ দেয়। চলতে থাকে ভূমিকর্ষণের পক্রিয়া।

কোদাল : জমি বপনোপযোগী করার ক্ষেত্রে লাঙলের পরই স্থান কোদালের। বিশেষ করে অধিকতর শক্ত মাটি আলগা করার জন্যে কোদালের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কারণ অধিক শুষ্ক, এঁটেল ও আগাছাপূর্ণ মাটিতে প্রথমে লাঙল ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে নিতে হয়। এছাড়া জমির আইল পরিষ্কার করতে, জমির কোনায় যেখানে লাঙল ঘোরানো সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রেও কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করা হয়। কখনো কখনো সারিবদ্ধ ফসলের জমিতে, যেমন আখের খেতে, আলুর খেতে দুই সারির মাঝের ময়লা পরিষ্কার বা ছোটো ছোটো আগাছা উৎপাটনের জন্যে কোদাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোদালের দুটো অংশ। একটি লোহার প্লেট, অপরটি বাঁশের বা কাঠের হাতল। লোহার প্লেটের সঙ্গে লম্বাকৃতির একটি বাঁশের খণ্ড সংযোজন করে এটি তৈরি করা হয়ে থাকে।

মই : কর্ষিত জমির মাটিকে উত্তমরূপে পরিপাটি করার জন্যে মইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। লাঙল দিয়ে কর্ষণের পর জমিতে যে মাটির দলা ওঠে তাকে চূর্ণ করার

www.pathagar.com

জন্যে মই আবশ্যক। এছাড়া জমির আগাছা পেষণ বা দলন, মাটিকে সমতল করা, সঙ্গে মাটির দৃঢ়তা আনার ক্ষেত্রেও মই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মই প্রস্তুত করা হয় বাঁশের সাহায্যে। এর দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে সাধারণত সাড়ে ৪ ফুট। দুটো বাঁশের গাদার মধ্যে পারস্পারিক ব্যবধান তৈরির ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১০ টি খিলের ব্যবহার করা হয়। খিলগুলো তৈরি হয় বাঁশ দিয়ে। লাঙলের মতো মই টানার ক্ষেত্রেও এক জোড়া গরু বা মহিষের প্রয়োজন। টানার সময় কৃষক লাঙলের ঈষ চেপে ধরে থাকে কিন্তু মই টানার সময় কৃষককে মইয়ের ওপর দুই পা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পিঠে হাত রেখে অগ্রসর হতে হয়।

মগুর : এটি ইট চূর্ণ করার জন্যে ব্যবহৃত। মাটির ঢেলা চূর্ণ করার ক্ষেত্রে মইয়ের সহায়ক উপকরণ হিসেবেই মুগুরের ব্যবহার হয়ে থাকে। কৃষিজ এই উপকরণটি অঞ্চল বিশেষে ইটা মুগর, ঢেলা ভাঙা, কুড়িশ নামেই বেশি অভিহিত হতে দেখা যায়। নাটোর অঞ্চলে এটি কুড়িশ নামে পরিচিত। এটি নির্মিত হয় কাঠ ও বাঁশের সাহায্যে। সাধারণত দেড় ফুট লম্বাকৃতির একটি কাঠের খণ্ডের মাঝখানে ৩ ফুট লম্বা একটি বাঁশের খণ্ড প্রবিষ্ট করিয়ে মুগুর তৈরি হয়।

নাইঙ্গেলা, লাঙ্গুলা, আচড়া বা বিদা : বাংলার কৃষিক্ষেত্রে নাইঙ্গুলার গুরুত্ব অপরিসীম। চাষের এই উপকরণটিকে একেক এলাকায় একেক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নাটোরে এটি নাইঙলা নামে সুপরিচিত। সাধারণত ফসলি জমির মাঝখানের আগাছা উপড়ে ফেলা, চারার পরিমাণ কমিয়ে ফেলা এবং অনেক ক্ষেত্রে মাটি আলগা করার জন্যে নাইঙলার ব্যবহার হয়ে থাকে। নাঙলা তৈরিতে কাঠ, বাঁশ, ও লোহার দরকার হয়। নাঙুলা সাধারণত দৈর্ঘ্যে ৪ থেকে সাড়ে ৪ ফুট এবং এর গাদার আকৃতি ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ হয়ে থাকে। গাদার মধ্যে থাকে ১৮ থেকে ২০টি খিল। সাধারণত খিলগুলো তৈরি হয় লোহা দিয়ে। এলাকা বিশেষে বাঁশের খিলও লক্ষ্য করা যায়। গাদার মাঝখানে লাঙলের অনুরূপ হাতল ও বাট থাকে। সামনে থাকে লাঙলের ঈষের মতো ঈষ।

নিড়ানি বা পাচন : ফসলি জমির মাঝখানে যে সব আগাছা জন্মে সেগুলো অনেক সময় নাঙুলাতে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া নাঙুলাতে আগাছা উচ্ছেদ হলেও অনেক আগাছার শিকড় মাটির গভীরে থাকে। এ ধরনের আগাছা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে নিড়ানির ব্যবহার হয়। নিড়ানি অঞ্চল বিশেষে গঠন প্রকৃতির দিক থেকে ভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। এতে একটি লোহার প্লেটের সঙ্গে অল্প বাঁকানো লোহার অংশ লাগানো থাকে। এই অংশটির সঙ্গে কাঠের একটি বাট লাগিয়ে ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

কাস্তে বা কাঁচি : ফসল কাটার জন্যে কাস্তে বা কাঁচির কার্যকারিতা সর্বাধিক। কাস্তে তৈরির জন্যে লোহা ও কাঠের দরকার হয়। একদিকে ধারালো লোহার প্লেটের শেষ প্রান্তে কাঠের বাট বা হাতল লাগিয়ে কাঁচি প্রস্তুত করা হয়।

হাসুয়া : এর গঠন প্রণালী অনেকটাই কাস্তের অনুরূপ। কাস্তের সামনের দিক ধারালো কিন্তু হাসুয়ার সামনের দিকে ধারালো হলেও দাঁতালো নয়।

www.pathagar.com

দাওলি : চাষের উপকরণ হিসেবে কাস্তের পাশাপাশি দায়ের একটি ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। দা যেহেতু কাঁচির তুলনায় কিছুটা ভারি, এ কারণে কাঁচি দিয়ে যেসব শক্ত আগাছা তোলা কঠিন, সেসব ক্ষেত্রে দায়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া বাঁশ, গাছের ডাল এবং জমির আইলের আশপাশে যে সব আগাছা জন্মে সেগুলো পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও দায়ের ব্যবহার হয়ে থাকে।

সেউতি/ছেঁউতি : নাটোর জেলায় কৃষকের মাঝে সেউতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গঠন প্রকৃতির দিক থেকে সেউতি দুই প্রকারের যেমন, ছোটো ও বড়ো।

ছোটো সেঁউতি : ছোটো সেউতি তৈরি হয় বাঁশের সাহায্যে এবং বড়ো সেউতি কাঠের সাহায্যে। এর সামনে ও পেছনে রশি বেঁধে দু দিক থেকে দু'জন কৃষক চেপে ধরে জলাশয় থেকে জল তুলে নেয় এরপর তারা সামনের দিকে উঁচু করে টান দেয় এবং জমিতে সেচ দেয়।

বড়ো সেঁউতি : আড়াআড়ি দুটি বাঁশ পুতে তার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সরু রশি বেঁধে আরেকটি লম্বা বাঁশ লাগিয়ে কাঠের সেঁউতিকে কাজের উপযোগী করা হয়। সেঁউতি তৈরি করে ছুতার। কাঠের খোল সেঁউতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত শুকনো তাল ও নারিকেল গাছ গর্ত করে খোল তৈরি করা হয়। বাঁশের হাতল ধরে পা দিয়ে চাপের মাধ্যমে সেঁউতিকে সেচ কাজে লাগানো হয়।

কাকতাড়ুয়া : নাটোর জেলার সিংড়ায় এবং গুরুদাসপুর থানায় কাকতাড়ুয়া লক্ষ্য করা যায়। জমিতে যখন ধান পেকে যায় তখন নানা প্রকার পাখির উপদ্রব ঘটতে থাকে। এই উপদ্রব থেকে নিস্কৃতির জন্যে বাঁশ, খড় অথবা ছন দিয়ে মানুষের মতো দেখতে একেকটি মূর্তি গঠন করে জমির বিভিন্ন স্থানে খুঁটির সাহায্যে দাড় করিয়ে রাখা হয়। ফলে পাখির মনে এক প্রকার ভীতি গড়ে উঠে। এতে পাখির উপদ্রব অনেকটাই কমে যায়। এছাড়া এই মূর্তি স্থাপনের পেছনে কিছু লোকবিশ্বাসের ভূমিকাও রয়েছে।

জালা/কোলা/ভাণ্ড : গ্রামের কৃষকেরা শুষ্ক ধান রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বাঁশ নির্মিত বিভিন্ন আকৃতির ভাণ্ড ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোকে গোল, ডোল, বেড় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। উত্তরবঙ্গে কোনো কোনো এলাকায় মাটির তৈরি বিশাল আকৃতির ভাণ্ডকে জালা, কোলা ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়।

কুঠি : কুঠি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। আমন বা আউশ ধান তোলা হলে তা কুঠির মধ্যে রাখা হয়। কুঠি দুরকম হতে পারে। বড়ো বা ছোটো কুঠি। বড়ো কুঠিতে ৩০ মন ধান ধরে আর ছোটো কুঠিতে ধান ধরে ১৫ থেকে ২০ মন। কুঠির মধ্যে ধান, চাল, কালাই, গম, সরিষা ইত্যাদি নিরাপদে থাকে। এমনকি কোনো ইঁদুর বা পোকামাকড় আক্রমণ করতে পারে না।

হোর পাট ও টানা পাট : হোর পাট ও টানা পাট ধান টানা কাজে ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টি আসলে বা ধান শুকালে টানা পাট ও হোর পাট ব্যবহার করা হয়। এই দুটি ছাড়া ধান শুকানো কঠিন। এটি কাঠের তৈরি, হাতল বাঁশের নির্মিত।

হোরপাট ও ঝাটা : ধান যখন আঙিনায় রোদে শুকানো হয় তখন পা দিয়ে মাঝে মাঝে এপিঠ ওপিঠ করা হয়ে থাকে। শুষ্ক ধান জমিয়ে রাখার জন্যে দুটি হাতিয়ার

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যার একটির নাম হোরপাট, অপরটি নাম বাড়ুন। এলাকা বিশেষে বাড়ুনকে ঝাটা নামের অভিহিত করা হয়। হোরপাট নির্মিত হয় চন্দ্রাকৃতির একখণ্ড কাঠের সঙ্গে ৩ ফুট লম্বা একটি বাঁশের খণ্ডের সাহায্যে।

কাড়াইল : কাড়াইল ধানের মতো শুষ্ক খড় এপিঠ ওপিঠ করার জন্যে ব্যবহৃত ৪ ফুট লম্বাকৃতির বাঁশের তৈরি একটি হাতিয়ার। লোকভাষায় এটি কাড়াইল নামে পরিচিত। এতে চিকন বাঁশের মাথায় বাঁকানো যে শক্ত কঞ্চিটি সংযুক্ত থাকে মূলত সেটিই খড় এপিঠ ওপিঠ করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

জাঁতা : ডালের খোসা বিচ্ছিন্ন করার জন্যে জাঁতার ব্যবহার হয়ে থাকে। জাতা তৈরি হয় ভারি এবং গোলাকৃতির দুখণ্ড পাথরের সাহায্যে। এবং মধ্যাংশে থাকে গোলাকৃতির একটি ছিদ্র। ডাল পেষণের সময় মধ্যভাগে একটি শক্ত খুঁটি বসিয়ে ভূমিতে আটকে রাখা হয়, এরপর ডাল ওপরের অংশে ঢুকিয়ে আরেকটি কাঠির সাহায্যে ঘোরানো হয়। ডাল দুই পাথরের ঘষায় পিষ্ট হতে থাকে। এর ফলে ডালের ভোজ্য অংশ ও খোসা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নাটোরে কুমোরেরা পাথরের জাতার মতো মাটির সাহায্যে ছোটো ছোটো কিছু জাতা তৈরি করে থাকেন। এ জাতীয় জাঁতা একমাত্র তিল পেষা ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার হয় না।

বাউক : সাধারণত দুপাশের দুটি ডালি নেওয়ার জন্যে মাঝে একটি বাঁশ বা বাউক থাকে। এই বাউকের দুপাশে চারটি করে আটটি দড়ি বা রশি দিয়ে বাধা থাকে। বাউক দিয়ে ফসল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়। এমনকি জৈবিক সার তথা গোবর, আবর্জনা ইত্যাদি স্থানান্তরের কাজে বাউক ব্যবহার করা হয়।

তেকাইটা : বাঁশ দিয়ে তৈরি এবং দড়ি বা রশি দিয়ে ঝোলানো থাকে। এটির ওপর হাড়ি-পাতিল এবং রান্নার সামগ্রিক জিনিস রাখা হয়।

কুচি : এটি বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। খই, মুড়ি, ভুট্টা, গম ভাজা কাজে এটি ব্যবহৃত করা হয়।

মোনাই ও মোঙ্গর : গরুকে ঘাষের মাঠে রাখার জন্যে খুট ব্যবহার করা হয়। আর এই খুটকে মাটিতে পোতার জন্যে মোনাই বা সোদার ব্যবহার হয়ে থাকে।

টাইকে : সুতা গোছানো হয়। এটি বাঁশ বা কাঠের তৈরি হয়। দেখতে অনেকটা ইংরেজি অক্ষরেব মতো।

লুড়ি : লুড়ি দিয়ে ঘরের মেঝে লেপে দেওয়া হয়। এমনকি ঘরের দেওয়াল ও লেপা তবে মাটির দেয়ালে এটি বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি দিয়ে মাটির কাজে এবং আঙিনা থেকে শুরু করে সবখানে লেপা যায়।

লটি : লটি সাধারণত বাঁশের তৈরি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় কাঠের তৈরি হয়ে থাকে। লটি সাধারণত দড়ি কিংবা রশি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঠেইংগা : এটি কাঠের তৈরি হয়। আবার অনেক পরিবারে লক্ষ্য করা যায় স্টিল কিংবা লোহার তৈরি ঠেইংগা। ঠেইংগা মুলত প্যারালিসিসে আক্রান্ত রোগীরা বেশি ব্যবহার করে থাকেন। বষস্ক মহিলা ও পুরুষ যখন হাটতে পারেন না তখন বাধ্য হয়ে

www.pathagar.com

ঠেংগা ব্যবহার করে থাকেন। ঠেংগা প্রতিবন্ধীরাও ব্যবহার করে থাকে। এদের মধ্যে ৬৫% মানুষ হলো ভিক্ষুক।

ব্যাঙ্গা : ব্যাঙ্গা দিয়ে ধান খেতের আগাছাকে ধ্বংস করা হয়। এই ব্যাঙ্গা কাঠ ও লোহার তৈরি এবং এতে একটি ডোপ থাকে। ব্যাঙ্গার ব্যবহারে ধান খেতে কোনো আগাছা থাকতে পারে না।

তথ্যসহায়ক

১. মো. ছাদেক আলী : পিতা : কুরান আলী, গ্রাম : দিঘাপতিয়া, পোস্ট : দিঘাপতিয়া, উপজেলা : সদর, পেশা : ছুতার মিস্ত্রী
২. মানিক রায় : পিতা : ব্রজ মোহন রায়, গ্রাম : রাজরামপুর (বনপাড়া) পোস্ট : নসিপুর, উপজেলা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর (নাটোরে ব্যবসা করেন)
৩. মো. রেজাউল করিম : পিতা : চেরো ফকির, গ্রাম : পশ্চিম হাগুড়িয়া, থানা : গুরুদাসপুর, বয়স : ২৬ বছর, পেশা : দুতার মিস্ত্রী
৪. মো. ময়নুল ইসলাম : পিতা মৃত, মোজাহার মৃধা, গ্রাম : চাচকর খলিদাপাড়া, থানা : গুরুদাসপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : তৃতীয় শ্রেণি পাস
৫. মো. মহরম আলী : পিতা : দবির উদ্দীন, গ্রাম : শোলাকুড়া, পোস্ট : সিংড়া, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : কৃষি
৬. মো. আমিনুল ইসলাম : পিতা : আলসাম আলী, গ্রাম : কুণ্ডুপাড়া, পোস্ট : লক্ষীচামড়ী, থানা : বড়াইগ্রাম
৭. মো. আবদুল হালিম : পিতা : মুহাম্মদ ইউনিস আলী, গ্রাম : আড়রায়, পোস্ট : সালামপুর, থানা : লালপুর, বয়স : ২১ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক
৮. মোছা. নাসরিন আক্তার : পিতা : মো. মোকসেদ আলী, গ্রাম : তকিনগর, পোস্ট : পাঁকা, থানা : বাগাতিপাড়া, বয়স : ১৯ বছর
৯. মো. মিনহাজ উদ্দিন : পিতা : খোরশেদ, গ্রাম : ধুপইল কলেজ পাড়া, পোস্ট : দারামপুর, থানা : লালপুর, পেশা : হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক
১০. মোছা. দিলরুবা আক্তার : স্বামী : রাশেদুল ইসলাম, গ্রাম : বৈদ্যনাথপুর, পোস্ট : লালপুর, থানা : লালপুর, বয়স, ২০ বছর
১১. মো. রেজাউল আলী : পিতা : জাবেদ মৃধা, গ্রাম : মহেশচন্দ্রপুর, থানা : সিংড়া, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি পাস, পেশা : কৃষকজীবী

www.pathagar.com

www.pathagar.com